সুন্দরী কথা-সাগর

সুন্দরী কথা-সাগর

সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

মুদ্রণ :
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
রূপলেখা প্রেস
২৮এ, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

শিল্পী :
শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মূল্য—পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

শ্রীমতী গৌরী দেবী কল্যাণীয়াসু—

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা—

উপন্যাস

চন্দন যাত্রা

তৃষ্ণা (যন্ত্রস্থ)

মুখবন্ধ

বড় দুঃখের দিনে চাকরীটা পেয়েছিলাম। চাকরীটা পেয়ে কিছুকাল বড় আরামেই ছিলাম। আবার চাকরীটা গেল।

চাকরী পাবার কারণও যা যাবার কারণও তাই। যত হাস্যকর তত বিচিত্র। আমি নাকি লিখতে পারি,—না, না, খাতা লেখা নয়—গল্প লিখতে পারি এই শুনে মনিব চাকরী দিয়েছিলেন; আবার আমার গল্প লেখার কেরামতি দেখাতে গিয়ে তাঁর হুকুম মত বিষয় বস্তু নিয়ে গল্প লিখে চাকরীটা গেল। চাকরী যাবার কারণ স্বরূপ যে গল্পের বাঁধানো খাতা খানা, সেটা আবার আপনার বাঁধানো ঝকঝকে চেহারা নিয়ে বাঁধানো-দাঁত বুড়োর হাসির মত অবিরাম আমাকে দেখে যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে উনানে আগুন তো যথেষ্ট, গন গন করে জ্বলছেই, দিই তাতে গুঁজে, ওর হাসি মিলিয়ে থাক। আবার পরক্ষণেই মনে হয়েছে—থাকুক ওখানা। আমার অনেক পরিশ্রমের ফল তো! সুফল কুফল যাই হোক না কেন! নাকের বদলে নরুনের মত থাকুক ওখানা।

চাকরীটা পেয়েছিলাম কিন্তু বড় দুঃসময়ের দিনে। এম, এ, পাশ করে ছেঁড়া চটি আরও ছিঁড়ে চাকরীর চেষ্টায় এখান ওখান ঘুরে বেড়াই চাকরী পাব না জেনেও। সম্বলের মধ্যে দু'টি অল্প মাইনের টিউশনী। বড় কষ্টেই দিন চলে। মনের কষ্ট আর হতাশা এড়াবার জন্যে ভাবি সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসন আমারই অপেক্ষায় শূন্য পড়ে আছে, গিয়ে বসলেই হয়। সেই গিয়ে বসার চেষ্টা হিসাবে লিখি আর লিখি। মাঝে মাঝে কাগজের অফিসে লেখা পাঠাই, নিজে গিয়ে লেখা ছাপার তদ্বির করি, কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হন, আশ্বাসও দেন কেউ কেউ। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই! লেখা ছাপার ধার দিয়ে যান না কেউ। লেখা কখনও কখনও ফিরেও আসে।

এই সময় এক দিন!

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে সবিনয় ভিক্ষা হিসেবে ষ্টলের কাগজগুলো উল্টে পাল্টে দেখছি যদি কোন কাগজ ভুল করে আমার লেখা ছেপে থাকে। সব কাগজেই তো লেখা আবার ছড়ানো!

এমন সময় আমার অত্যন্ত কাছে থেকে কে ডাকলে আমার নাম ধরে!—নিবারণ!

এই বিশাল কলকাতা সহরে আমার নাম ধরে ডাকার মানুষ, আমার দিকে দৃষ্টি দেবার মানুষ তো অনেক দিন পাইনি। অবাক লাগল, ভালও লাগল। চমকে চারিদিকে তাকালাম। যা দেখলাম তা বিশ্বাস করতে পারলাম না। ফুটপাতের গা ঘেঁষে কালো রঙের একখানা ঝকঝকে গাড়ী দাঁড়িয়ে, তারই ভিতর থেকে আমাকে ডাকছে আমাদেরই জ্ঞানেন্দু!

—আরে নিবারণ না! এস গাড়ীতে এস। তোমাকেই তো খুঁজছিলাম হে!

অবাক হলাম, কৃতকৃতার্থ হলাম। এত বড় গাড়ীতে চেপে, দামী সিল্কের জামা, দামী ঘড়ি, বোতাম আর আংটি পরা জ্ঞানেন্দু খুঁজছে আমাকে! অভিভূত হলাম। কখন তার পাশে তার গাড়ীতে উঠে বসেছি তার খেয়ালও করতে পারি নি।

গাড়ী তখন চলতে আরম্ভ করেছে। ড্রাইভারকে সে তখন হুকুম দিচ্ছে এক বড় হোটেলে যাবার আমি যার নামই কেবল শুনেছি, আর বাড়ীটা বাইরে থেকে অবাক হয়ে দেখেছি।

গাড়ীখানা স্রোতের মুখে পাল-তোলা নৌকার মত রাস্তার উপর দিয়ে পিছলে চলেছে। গাড়ীর ভিতর এত বড় গাড়ীর মালিক জ্ঞানেন্দু'র পাশে আমি শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী বোকার মত চুপ করে বসে আছি।

গাড়ীখানার মসৃণ চলার মতই মসৃণ হাসি হেসে জ্ঞানেন্দু কথা আরম্ভ করলে—তারপর, কেমন আছ হে নিবারণ?

আমার ঠোঁটটাই খালি নড়ল, কথা বের হল না; কেবল একবার নড়ে চড়ে বসলাম।

আমার অবস্থাটা অনুমান করে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে জ্ঞানেন্দু বললে—তুমি তো দেখছি প্রায় এক রকমই আছ! সেই ছেঁড়া আধময়লা জামা, সেই তেমনি বোকার মত হাসি!

এবার সত্যিই হাসলাম, এবং বোকার মতই হাসলাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি ছাত্রাবস্থায় যখন জ্ঞানেন্দু'র সহপাঠী হিসেবে কলেজে পড়তাম তখন আজকের মতই পুরানো চটি আর ছেঁড়া আধময়লা জামা পরতাম, কিন্তু বোকার মত হাসিটা হাসার ভাগ্য ছিল জ্ঞানেন্দু'রই। আজ ভাল গাড়ীতে চড়ে, আমাকে পাশে বসিয়ে সেই বোকার হাসিটা সে আমার মুখেই মাখিয়ে দিয়েছে।

এইবার আমার মুখ ফুটল, মুখ খুলতে হল। বললাম—আমি তেমনিই আছি! তুমি কেমন আছ?

প্রশ্নটা অবান্তর। কারণ জ্ঞানেন্দু যে ভাল আছে, খাসা আছে তা তার হাসি, বেশ-ভূষা, যান, সবাই একবাক্যে সোচ্চারে ঘোষণা করছে। জ্ঞানেন্দু সেই কথাই বললে—বল না কেমন আছি! দেখে কি মনে হচ্ছে?

গদ্‌গদ হয়ে বলতে হল—ভালই আছ! খুব ভাল!

আমার কথাটা দয়া করে স্বীকার করেই যেন সে হাঃ হাঃ করে হাসল।

হোটেলে সে নিজে গোগ্রাসে খেলে আমিও লজ্জা করে করে তা বেশ খেলাম।

তারপর সে আমাকে এনে তুললে আপনার অফিসে। দেখলাম তার খাবারও সময় অসময় নাই, অফিস করারও সময় অসময় নেই। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, অফিস বন্ধ। তবু দরোয়ানকে দিয়ে অফিস খুলিয়ে আপনার খাস-কামরায় আমাকে নিয়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অবলুপ্ত ঘরখানার দিকে চেয়ে হাত বাড়িয়ে সে একবা সগর্ব্বে বললে—আমার অফিস!

কৃত-কৃতার্থ সৌভাগ্যবানের মত হাসতে হল আমাকে।

—বস।

বসলাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সত্যিই অভিভূত হলাম। বললাম-বাঃ, চমৎকার অফিস।

—চমৎকার না? আমার মুখ থেকে না চাইতে তারিফ পেয়ে খুসী হল জ্ঞানেন্দু।

জ্ঞানেন্দু মাতব্বরের মত আমাকে প্রশ্ন করলে—কি করছ আজকাল?

মিথ্যে কথা ঠিক চট করে অকারণে আজও আসে না। তাই মাথা হেঁট করে টেবিল থেকে একটা পেপারওয়েট নিয়ে লুফতে লুফতে বললাম—বিশেষ কিছু না।

—বিশেষ কিছু না? তা হলে ভালই হয়েছে! তুমি আমার কাছেই কাজে লেগে যাও। সোৎসাহে বললে জ্ঞানেন্দু।

কুণ্ঠিতভাবে বললাম—কাজটা কি ধরনের জানলে—; আমি আবার পারব—কি না!

হা হা করে হেসে সে বললে—তুমি সেই চিরকালের 'গবেট'-ই রয়ে গেলে

পারব কি না! পারবে না কি হে? আমি এত বড় কারবারটা চালাচ্ছি কি করে?

দুর্ব্বল প্রতিবাদ করে বললাম—তবু—

—আরে তবু কি? আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী দরকার। তোমারই মত লোক খুঁজছিলাম। বিশ্বাসী, বেশী চালাক নয়; চালবাজ নয়। একটু লিখতে পারে!

মনে মনে আমার হাসি এল। হায়, ভগবান, এও শুনতে হল আমাকে জ্ঞানেন্দু'র মুখ থেকে। যাক, তবু জ্ঞানেন্দু বিশ্বাস করে আমি লিখতে পারি! এ কথাটা তো কাগজের সম্পাদকদের মানাতে পারলাম না!

আবার জ্ঞানেন্দু হা হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে—বাঃ, সেই গবেট-ই রয়ে গেছ হে! কি মাইনে-টাইনে নেবে জিজ্ঞেস করো—।

কি বলতে যাচ্ছিলাম, জ্ঞানেন্দু হাত নেড়ে বাধা দিয়ে বললে থাক, তোমাকে আর বলতে হবে না। দেড়শো টাকা করে নেবে মাসে।

তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম য্যাল ফ্যাল করে। এযে না চাইতে চাঁদ হাতে এসে ধরা দিচ্ছে! এ আমি কি করি!

—কাল থেকে এস তা হলে। কেমন? ঠিক দশটায়। আমি আবার লেট হওয়া পছন্দ করি না।

সত্যি সত্যিই চাকরীতে বহাল হয়ে গেলাম।

অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে পৌনে দশটায় অফিসে গেলাম। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। দারোয়ান বসতে দিলে। একটা চেয়ারে আলতো ভাবে আলগোছে বসে রইলাম। দশটা বেজে গেল। তখন একে একে আসতে লাগলেন বাবুরা। জ্ঞানেন্দু'র কোন পাত্তা নেই। অবশেষে সাড়ে এগারটার সময় জ্ঞানেন্দু এসে পৌঁছল হন্ত দন্ত হয়ে। আমাকে সে যেন দেখেও দেখলে না। সে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের মস্ত ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিছুক্ষণ পর সে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

প্রায় পৌনে বারটা বাজে! কি করব ভাবছি এমন সময় ইলেকট্রিক বেলের শব্দে চমকে উঠলাম। বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে—ছোট সায়েব ডাকছেন আপনাকে।

জ্ঞানেন্দু'র ঘরে ঢুকলাম ভয়ে ভয়ে।

বেশ হৃষ্ট হাসি হেসে জ্ঞানেন্দু বললে—বস। এই নাও তোমার এ্যাপয়েন্ট-মেণ্ট লেটার! বাবাঃ, যা ঝামেলা সকাল থেকে।

তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম নিয়োগ পত্রখানা হাতে নিয়ে। সে বোধহয় এইটাই চাইছিল।

—আর ব'লো না ঝামেলার কথা। বাবা আমাকে জ্বালাচ্ছেন তো জ্বালাচ্ছেনই। কি যে করি।

আবার তাকালাম তার মুখের দিকে। সে বললে—বাবা চান আমি কলকাতার এই মস্ত ব্যবসাপাতি ছেড়ে দিয়ে তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর গ্রামের সেই খ'ড়ো চালায় বাস করি, আর তাঁর জমি-জেরাতে চাষবাস দেখি! কি আবদার বল দেখি।

—তা তো বটেই।

অকস্মাৎ চটে উঠল জ্ঞানেন্দু—মানে? তুমি বলছ আমি গ্রামে আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে চাষ-বাস করে থাকব?

আমি সসব্যস্ত হয়ে বললাম—আরে না, না, আমি কি তাই বলছি! তুমি এইসব ছেড়ে কোথায় যাবে চাষবাস করতে?

শান্ত হল জ্ঞানেন্দু—হুঁ, তাই বল। বুঝলে না, চিঠি পেয়ে আমার স্ত্রীতো আগুন! রেগে ফিট হয়ে সে সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই রাগ থামাতে, ফিট ভাঙাতে, ডাক্তার ডাকতেই আমার এত দেরী হয়ে গেল।

যাক। চাকরীতে বহাল হলাম। আমার কাজ যে কী তা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি না। কয়েক দিন থাকতে থাকতেই বুঝলাম এই বিরাট লোহার ব্যবসা তার শ্বশুরের। শ্বশুরের দুই কন্যা, একটি ছেলে। ছেলেটি একেবারে শিশু, বছর তিনেকের। তার স্ত্রীই বড মেয়ে। কর্ম্মহীন জামাইকে কাজে ঢুকিয়ে নিয়েছেন ছোট সায়েব করে।

আমার আসল কাজ জ্ঞানেন্দু'র মনোরঞ্জন করা, সারাদিন তার টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে তার বিপুল সৌভাগ্যের কাহিনী শোনা।

ভিতরের ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম কিছুদিনের মধ্যেই। জ্ঞানেন্দু'র বাবা পাঁড়াগেঁয়ে মানুষ হলেও রাশভারী শক্ত মানুষ, তার উপর ধনী। ধনের পরিমাণটা যে কি তা অবশ্য আমি অনুমান করতে পারিনি। এদিকে কলকাতায় ধনী কন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ের ফলে ছেলে গিয়ে পড়েছে ধনী শ্বশুরের হাতে। এখন স্বাভাবিকভাবে শ্বশুর চান জ্ঞানেন্দু বাপের কাছ থেকে টাকা কড়ি আদায় করে কলকাতায় বাড়ী করে বাস করুক। তার

শ্বশুর কন্যার জন্যে জ্ঞানেন্দুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার জন্য চাপ দিচ্ছেন। অথচ রাশভারী বাবাকে চিঠি লিখে টাকা চাইতেও ভয় আছে তার। মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো কথায় সেটা প্রকাশ পেত।

—জান, এই যে ব্যবসা দেখছ আমার শ্বশুরের এর ভ্যালুয়েশন কত বলত?

—আমি ভাই আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর জানব কি করে? এত বড় ব্যাপারটার দাম কত কি করে বলব?

খুসী হয়ে জ্ঞানেন্দু বললে—তা বটে, তুমি জানবে কি করে। তা তোমাকে চুপি চুপি বলি—লাখ পনের হবে।

আমার চোখ কপালে উঠল। বললাম—বল কি হে?

জ্ঞানেন্দু ঘাড় নাড়লে। তারপর বললে—বাবার তুলনায় এ সামান্য ব্যাপার হে! বাবার ধনের পরিমাণ জান?

আমাকে এর চেয়েও বেশী ধনের কথা শুনতে হবে জেনে আগে থেকেই হাঁ করলাম।

টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে—সঠিক জানি না, তবে পঁচিশ লাখের উপর। এটা তাঁর হাতেই আছে। আর তা ছাড়া কত কালের গুপ্ত ধন-রত্ন যে কোথায় আছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। সে তিনি পেয়েছেন দেবী ভবসুন্দরীর দয়ায়। তা মাটির তলায় আছে, তিনি তোলেন না। আমার ধারণা সে দু'চার কোটি টাকা হবে।

আমার মুখ দিয়ে আপনা আপনি বেরিয়ে গেল—আরে বাপরে, বল কি হে?

—তবে আর বলছি কি? দুঃখ তো আমার সেখানেই। আমি বাবাকে লিখেছিলাম—আমাকে লাখ খানেক টাকা দিন। আপনার তো অনেক টাকা! আমি আপনার নামেই কলকাতায় একখানা বাড়ী করে খানিকটায় থাকি, খানিকটা ভাড়া দি। তা বাবা রাজী হলেন না। লিখলেন—আমার টাকা নাই।

খানিকটা দুঃখসূচক নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বললে—দুঃখের কথা কি জান। তারপর আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। তারপর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে তাঁকে লিখলাম—যদি বাড়ী করবার টাকা না দেন তবে হাজার পঞ্চাশেক টাকা আমাকে দিন। আমি যে ব্যবসায় আছি তার একটা অংশ কিনি।

তার উত্তরে যা লিখেছেন সে আর বলার নয়। লিখেছেন—। বলে সে পকেট হাতড়ে একখানা হলদে রঙের ভাঁজ-করা কাগজ বের করে আমার

হাতে দিলে। একখানা চিঠি। আমি চিঠিখানা খুলে পড়লাম। বালি কাগজে কষের কালিতে লেখা। এ জিনিস কত কাল দেখি নাই। মনে পড়ল ছোট বেলায় পাড়াগাঁয়ের ছেলে, এই কাগজে লিখেছি। কষের কালির সঙ্গেও পরিচয় ছিল। গোটা গোটা কোণওয়ালা অক্ষরে কালো মণিমাণিক্য সাজানো রয়েছে যেন। পড়লাম চিঠিখানা মনোযোগ দিয়ে।

শ্রীশ্রীভবসুন্দরী দেবী শ্রীচরণভরসা

সন্ধ্যাজল

তাং……

পরম কল্যাণবরেষু,

অত্রপত্রে শ্রীমান জ্ঞানেন্দু বাবাজীবন, আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবা। কল্যাণীয়া বধূমাতাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবা। আশা করি শ্রীশ্রীভবসুন্দরী দেবীর আশীর্ব্বাদে ও বাটিস্থ সকলই কুশল।

তুমি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার কথা লিখিয়াছ। তোমাকে লিখি—আমার পঞ্চাশ পয়সা নাই। তুমি বোধহয় ভাব আমি অনেক টাকা সঞ্চয় করিয়াছি ও মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছি। তুমি এ সকলই কেন করিতেছ আমি বুঝি। শ্বশুরের প্ররোচনায় এরূপভাবে আমাকে বিরক্ত করা তোমার উচিৎ হইতেছে না।

আর এক কথা। তুমি বধূমাতাকে লইয়া একমাস সময়ের মধ্যে গৃহে ফিরিয়া আসিবা। নচেৎ তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র রূপে গণনা করিব। পত্রখানি তুমি বৈবাহিককে আমার নমস্কারসহ দেখাইবা। ইতি—

সতত শুভাশীর্ব্বাদক—শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা।

চিঠিখানা পড়ে আবার সযত্নে ভাঁজ করে তার হাতে ফেরৎ দিলাম। মুখে আর জ্ঞানেন্দুকে কিছু বললাম না। কিন্তু চিঠিখানা আমার খুব ভাল লাগল। আমি পরিষ্কার কল্পনা করতে পারলাম একজন পুরানো কালের হাওয়ায় মানুষ, শক্ত সামর্থ, রাশভারী প্রৌঢ়; মিতবাক্, বুদ্ধিমান, আপনার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তে অবিচল। আর যাই হোক, জ্ঞানেন্দুর মত নয়।

জ্ঞানেন্দু বললে—দেখলে তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেমন সাপ বেরুল! এখন কি যে করি! বাবাকে তো চেন না! ঐ যে বাবা লিখেছেন ও শুধু আমাকে ভয় দেখানো নয়। আমি বাড়ী না গেলে তিনি যা লিখেছেন তাই

করবেন। এদিকে আমার স্ত্রী আর শ্বশুর ভাবছেন ও কেবল ভয় দেখানো। তাঁরা বাবাকে চেনেন না। কিন্তু স্ত্রীও যাবে না ওখানে। বাবা বুড়ো বয়সে এক কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসেছেন।

চুপ করল জ্ঞানেন্দু। তারপর আবার আপনার খেদের কথা বলতে লাগল। বলিই বা কি! বাবার বয়েস হল ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু শরীর খুব শক্ত আছে। মা মারা গিয়েছেন আজ দু' বছর। আমিও সেই মায়ের মৃত্যুর পর আর যেতে পারিনি। যাওয়াই কি ছাই সোজা কথা। এ দিকে শুনতে পাচ্ছি বাবা বছর খানেক হল ভবসুন্দরী দেবীর (এইখানে জ্ঞানেন্দু হাতজোড করে কপালে ঠেকালে) ভাঙা মন্দিরের কাছে রাম রায়ের ভিটের উপর একখানা বাড়ী করে গোপনে এক অল্পবয়সী চণ্ডালকন্যাকে নিয়ে বাস করছেন। এটা কিছুদিন আগেই আমার কানে এসেছে। কাজে কাজেই আমার স্ত্রীও শুনেছেন, আমার শ্বশুরও জেনেছেন। সেই জন্যে আমার স্ত্রী সেখানে যেতে নারাজ। আমি তোমাকে যে এনেছি চাকরী দিয়ে সেও এই জন্যে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। এর ভেতর আমার কি করণীয় আছে তা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

জ্ঞানেন্দু বললে—এ কাজটা যে অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে সেটা আমি আর বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে বলি! সেই জন্যে ভেবেছি তোমাকে আমি সমস্তটা বলব। তুমি গল্প করে লিখে ফেলবে সবটা। তাতে দেখাবে যে তিনি যে কাজটা করছেন তা অত্যন্ত গর্হিত। তোমার লেখা হয়ে গেলে সেটা বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। পড়লে সবটা বুঝবেন তিনি, আপনার দোষটাও বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করতে পারবেন।

কি অদ্ভুত ও অভিনব পরিকল্পনা! এ জ্ঞানেন্দুর মাথার পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু কি বলি! হাসিও আসে, দুঃখও হয়। বাপের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নাই তার। অথচ এদিকে স্ত্রীকে নিজের মতে আনাও তার পক্ষে অসম্ভব। যাক—এই জন্যেই যখন চাকরী তখন উপায় কি?

বললাম—তা হলে আজ থেকেই বলতে আরম্ভ কর।

জ্ঞানেন্দু বললে—হ্যাঁ, আর দেরী নয়। আজ থেকেই বলব। আমি রোজ যতটা বলব তুমি রাত্রিতে বাড়ীতে ততখানি লিখে এনে আমাকে শোনাবে। আমি আবার তার পর থেকে বলব। কিন্তু এখানে বলা হবে কি করে? চল হোটেলে চল। খেতে খেতে বলব।

জ্ঞানেন্দুর এই আর এক মজা! হোটেলে গোগ্রাসে না খেলে তার মাথা খোলে না।

জ্ঞানেন্দু বলতে লাগল—আমাদের বাড়ী এখান থেকে, মানে কলকাতা থেকে বেশী দূরে নয়। জান কত কাছে কিন্তু কতদূর! এই মোটে শ দেড়েক মাইল রাস্তা, অথচ দুবার ট্রেণ পালটাও, তারপর বাসে চড়, তারপর নদী পার হও, তারপর গোরুর গাড়ীতে চড। বর্ষার সময় গরুর গাড়ীও চলে না। তখন পিছলে আছাড় খেতে খেতে চল। জান সে কি কাদা! সেবার, এই বছর কয়েক আগে আমি তো কাদার মধ্যে ঢুকে যাই আর কি! আমার সঙ্গে ছিল নিধে, আমাদের চাপরাশী, আমাকে টেনে তোলে তবে বাঁচি। নিধে বেটা আস্ত ডাকাত। আর বাবাকে কি ভালই বাসে! সেবার নিধেকে বাঁচাতে বাবার প্রায় শ' ছয়েক টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। বেটা কোথায় যেন ডাকাতি করতে গিয়েছিল। নিধের একটা মেয়ে আছে বুঝলে, অপ্সরীর মত। আরে তাকে নিয়েই তো যত গোলমাল। মেয়েটার মা কাল নিধে তো ভূত বললেই চলে। অথচ মেয়েটার কি রঙ! কি গড়ন! নিধের বউ এদিকে খুব ভাল মানুষ। সেবার চোত-সংক্রান্তির দিন, বুঝলে হে—

বুঝব কি, আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। আমি হাত তুলে বললাম—দাঁড়াও ভাই, দাঁড়াও। আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। এমন করে বললে আমি গুছিয়ে নেব কি করে?

বিরক্ত হল জ্ঞানেন্দু—আহা, আমি তো আর গল্প-শিখিয়ে নই যে আমাকে গুছিয়ে বলতে হবে। আমি বলে যাব তুমি ওরই ভেতর থেকে গুছিয়ে নিয়ে লিখবে।

আমি নিঃশ্বাস ফেললাম। ভাগ্য! আমার ভাগ্য ছাড়া কি! বললাম—আচ্ছা বল!

আবার তেমনি অসংলগ্নভাবে জ্ঞানেন্দু বকতে লাগল, আমি কান খাড়া করে তার প্রলাপ শুনতে লাগলাম। আমি পরিষ্কার দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এই প্রলাপই শেষে আমার বিলাপের কারণ হবে। আমি অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে বললাম—আজকের মত এই যথেষ্ট হয়েছে। এই থাক। আমি রাত্রিতে এটা লিখে কাল তোমাকে শোনাব।

অনেক পরিশ্রম করে সারারাত্রি লিখলাম। পরের দিন অফিস যেতে খানিকটা দেরী হয়ে গেল। জ্ঞানেন্দুর ঘরে ঢুকতেই সে বলল এসেছ? এত দেরী করে? লিখেছ?

আমি এক মুখ হেসে বললাম—এই যে! বলেই ঝকঝকে বাঁধানো খাতা খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম—"ভূগোলের বাইরের দেশ যেন। কলকাতার এই বিশাল মুখর নগর জীবন থেকে মাত্র দেড়শো মাইল দূরে। কিন্তু সেখানে গেলে মনে হবে—এ কোথায় এলাম! এ কি চন্দ্র বা মঙ্গলের কোনও অংশে এসে পড়েছি? ছায়ায় ঢাকা, পাখী-ডাকা—"

জ্ঞানেন্দু কর্কশ কণ্ঠে আমাকে থামিয়ে দিলে—আরে থাম থাম। এ যে গল্প লিখতে গিয়ে কাব্য আর ভূগোল চালিয়েছ? বাবা চন্দ্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বুধ কিছুই বাদ দাওনি দেখছি। তোমাকে লিখতে বললাম বাবার কথা, আর তুমি ঐ সব নিয়ে এলে। ভাল জ্বালা যা হোক। এ দিকে আমার প্রাণ যায়। এই দেখ—বলে পকেট থেকে একখানা রেজেষ্ট্রী খাম বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলে।

খুলে পড়লাম চিঠিখানা। সেই বালি কাগজ, সেই কষের কালি, সেই কালো মণির মত কোণওয়ালা পরিচ্ছন্ন অক্ষর।

শ্রীশ্রীভবসুন্দরী শ্রীচরণ ভরসা

সন্ধ্যাজল
তাং......

কল্যাণবরেষু,

অত্র পত্রে শ্রীমান জ্ঞানেন্দু বাবাজীবন, আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবা। কল্যাণীয়া বধূমাতাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানাইবা। আশা করি শ্রীশ্রীভব-সুন্দরী আশীর্ব্বাদ প্রসাদাৎ ও বাটীস্থ সকলই কুশল।

আমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর এ তক পাই নাই। পাইয়াছ কিনা বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে এক মাস মধ্যে বধূমাতা সহ এ বাটী আসিয়া বসবাস আরম্ভ না করিলে ত্যাজ্য করিব লিখিয়াছিলাম। পুনরায় সে কথা জানাইলাম। পত্র প্রাপ্তি হইতে সাতদিন মধ্যে চলিয়া আইস। না আসিলে আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আমি দ্বিধা করিব না। আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তোমার কনিষ্ঠ ধ্যানেন্দুকে উইল করিয়া দান করিব।

ইতি—
নিয়ত শুভাশীর্ব্বাদক
শ্রীচন্দ্রভূষণ শর্ম্মা

চিঠিখানা পড়া শেষ করে আবার পরিপাটি করে ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে তার হাতে তুলে দিলাম। তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ অত্যন্ত করুণ মুখে আমার দিকে তাকিয়ে সে আমার হাত দুখানা আচমকা চেপে ধরলে। কাতরভাবে বললে—আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও ভাই!

আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম! লক্ষপতি শ্বশুরের জামাতা, কোটিপতি পিতার পুত্রকে আমি সামান্য দেড় শো টাকা মাইনের নিবারণ চক্রবর্ত্তী কি করে রক্ষা করব ভেবে পেলাম না। হয়তো বাবাকে নিয়ে বই লেখার মত কোনও নূতন অভিনব পরিকল্পনার উদয় হয়েছে তার মাথায়। আমি বললাম—কিন্তু আমি তো ভেবে পাচ্ছি না—

অসহিষ্ণু হয়ে সে বললে—তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সব ভেবে রেখেছি। তোমাকে কেবল যা বলি তাই করতে হবে!

দেড়শো টাকা মাইনে দেয় জ্ঞানেন্দু। সে যা বলবে করতে হবে বৈ কি! আমি নিজেকে ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে বললাম—বল, কি করতে হবে।

—তুমি কালই চলে যাও বাবার কাছে। আমার বন্ধু তো তুমি। তাই বলে পরিচয় দেবে। তুমি হাবা-গোবা সাদা-সিধে মানুষ, তুমি বাবাকে বোঝাতে পারবে। তোমাকে মনে ধরবে তাঁর। তুমি আমার হয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবাকে শান্ত করে এস। তার মানে তুমি তাঁকে 'ম্যানেজ' করে আসবে আর কি!

—কি বলব? তুমি তোমার স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে থাকবে কি না সে বিষয়ে কি বলব?

আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠল জ্ঞানেন্দু, বললে—যে যা হয় বুঝিয়ে বলবে,—বলবে—, বলবে—, বলবে বছর খানেক পরে গিয়ে আমি বাস করব। অন্তত তাঁর পুত্রবধূকে সেখানে রেখে আসব। এখন নতুন ব্যবসা!

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। কি করি! সেই রাশভারী, কড়া, কঠিন, বুদ্ধিমান প্রৌঢ়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর অবাধ্য পুত্রের হয়ে ওকালতী করে তার পক্ষে রায় আনতে হবে এ কথাটা ভাবতেও বুকটা ধড়ফড় করে উঠল! আর তা ছাড়া সামনে পুজো। পিতৃপক্ষ পার হয়ে দেবীপক্ষ আরম্ভ হয়েছে! পুজোয় অফিস বন্ধ হলে একবার দেশে যাব ভেবেছিলাম। তা আর হল না! কি করা যাবে আর!

—তা হলে কালই চলে যাও। পুজোর মাসের মাইনে আর তোমার

ওখানকার খরচের টাকা সব ঠিক করে রেখেছি। রাস্তাটা তো জানই। বিশেষ কঠিন নয়। নদী পার হয়ে একটা মুটে ঠিক করে নেবে। তার মাথায় বাক্স বিছানা চাপিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে। ফিরে কিন্তু আসবে তাড়াতাড়ি।

পর দিন ভোর বেলায় রওনা হলাম।

আমার সেই বহুকালের টিনের স্যুটকেশ আর সতরঞ্চিতে মড়া-বাঁধা করে বিছানাটি নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনে চাপলাম। আমার বাড়ী যেতে ট্রেনে চাপতে হয় শেয়ালদ' ষ্টেশনে। হাওড়া থেকে শুনেছি পশ্চিম যেতে ট্রেনে চড়তে হয়. কিন্তু চড়িনি কখনও। যাক, জ্ঞানেন্দুর রাশভারী কঠিন বাপের সামনে দাঁড়াতে বুক দুরদুর করছে বটে কিন্তু এই সুযোগে এদিকটায় দেশভ্রমণ তো হয়ে গেল!

এ নতুন দেশ, নতুন ষ্টেশন সব, মানুষের মুখগুলিও সব বোধ হয় নতুন। কিছুক্ষণ পরেই, বেলা তখন এক প্রহর পার হচ্ছে, একটা জংসন ষ্টেশনে নামলাম। আবার চাপলাম ট্রেনে। ছোট্ট ট্রেন, ঘুট ঘুট করে হেলতে দুলতে চলে। তাতেই চললাম ঘণ্টাখানেক। এ কি ট্রেন, কেমন সব ষ্টেশন; কেমনতর দেশ! এর সঙ্গে তো পরিচয় ছিল না। মাটির চেহারাও যেন অন্য এক রকম! এ আমার একেবারে অজানা। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর ভূগোল পড়েছি, সেখানকার সব সহরের নাম জানি, কিন্তু এদের নাম জানা দূরে থাক, এরা যে এই দেশে আমারই খুব কাছেই আছে তা কে জানত!

মনে হচ্ছে যেন হারিয়ে যাচ্ছি। একটা জনহীন ষ্টেশন, নীচু প্লাটফর্ম্, বোর্ডে নাম দেখে ভাল করে পড়ে, আশপাশের যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করে নেমে পড়লাম। আমিই দেখলাম একমাত্র প্যাসেঞ্জার যে নামল এই ট্রেন থেকে।

এইবার বাসে চাপতে হবে। একটা বটগাছ তলায় প্রায়-দুপুরের রৌদ্রের ছায়ায় বাস্ দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট করে উঠলাম গিযে বাসে। আমি সামান্য মানুষ, আধময়লা জামা, ছেঁড়া জুতো, মোটা মিলের ধুতি আমার পরনে। কিন্তু আমার আশপাশের মানুষগুলি আমার চেয়েও গরীব।

বাস চলল উঁচু নীচু পথের উপর দিয়ে। পুজোর আগে। বৃষ্টি শেষ হয়েছে, আকাশ পরিষ্কার নীল, ছোট ছেলের চোখের মত। পথের ধারে সবুজ ঘাস মখমলের মত বিছানো, তার মাঝে মাঝে কোন্ দুলালের উষ্ণীষ

শীর্ষের মত কাশ ফুলের ঝাড় আলতো বাতাসে দুলছে। রাস্তার পাশে ক্ষেতে সবুজ ধানের গাছ মাথায় বেশ বেড়ে উঠেছে জল-ভরা ক্ষেতের মধ্যে। কিন্তু রাস্তায় কি কাদা! শুনলাম এ নাকি বাদশাহী সড়ক, আগেকার দিনে নবাব-বাদশা-ফৌজদারের পল্টন যাবার জন্যে তৈরী হয়েছিল। শুনে ভয় হল। তা হলে এর পর কি হবে?

বাস থেকে নামলাম অবশেষে। নদীর ধারে এসে বাস থামল। বাস-স্টপেজের পাশেই মুড়ি-মুড়কি, মণ্ডা-বাতাসার দোকান। দোকানে রসোগোল্লা, ছানার সন্দেশও রয়েছে। তাই খাওয়া গেল। হাত পেতে মুখের সঙ্গে লাগিয়ে কুয়োর জল খেলাম। তারপর দুআনার বিনিময়ে কুলির মাথায় বাক্স-বিছানা চাপিয়ে নদীর ঘাটে হাজির হলাম। কুলীর জরাজীর্ণ শরীর, তার মাথা থেকে বাক্স বিছানা পডে আর কি! বহু কষ্টেই সে প্রতিশ্রুতি পালন করলে।

নদীটি বেশ চওড়া, কিন্তু জল বেশী নেই! তবু খেয়া-পারাবার আছে! খেয়ায় পার হলাম। তাও লাগল আধ ঘণ্টার ওপর। স্রোত খুব।

এর পর আমি হারিয়ে গেলাম। নদী পার হয়ে খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আমি কি বিপদেই যে পড়লাম! লোক নাই, জন নাই, কাছে কোন বসতি নাই। বাক্স আর বিছানা নিয়ে সেইখানেই বসে পড়লাম। এবার আমি কি যে করি! বেলা পড়ে আসছে, রৌদ্রে কাঁচা সোনার রঙ ধরেছে। এর পরেই তো অন্ধকার নেমে আসবে! কি করব?

কিন্তু ভগবান সহায়! যারা খেয়া পার হয়েছিল তাদেরই একজন আমাকে অসহায় অবস্থায় দেখে একান্ত কৌতূহল পরবশ হয়েই জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গমন হবে মশাইয়ের? ভাল করে দেখলাম লোকটিকে। কি বিরাট কাঠামো, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। মোটা মোটা শক্ত হাড়ের ছাঁদ দিয়ে তৈরী। গায়ে বেশী মাংস না থাকার জন্যে ভয়ঙ্কর একটা কিছু মনে হয় না।

বাঃ রে, চমৎকার কথা বলার ধরন তো! আমি তার কথায় ভরসা পেলাম। বললাম—সন্ধ্যাজল যাব। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই দুটো নিয়ে। কি করি বলতে পারেন?

লোকটি হাসল, বললে—কি আর করবেন? আমিও যাব সেথা! আমাকে দ্যান, একটা আমি নিয়ে যাই।

অকূলে কূল নয় শুধু, মাথা গোঁজার জায়গা পেয়ে গেলাম। বললাম—আপনি যাবেন সেখানে?

—হ্যাঁ গো, তবে আর বলছি কি? স্থান কোনটা দেবেন। বলতে বলতে সে ট্রাঙ্কটা তুলে নিলে মাথায়।

সসঙ্কোচে বললাম—কত দিতে হবে?

—কত আর দেবেন। টাকা খানেক দেবেন। মদ খাব।

রাজী হয়ে গেলাম।

—কিন্তু আপনি সন্ধ্যাজলে কার বাড়ী যাবেন?

—চন্দ্রভূষণ বাবুর বাড়ী।

কাদায় পিছল আল পথের উপর দিয়ে যেতে যেতে লোকটি বললে—উ নামে তো গাঁয়ে কেউ নাই মশায়!

আকাশ থেকে পড়লাম! এ কোথায় এলাম তা হলে আমি? লোকটি বলে কি! আমি বললাম—সে কি কথা? চন্দ্রবাবু থাকেন না সন্ধ্যা-জলে?

—ও, আমাদের চন্দ মশায়? তাই বলুন। ও বাবাঃ। তা হলে টাকা লাগবে না মশায়!

—কেন? অবাক হয়ে বললাম।

—না মশায়। আপনি চন্দ মশায়ের বাড়ী যাবেন, তিনি আমাদের জমিদার মহাজন, ক'তো উপকার করেন বিপদে-আপদে! তিনি শুনলে বলবেন কি?

—তা আমি টাকাটা বরং দিয়ে দি এখনই। তাঁকে কিছু বলার দরকার নেই।

—তা দেন! গরীব মানুষ, একটা টাকা পেলে অনেক কাজে লাগবে।

—এই যে বললেন মদ খাবেন? টাকাটা দিয়ে বললাম।

কোন রকম অপ্রস্তুত না হয়ে লোকটি বললে—তা মদ খাওয়াটাও তো একটা কাজ গো! সেটাও তো দরকার।

হাসলাম। বেশ কথা বলে লোকটি।

—আচ্ছা, সন্ধ্যাজল কতদূর?

—দূর কোথা, এই ক্রোশ খানেক রাস্তা। পথে কাদা আছে। তবু এই হন হন করে গেলে কতক্ষণ লাগবে?

আশ্বস্ত হলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল এর কাছ থেকে তো জ্ঞানেন্দুর বাবার সম্পর্কে বেশ সহজেই জানা যায়! জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা চন্দ মশায় লোক কেমন বলুন তো!

আমি লোকটিকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করায় সে পরম আপ্যায়িত হয়েছে। সে বললে—চন্দ মশায় আমাদের মহাশয় লোক গো!

—ভাল লোক?

—নিশ্চয়। তাতে কথা কি?

—খুব রাশভারী বুঝি? আমি কথার সূত্র ধরিয়ে দিলাম।

—ওরে বাবা, ছামনে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে কথা বলে কার সাধ্যি? কিন্তুক, লোকের বিপদে আপদে চন্দ মশায়ের কাছে ছুটে গিয়ে পড়লেই হল। দু'এক কথায় শুধিয়ে নেবেন কি চাই। ব্যস, দাতা কর্ণের মত সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে দেবেন! আর তা ছাড়া—বলতে বলতে থেমে গেল লোকটি। আমার মনে হল এর পর সে যা বলবে তা বিদেশী লোককে বলা উচিত হবে কি না ভেবে নিচ্ছে!

আমি তাকে থামবার সুযোগ না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তা ছাড়া?

—তা ছাড়া মহাপুণ্যবান লোক গো! দেবতার আশ্রিত মানুষ। বর পেয়েছেন মা ভবসুন্দরীর কাছ থেকে। মা তাঁকে আপনার রত্নভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। তা ছাড়া মা নাকি তাঁকে মধ্যে মাঝে দেখা দেন, কথা বলেন।

কিছুই বুঝলাম না। ভবসুন্দরী কে জানি না প্রথমতঃ। জিজ্ঞাসা করলাম—ভবসুন্দরী কে?

লোকটি আমার টিনের স্যুটকেশটি মাথা থেকে নামিয়ে প্রণাম করে বললে—ওরে বাবা, মা ভবসুন্দরী! মা তারার কন্যে গো! মায়ের একমাত্র কন্যে! এই পিথিমীর সব ভাল তার মধ্যে!

কিছুই বুঝলাম না! কেবল তিনি এক দেবী এইটুকু বুঝলাম। চুপ করে রইলাম। আর প্রশ্ন আসছে না। লোকটি বলে যেতে লাগল—মা আমাদের গাঁ'কে বিপদে, আপদে, সম্পদে রক্ষে করছেন। এই বোঝেন না কেন, একবার এই বছর-দশেক আগে একবার চন্দ মশায়ের বাড়ীতে দুপুর রাতে ডাকাত পড়ল। চন্দ মশায়কে মারধোর একটু করেছিল, কিছু সামান্য টাকাও নিয়েছিল। কিন্তু ডাকাতরা এসেছিল মা ভবসুন্দরীর দেওয়া ধন-দৌলত কাড়তে। তা পাবে কোথা? মা ইতিমধ্যে সব লুকিয়ে ফেললেন! ইতি-মধ্যে আমার দাদা নিধি সব আমাদিকে নিয়ে লাঠি হাতে গিয়ে পড়ল। ডাকাতরা ছুটে পালাতে পথ পায় না! শুধু কি তাই? মা একটি ষোল বছরের সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে দলের একজনকে পথ ভুলিয়ে দিলেন। সে আর গাঁ থেকে বেরুতে পারে নাই। বাঁশবনে পথ হারিয়ে কলের পুতুলের

মত দাঁড়িয়ে। আমরা খুঁজতে খুঁজতে ধরে ফেললাম বেটাকে। বেটা তখন ভ্যাবার মত চকা-ভকা হয়ে এদিক ওদিক চাইছে আর ঠকঠক করে কাঁপছে, আর মাঝে মাঝে ভুল বকার মত বলছে—সি কোন দিকে গেল? সি?…এই তো আর এসে গিয়েছি আমরা! ঐ দেখুন ক্যানে?

সামনের বন শোভার দিকে তাকিয়ে সে আঙ্গুল দেখালে। অপরাহ্নের রৌদ্র গাঢ় সোনালী হয়ে উঠেছে, তারই মধ্যে আমাদের দু'জনের অতি দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আশ পাশের দিগন্ত-বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের উপর।

সামনেই তা হলে সেই সন্ধ্যাজল! ঘন বনশোভা কাজল-কালো রঙ থেকে আপনার আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। বিপুল আকারের সব বনস্পতি, বট, অশ্বত্থ, শিরিষ গাছের ঘন সন্নিবেশে দিনশেষের আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে তুলেছে। তারই অতি স্বল্প অবকাশে পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে নানান কচি গাছের ডালপালা রাস্তাকে প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে, ডালের পাতার ফাঁক দিয়ে দিন শেষের সোনার আলো যেন সোনার টুকরোর মত পথের উপর পড়েছে জায়গায় জায়গায়।

বড় সুন্দর দেশ! সেই ঘন সুঁরি রাস্তা দিয়ে গ্রামে ঢুকলাম। তারপর একটা কাজল-কালো-জল, পদ্মপাতা আর ফুলে ভরা দিঘীর পাশ দিয়ে, কতকগুলি খড়ো ঘর পার হয়ে বেশ বড় গোবর মাটি দিয়ে নিকালো উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই মস্ত বড় একখানা একতলা খ'ড়ো বাংলো বাড়ী।

আমার সঙ্গী মাথা থেকে সুটকেশটি নামিয়ে রাখলে সিমেণ্ট করা দাওয়ার উপর। তার দেখাদেখি বিছানাটাও আমি বগল থেকে নামিয়ে তারই পাশে রাখলাম।

—এই তো এসে গিয়েছি। চন্দ মশায়ের কাছারী-বাড়ী। চন্দ মশায় আছেন কিনা তাতো জানি না!

কণ্ঠস্বর নীচু করে সে বললে—চন্দ মশায় না থাকলেই মুস্কিল। ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই বিপদ। মিথ্যে মিথ্যে পঞ্চাশ কৈফিয়ৎ, ধমক ধামক করবে।

লোকটি ঘেমেছে ও ক্লান্ত হয়েছে। আপনার গামছা খানা এতক্ষণ বিঁড়ে পাকিয়ে মাথায় রেখেছিল; এবার সেটা দিয়ে বাতাস খেতে আরম্ভ করলে। বাতাস দিতে দিতে আপন মনে বললে—চন্দ মশায় নিজে ভাল হলে কি হয় দুই ছেলেই সমান। বড় জনা শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাই হয়ে আছে। আর ছোটজনার মুখে সর্ব্বক্ষণ খারাপ বাক্যি, মেজাজ সব সময় খারাপ।

আমি বুঝলাম জ্ঞানেন্দু আর তার ভাই সম্পর্কে বলছে। আকাশে

রক্তসন্ধ্যার মেঘ জমে উঠছে। সন্ধ্যার আর দেরী নাই। আমি সংযত বিনীত কণ্ঠে গলা একটু তুলে ডাকলাম—কে আছেন?

ঘরের ভিতর থেকে কার যেন শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এমনি ভাবে কে যেন ঘরের ভিতর থেকে প্রায় ধমক দিয়ে সাড়া দিলে—কে? কি চাই?

বলতে বলতে একটি যুবক বেরিয়ে এল। কাল শক্ত বেঁটে চেহারা, মোটা নাক। সব চেয়ে বিশিষ্ট আর বিচিত্র তার চোখ আর ঠোঁট। বড় বড় দুইচোখ আরক্ত, উগ্র। আর উপরের দাঁতগুলো উঁচু, খাই মুখটা প্রকাণ্ড। এমন স্থূল, কর্কশতা আছে সমস্ত অবয়বে দেখেই কেমন ভয় লাগে, বিতৃষ্ণা আসে।

অপরিচিত ভদ্রলোক দেখে কণ্ঠস্বর ঈষৎ সংযত করে সে আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—কি চাই? কাকে চাই? আমি কিছু জবাব দেবার আগেই আমার সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে সে তাকে ধমকে উঠল—এই বেটা সিধে, কেরে লোকটা, কোথা থেকে নিয়ে এলি?

অপরিচিত বিদেশী মানুষের সামনে অকারণে অপমানিত হয়ে সিধু খানিকটা উষ্ণ হয়ে বললে—লোকটা লোকটা করছেন। ভদ্রলোক তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁকেই শুধোন ক্যানে!

আমারও অপমান বোধ হল, আমি গম্ভীরভাবে বললাম—আমি কলকাতা থেকে আসছি। গম্ভীরভাবে বললাম বটে কথাটা, কিন্তু কথাটার গুরুত্ব যেন খুলল না, কেমন খেলো শোনাল। আমি অবিশ্যি তার কারণটা জানি! আমাকে গাম্ভীর্য্য কি রাগ মানায় না। আমার স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা নিরীহ, নম্র ভব্যতা আছে (অহঙ্কার করছি না, এ আমার উপলব্ধি) যা আমার লম্বা শীর্ণ মুখ, চোখের নম্র কোমল দৃষ্টির দিকে একবার চাইলেই বোঝা যায়।

তাই বোধহয় আমার কথার গাম্ভীর্য্যের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হল না লোকটির উপর। সে অবহেলার সঙ্গে কর্কশভাবে বললে—তা কলকাতার লোকের এখানে কি দরকার?

আমি আবার শক্তভাবে বললাম—সেটা আপনাকে বলে কি হবে? দরকার আমার চন্দ্রভূষণবাবুর সঙ্গে।

বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে সে বললে—চন্দ্র মশায়ের সঙ্গে দরকার তো আমার কাছে কি? এই বেটা সিধে, ওকে আমার কাছে এনেছিস কেন? বাবার কাছে নিয়ে যা! ঢং করে এখানে আনতে গেলি কেন?

—ঘাট হয়েছে। আসুন গো কর্ত্তার কাছে পৌছে দি আপনাকে।

—চল। আমি আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালাম না। এগিয়ে চললাম। বাক্স আর বিছানা সেখানেই পড়ে রইল।

খানিকটা ঘুরে সিধু আমাকে এনে তুললে একখানা নূতন, পরিপাটি করে নিকানো বাড়ীর সামনে। নূতন বাড়ী। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শেকলটা ঝন ঝন করে বাজালে।

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর ভরাট গলায় কে উত্তর দিলে—কে? ভেতরে এস!

বাইরের দরজা দিয়ে সিধুর পিছন পিছন ভিতরে গেলাম। ঝকঝকে তকতকে গোবরমাটি দিয়ে নিকানো উঠোন। সিঁদুর পড়লে তোলা যায়। উঠানের মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় একটা চাঁপার গাছ। সিমেন্টের দাওয়ার গায়ে জবা—দোপাটির গাছ। দোপাটির গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা। পশ্চিম আকাশ থেকে রঙীন মেঘ আকাশের দিগন্ত থেকে উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়ে এসেছে। তারই রঙীন আলোয় উঠোনটি ঝলমল করছে।

ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন চন্দ্রভূষণ, চন্দ মশায়। শক্ত, ঋজু দীর্ঘ, সমর্থ দেহ। কালো কষ্টিপাথরের মূর্ত্তির মত। মোটা নাক, পাতলা ঠোঁট, টানা বড় বড চোখ, চোখে শান্ত দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টি ক্রোধে উগ্র হয়ে উঠতে পারে। মাথার পাকা চুল ছোট খুঁটিয়ে কাটা। খালি গা, গলায় কণ্ঠির মালা, কপালে ঘন কালো রঙে সাদা তিলক বড স্থন্দর খুলেছে। পদক্ষেপে শান্ত প্রত্যয়ের ছাপ আছে। আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রক্তসন্ধ্যার রক্তিম আলো সারা গায়ে মেখে দাঁড়াতেই আমার মনে হল কে যেন এক কষ্টিপাথরের মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন মাখিয়ে দিলে।

আমি সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করে তাঁকে নমস্কার করলাম। করে মুখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চন্দ মশায় জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। অপরিচিত মানুষের মুখ দেখে নেবার জন্যে যে সময় লাগে তার চেয়েও বেশ কিছুক্ষণ। আমার একটু অবাক লাগল। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মুখের জিজ্ঞাসা ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অচেনা আমাকে যেন তিনি না চিনেও চিনে ছিলেন। তাঁর মুখে একটি স্নিগ্ধ-স্মিত হাসি ফুটে উঠল। তিনি এতক্ষণে প্রতি-নমস্কার করে আমাকে স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে বাবা?

আমি অত্যন্ত বিনীত ভাবে বললাম—আজ্ঞে আমি কলকাতা থেকে

আসছি! আমার মনটি একটি আশ্চর্য্য প্রসন্নতায় ভরে গিয়েছে। এই স্বল্প কয়েক মুহূর্ত্তে আগে তাঁর ছেলের কাছে কর্কশ কথা শুনে মনে যে গ্লানি জমে ছিল তা তিনি যেন মুছে নিলেন। এই ঝকঝকে উঠোনটায় যেন কে নোংরা করে গিয়েছিল তিনি সেটা মুছে পরিষ্কার করে দিলেন। অন্তত আমার এমনি মনে হল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন—কলকাতা থেকে? তা আপনার জিনিসপত্র কোথায় বাবা?

আমি জবাব দেবার আগেই সিধু বললে—সে সব কাছারী বাড়ীর বারান্দায় রেখে এসেছি! আমিই আনলাম।

—ভাল করেছিস বাবা। তুই এক কাজ কর। বাবার জিনিসগুলো নিয়ে আয়, উনি এইখানে আমার ঘরের পশ্চিম দিকের কুটুরীতে থাকবেন।

—এইখানে নিয়ে আসব? অবাক হয়ে বললে সিধু। আমি বুঝলাম এ বাড়ীতে ওঁর সঙ্গে বাস করা, এ এক অস্বাভাবিক সৌভাগ্য!

—হ্যাঁ, যা বাবা, আর দেরী করিস না। সন্ধ্যে হয়ে এল।

সিধু চলে গেল। এই ব্যাপারটা সত্যিই আমার এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য বলে মনে হল।

চন্দ মশায় বললেন—তা বাবা কলকাতা থেকে আসছেন! আমার কাছে কি দরকার? আপনি কি জ্ঞানেন্দুর কাছ থেকে আসছেন?

অতি বিনীত ভাবে ঘাড নেডে বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ! বৃদ্ধের বুদ্ধি, অনুমান শক্তি কত প্রবল তা বুঝলাম এক মুহূর্ত্তে।

চন্দ মশায় হাসি মুখে ঘাড় নেড়ে নিজের অনুমানের তারিফ করলেন যেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা বুঝি জ্ঞানেন্দু'র বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দুজনে এক সঙ্গে এম, এ, পড়তাম। এখন আমি তার অধীনে চাকরী করি। আমি একজন সামান্য লোক!

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ মশায় আমার মুখের দিকে বেশ ভাল করে আবার তাকালেন। বেশ করে আবার আমাকে দেখে নিলেন। তারপর একবার হাত জোড় করে প্রণাম করে বললেন—জয় ভবসুন্দরী! তারপর আমাকে হেসে বললেন—বাবা, কোন জনের ভেতর মহাজন থাকেন তা কি কেউ বলতে পারে? যাক। আজ বিশ্রাম করুন। কাল কথাবার্ত্তা হবে।

সিধু আমার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। চন্দ মশায় বললেন—এনেছিস?

ওই পশ্চিম দিকের ঘরে রেখে দে। আর একটু দাঁড়া। হ্যাঁরে বাবুর কাছ থেকে কিছু পয়সা কড়ি নিসনি তো?

সিধু বোকার মত হেসে মাথা চুলকোতে লাগল। চন্দ মশায় হেসে বললেন—আগেই আদায় হয়ে গিয়েছে? তা বেশ! দাঁড়া, তবু দাঁড়া। একটা রোকা লিখে দি!

ঘরের ভিতরে চলে গেলেন চন্দ মশায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন একটা বালি কাগজের টুকরো হাতে করে। সেই বালি কাগজ, সেই কষের কালিতে আঁকা সেই কোণওয়ালা কালো মণির মত অক্ষর!

—কাল ছোটবাবুর কাছে চার আনা পয়সা নিয়ে নিস। যা!

ঘাড় হেঁট করে প্রণাম করে সিধু চলে গেল।

আমার দিকে তাকিয়ে চন্দ মশায় বললেন—এ তো পাড়া-গাঁ জায়গা বাবা! আপনার কষ্ট হবে! তবু মেনে নেবেন।

আমি বোকার মত, অপ্রস্তুতের মত হাসলাম।

চন্দ মশায় ডাকলেন—ওরে ও মধু, বাবুকে হাত-পা ধোবার জল দে বাবা!

সিমেণ্ট-বাঁধানো মেঝেতে বিছানা পেতে জানলার দিকে বাইরে তাকিয়ে শুয়েছিলাম। দেবী পক্ষের আজ বোধ হয় পঞ্চমী। নীল আকাশে প্রায়-আধখানা চাঁদ উঠেছে। বাড়ীটা খুব উঁচু জায়গায়। উঁচু পাড় থেকে জানলা দিয়ে অনেক নীচে দিঘীর জল নিথর হয়ে পড়ে আছে, একখানা মস্তবড় আয়নার মত। জলে চাঁদের সম্পূর্ণ ছায়াটা পড়েছে। দিঘীর চারদিক নির্জ্জন। এই আশ্চর্য্য নির্জ্জনতায় জ্যোৎস্নার রূপটা কি রকম অদ্ভুত খুলেছে। জানলা থেকেই দেখতে পাচ্ছি দিঘীর ঘাট। উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে চাতালের পর চাতাল মেলে। অনেক জায়গায় রেলিং ভেঙে গিয়েছে, সিঁড়ির সবগুলোই ইট-খসা, শেওলা-ধরা। ঘাটের একেবারে নীচের ধাপে, জলের কাছে কে যেন বসে আছে! কে জানে কে? আমি বিদেশী, আমি চিনব কি করে!

আমার হাত ঘড়িটা দেখলাম, রাত্রি মোটে সাড়ে আটটা। দরজাটা ভেজানো ছিল, খুট করে দরজাটা খুলে গেল। জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাতেই দেখলাম চন্দমশায় ঘরে ঢুকছেন। আমি শশব্যস্ত হয়ে বিছানায় উঠে বসলাম।

চন্দ মশায় হেসে বললেন—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বাবা? অনেক দূর থেকে আসছেন, অনেক কষ্ট করে তো আসতে হয় এখানে! শরীর ক্লান্ত আছে, বিশ্রাম করুন।

চন্দ মশায় বললেও আমি বিছানার উপর ততক্ষণ উঠে বসেছি। ঘরে আর বসবাস কিছু নাই। তাই বিছানার খানিকটা ঝেড়ে দিয়ে বললাম—বসুন।

চন্দ মশায় বসলেন। তারপর বাবা যেমন করে পথশ্রান্ত পুত্রের মুখের দিকে সস্নেহে তাকায় তেমনি করে তাকিয়ে বললেন - রাত্রি তো অনেকখানি হল বাবা। এইবার সেবা করে নিলে ভাল হত। আপনার খাবার ব্যবস্থা আমার এখানেই করে রেখেছি। ভাত তো আপনাকে দিতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বললাম—কেন?

—আপনার জাত মারব কি করে? আপনি ব্রাহ্মণ!

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম—আপনি জানলেন কি করে?

—কি করে আবার! যখন জামা ছাড়ছিলেন তখন যে আপনার পৈতে দেখলাম গো বাবা গেঞ্জির তলায়।

সত্যিই তো অবাক হবার কি আছে! তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বটে লোকটার। চন্দ মশাই বললেন—দুধ, কলা, মুড়ি, গুড় সব রেখেছি বাবা, আসুন, খেয়ে নিন।

—তার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নি! অবিশ্যি আপনার যদি সময় হয়, যদি এখন শোনেন!

স্মিত হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে চন্দ মশায় বললেন—বলুন বাবা, বলুন। আমার এখন অনেক সময়!

তাঁর হাসিতে কোথায় যেন স্নেহার্দ্র প্রশ্রয় ছিল; আমি তার সুযোগ নিলাম, বললাম—আপনার কাছে এক দুদিনের জন্যে এসেছি। আমি আপনার ছেলের বন্ধু। আমাকে স্নেহ দেখিয়ে থাকতে দিয়েছেন। আপনি প্রবীণ সম্মানী মানুষ, আমাকে আপনি বলছেন কেন?

চন্দমশায় খুসী হলেন। একটু হেসে বললেন—আচ্ছা।

আমি তাঁর মনের সরস অবস্থার সম্পূর্ণ সুযোগ নিলাম। বললাম—আমি কলকাতায় জ্ঞানেন্দুর কাছ থেকে যে কাজের জন্য এসেছি সেটা, যদি অনুমতি করেন, তা হলে বলি। এক কথাতেই বলা হয়ে যাবে।

চন্দ মশায় গম্ভীর হলেন, বললেন—বল।

—জ্ঞানেন্দুকে আপনি যে চিঠি রেজেষ্ট্রী করে লিখেছিলেন সে চিঠি সে আমাকে দেখিয়েছে। আমি আপনাকে তার হয়ে বলতে পারি এখানে এসে বাস করতে তার আন্তরিক ইচ্ছা। তবে নতুন ব্যবসাতে ঢুকেছে, তাই আপনার কাছে কিছুদিন সময় চেয়েছে। ব্যবসাটা গোছগাছ করে নিয়ে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সে এখানে আসবে। এখানে বারমাস থাকা তার পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। তবে তার স্ত্রীকে এখানে রেখে যাবে। একথা বলতে ভয়ে সে আপনার কাছে আসতে পারেনি।

চন্দ মশায় মাথা হেঁট করে সব শুনলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বললেন—তাকে ব'লো তাই হবে। আর কিছু বলার দরকার নাই তাকে। ভবসুন্দরীর ইচ্ছা!

তারপর করুণভাবে আমাকে বললেন—বাবা, দুঃখের কথা কি বলব! দু'দুটো ছেলে আমার। একজনও আমার দুঃখ বুঝলে না, আমাকেও বুঝলে না! আর তোমাকে কি বলব, ছেলের থেকেই দুঃখ পেলাম! যাক, তুমি বিদেশী মানুষ, একদিনের জন্যে এসেছ, তোমাকে আর বলে কি লাভ! যাক—তুমি খাবে এস!

খাওয়ার সময় সমস্তক্ষণ পাশে বসে রইলেন চন্দমশায়। আমার বড় লজ্জা লাগছিল। এত সম্পদের মালিক, আমার মনিবের পিতা, তিনি আমাকে এইরকম ভাবে খাওয়াচ্ছেন! বললাম—আপনি কেন এমন ভাবে বসে আছেন?

—থাকি বাবা! কাছে বসে খাওয়াবার মত মানুষ পাই কৈ গো?

লজ্জিত হয়ে বললাম—বড় লজ্জা পাচ্ছি। আমি সামান্য মানুষ।

চন্দ মশায় হাসলেন, আর কথা বললেন না। অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ঐ দেখ বাবার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। কি নাম গো বাবার?

—শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী! কিন্তু আপনি কখন খাবেন?

—তুমি অতিথি। তোমার সেবা হোক। তারপর খাব।

খাওয়া হল, শুলাম, চাকর মশারী ফেলে গুঁজে দিয়ে গেল, চন্দমশায় সমস্তক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর লণ্ঠনটি কমিয়ে, মাথায় কাছে জলের ঘটিটি নিজে ঢাকা দিয়ে, দরজা বন্ধ করে, দুই ঘরের ভিতরের দরজা দিয়ে ওপাশের ঘরে চলে গেলেন।

সারারাত্রি সুনিদ্রার পর যখন সকালে ঘুম ভাঙল তখন জানলা দিয়ে দেখলাম দিঘীর জলে, উঁচু পাড়ে ওপাশের পাড়ের কুটিরগুলিতে শরতের

সোনার রোদ ঝলমল করছে। ধড়মড় করে উঠে গিয়ে দিঘীর ঘাট থেকে মুখ হাত ধুয়ে বাড়ী ঢুকতেই দেখলাম চন্দমশায় বারান্দায় হাত-পা ধুচ্ছেন। বুঝলাম কোথাও থেকে ঘুরে এলেন চন্দমশায়।

আমাকে দেখে হাত-পা মুছতে মুছতে হেসে বললেন—ঘুম ভাঙল বাবা?

লজ্জিত হয়ে মাথা নামিয়ে বললাম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

চন্দমশায় বললেন—তুমিও ভোরে ওঠ, নয়? তা না হলে কি আর রোদ ওঠার পর উঠলে লজ্জা হয়? হয় না। ক্লান্ত ছিলে, তাই উঠতে দেরী হয়েছে।

প্রশ্ন করবার জন্যেই প্রশ্ন করলাম—আপনি কখন উঠেছেন?

—আমি? আমি যখন উঠি তখন এক প্রহর রাত্রি থাকে। আকাশে তারা থাকে তখন। উঠি, প্রাতঃকৃত্য সারি, তারপর স্নান করে আসি দিঘী থেকে। তারপর ভবসুন্দরীর মন্দিরে যাই, প্রণাম করে আসি। তার পুজো পাঠ সেরে এই একবার ঘর-সংসার, সম্পত্তি-কাছারী, গরু-বাছুর, জিনিস-পত্র দেখে এলাম। অন্যদিন অবশ্য একটু দেরীতে যাই। আজ তুমি আছ বলে তাড়াতাড়ি সব সেরে এলাম।

—আচ্ছা, ভবসুন্দরী কে? এখানে আসবার আগে থেকেই নাম শুনছি। এখানে এসেও অনেকবার শুনলাম। তিনি বুঝি আপনাদের গ্রামদেবতা? কালী?

চন্দ মশায় হাসলেন, বললেন—ভবসুন্দরী কে? তোমাকে সব বলবার জন্যে, দেখাবার জন্যেই তো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে এলাম। সব দেখাব তোমাকে, সব বলব। কিন্তু তুমি তো বাবা, কলকাতার মানুষ, চা খাও। তোমার জন্যে ঐ চা এসেছে আগে খেয়ে নাও। খেয়ে বেরুব তোমাকে নিয়ে।

দুজনে বেরিয়ে পড়লাম।

যেতে যেতে চন্দ মশায় বললেন—বাবা, তুমি কলকাতার মানুষ, তোমার এই পাড়াগাঁয়ে দেখবার কি থাকবে? তবু ভবসুন্দরীর নাম করলে। তাই তোমাকে দেখাতে নিয়ে এলাম। গ্রামটি খুব পুরানো। অবিশ্যি সব গ্রামই পুরানো। আমাদের তো বাবা সন তারিখের হিসেব নাই, ছিলও না কোন কালে। আমাদের সব 'যাবৎ চন্দ্রার্ক মেদিনী'! তবে এখানে মানুষ

বহুকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাস করছে। গ্রামের পত্তনও ওই ভবসুন্দরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে। আচ্ছা আগে গ্রামটি দেখ।

আমরা প্রথমেই গেলাম ওঁর বাড়ীর দক্ষিণে খুব উঁচু দিঘীর পাড় দিয়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরে। খুব পুরানো মন্দির। পাথরের তৈরী। অনেকটা, প্রায় এক মানুষ-উঁচু এক পাথরের চত্বরের উপরে অতি সুঠাম এক প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির সুন্দর কাজ এখনও অম্লান রয়েছে। আর কিছু পঙ্কের চুনের ফুল, লতা, পাতা, নানান রকমের নক্সাও রয়েছে। বুঝলাম এগুলি পরবর্ত্তীকালে জোড় দেওয়া হয়েছে মন্দিরের গায়ে। আশ্চর্য্য লাগল মন্দিরের গঠন-বৈচিত্র্য দেখে। চন্দ মশায়কে বললামও সে কথা। মন্দির দেখতে দেখতে একবার আপনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আশ্চর্য্য তো!

চন্দ মশায় হাসলেন, বললেন—কি আশ্চর্য্য গো? মন্দিরটা দেখতে বড় সুন্দর এই তো?

আমি বললাম—আজ্ঞে সুন্দর তো বটেই। তবে আমি ঠিক সে কথা বলছি না!

—তবে?

—এই মন্দিরটির গড়ন ঠিক আমাদের দেশের মত নয়। বাংলা দেশের মন্দির অন্য জাতের। আর এ মন্দির বাংলার বাইরে উত্তর ভারতের মন্দিরের মত। এ বাংলা দেশের কারিগর দিয়ে তৈরী নয়। অন্যদেশের কারিগরের গড়া এ মন্দির।

চন্দ মশায়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। তিনি অকস্মাৎ আমার হাত দুটো তাঁর দুই হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলেন—ঠিক বলেছ তুমি! এ কথা তোমার আগে আর কারো মুখ থেকে আমি শুনিনি। তোমাকে বলব সব গুহ্য কথা—যা কেউ জানে না, আমার ছেলেরাও জানে না। জানতেন কেবল আমার পণ্ডিত মশায়—কিশোরী পণ্ডিত।

আমরা দুজনে মন্দিরের দরজায় দাঁড়ালাম। দরজাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। চন্দ মশায় দড়িটা আস্তে আস্তে খুললেন, আমাকে বললেন—তুমি বাবা, আর ভেতরে ঢুকো না। তুমি তো স্নান করনি এখনো।

আশ্চর্য্য! মন্দিরের বেদীতে কোনও বিগ্রহ নাই। বেদী খালি।

—বিগ্রহ কই?

চন্দ মশায় হাসলেন, বললেন—বিগ্রহ নেই। হাসিটি তাঁর বেশ রহস্যময়। চন্দ মশায় আবার দরজাটি বন্ধ করে দিলেন।

আমরা মন্দিরের চত্বর থেকে নেমে এলাম। এগিয়ে চললাম আরও দক্ষিণে। সামনেই গভীর জঙ্গল। নানান রকমের বুনো গাছ বিছুটিতে আর বেতের লতার বুননে দুর্ভেদ্য। জঙ্গল যেন কোন্ একটা পাহাড়ের মত স্তুপের উপর গজিয়েছে। বললাম—আরেঃ বাপ, কি জঙ্গল।

চন্দ মশায় হেসে বললেন—ভবসুন্দরীর কীর্ত্তি। সব ভেঙে নষ্ট করে দিয়েছেন। এস, চলে এস। ওদিকে আর এগুনো যাবে না। ওই ধ্বংস স্তুপের পরই নদী। তুমি যে নদী পার হয়ে এখানে এসেছ তাতেই গিয়ে পড়েছে ওই নদী।

তারপর আবার দিঘীর পাড় দিয়ে ঘুরে অন্য দিকে গেলাম। ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, পরিচ্ছন্ন ; ঘন সন্নিবিষ্ট। চন্দ মশায়কে দেখে অনেকে ভীড করে বেরিয়ে এল। তাদের চোহারা দেখে আশ্চর্য্য হলাম। কালো রঙ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চেহারা, যেন অতিকায় মানুষের একটা দল ইতিহাসের কোন বিস্মৃত কাল থেকে এইখানে অপরিবর্ত্তিত হয়ে পড়ে আছে! আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নজরে পড়ল। এই হস্তীযুথের মত কালো বিপুলাকৃতি মানুষের মধ্যে এক একটি ছেলে মেয়ের আশ্চর্য্য গৌর দেহবর্ণ। একদল অপরাজিতার মধ্যে এক একটি অতসী পুষ্পের মত।

সকলে সেই বিশাল দেহ আভূমি নত করে চন্দ মশায়কে প্রণাম করলে। তাদের ভিতর সব চেয়ে যে প্রবীণ সে হেসে বললে—এত সকালেই যে বেরিয়ে পড়েছেন আজ! সঙ্গে যে নতুন মানুষ দেখছি!

চন্দ মশায় বললেন—তাইতো বেরিয়েছি। ইনি আমার নতুন বাবা, তোদের বডবাবুর বন্ধু, আমার কাছে এসেছেন। তাই বললাম বাবা আমার গাঁ দেখে যাও। এখানে এসে ভবসুন্দরীকে আর নিধুকে না দেখে গেলে কি চলে?

নিধি হাসল। এই জ্ঞানেন্দু'র সেই নিধে তা হলে! শক্ত কালো চেহারার পাকা গোঁফ, ঝক্‌ঝকে দাঁত কি শোভাই না দিয়েছে।

নিধি বললে—তা বাবা যখন এসেছেন তখন দু' দিন বাবাকে রেখেই দেন ক্যানে! এই তো মায়ের পূজো ছামনেই। আর ক'টাই বা দিন! আজ ষষ্ঠী, আর তো ছ'টা সাতটা দিন।

চন্দ মশায় হেসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখি!

তারপর চন্দ মশায় বললেন—চলি রে নিধি! বেলা হয়েছে। বাবার জলখাবার সময় হয়েছে।

ফিরে নিজের বাড়ীর ভিতর আমাকে নিয়ে গেলেন চন্দ মশায়। মাটির কোঠা বাড়ী! চুন দিয়ে পলেস্তারা করা। দাওয়া-উঠোন সব সিমেণ্ট দিয়ে পালিশ করা। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগল উঠোনের পরিধি দেখে, আর সমস্ত উঠোন-বিস্তৃত ধানের মরাই দেখে। উঠোনের অন্য দিকে গোয়াল বাড়ী। গোয়ালে সারি সারি বলদ আর গরু, হৃষ্টপুষ্ট, নধর-দেহ। উঠোনে উঠোন-জোড়া সিদ্ধ ধান মেলা রয়েছে, চাল তৈরী হবে।

অন্দর মহল, গোলাবাড়ি, গোয়াল পার করে আমাকে নিয়ে গেলেন চন্দ মশায় ঠাকুর বাড়ীতে। ছোট্ট পাকা মন্দির। তাতে শালগ্রাম শিলা আছেন। চন্দ মশায় তৈরী করিয়েছেন। চন্দ মশায়ের দেখাদেখি আমিও প্রণাম করলাম। ঘরের ভিতর পুরোহিত পূজো করছেন ঘরের ভিতরের ছায়ান্ধকার সত্ত্বেও নজরে পড়ল। বাইরে থেকে চন্দ মশায় ডাকলেন—ঠাকুর মশায়!

পুরোহিত এসে বাইরে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এই কালো মানুষের দেশে এই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা কে নিয়ে এল! কাঁচা সোনার মত দেহবর্ণ, এই রৌদ্রতপ্ত অমার্জ্জিত গ্রামের পরিবেশ সত্ত্বেও কি অম্লান, কি চিক্কণ আছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তবু মেদ নাই শরীর শীর্ণও নয়। মাথায় চুলগুলি কাঁচাপাকা, ছোট ছোট। মাঝখানে সুপুষ্ট দীর্ঘ শিখা। শিখায় একটা ফুল বাঁধা। গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত। মানুষটি এসে চন্দ মশায়ের সামনে দাঁড়ালেন।

—কিছু বলছ না কি? চন্দ মশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন পুরোহিত মশায়।

চন্দ মশায় তাঁকে না ছুঁয়ে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করলেন। বললেন—হ্যাঁ, বলছিলাম। আজ ঠাকুরের ভোগের পরিমাণ একটু বেশী করে দেবেন। কলকাতা থেকে এই বাবা এসেছেন। আমাদের জ্ঞানেন্দু'র বন্ধু। ব্রাহ্মণ! উনিও ঠাকুরের প্রসাদ পাবেন।

হাসলেন ঠাকুর মশায়!—বেশ কথা! তাই হবে। ঠাকুর তা হলে আজ আর একটু ভাল করে ভোজন করুন! তুমি তো ঠাকুরের অভাব কিছু রাখ নাই! তবু ঠাকুর আজ দুটো বেশী করে ভাজাভুজি খান। যাই তা হলে একবার ছোট বউমার কাছ থেকে ঘুরে আসি। আর কিছু সামগ্রী নিয়ে আসি রান্নার জন্যে।

চন্দ মশায় বললেন—তাই করুন তা হলে! তারপর আমাকে বললেন—

এস বাবা, এইবার আমার কাজ শেষ হয়েছে। এইবার তো গ্রামের সব দেখা হল তোমার। এইবার কাহিনীটা বলব তোমাকে!

চন্দ মশায়ের পিছন পিছন যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা আপনি পুরোহিত মশায়কে এমন করে প্রণাম করলেন কেন?

—প্রণাম করলাম কেন? ওরে বাবা, উনি শুধু আমাদের পুরোহিত নন উনি যে আমার সাক্ষাৎ গুরুপুত্র, গুরুবংশ।

চন্দ মশায় আবার আমাকে নিজের নির্জ্জন ঘরে নিয়ে এলেন গ্রাম-পরিক্রমা শেষ করে। হাত পা ধুয়ে গামছায় পা মুছে, আমাকে ধোবার অনুরোধ করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি হাত-পা ধুয়ে দাঁড়াতেই আমাকে ডাকলেন —এস বাবা, আমার ঘরে এস।

তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মস্ত প্রকাণ্ড ঘরখানা। পরিচ্ছন্ন ধবধব করছে চারিদিক, একটা কুটো পড়ে নেই কোথাও। আর একটা জিনিস খুব আশ্চর্য্য লাগল দেখে। সমস্ত ঘরখানা আশ্চর্য্য রকম নিরাভরণ। দু'খানা কম্বল, এক কোণে একটা দড়িতে থান দুই কাপড়, তাকে দোয়াত কলম কাগজ। ছোট্ট আয়না একখানা, আর নিতাই-গৌরের একখানি ছোট্ট বাঁধানো ছবি ঝুলছে দেওয়ালে। দুখানা কম্বলের একখানা পেতেছেন চন্দ মশায় মেঝের উপর। ঘরে ঢুকতেই আমাকে আহ্বান জানালেন—এস বাবা, বস।

বসলাম। চন্দ মশায় বললেন—তোমাকে এই ভবসুন্দরীর কাহিনী বলব। সব তো শেষ হবে না আজকে। তুমি আজকের দিনটা থেকে যাও।

আপ্যায়িত হলাম। বললাম—আপনি হুকুম করলেই থেকে যাব। নিশ্চয় থাকব। বলুন।

চন্দ মশায় সত্যিই খুসী হলেন। একবার আমার মুখের দিকে অতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইতেই বুঝলাম সেটা। কিন্তু আশ্চর্য্য, একি! একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাকালেন তো তাকিয়েই থাকলেন। তাকিয়ে থাকতে তাঁর চোখ ছোট হয়ে ঝাপসা হয়ে এল। জল এসে পড়েছে চোখে।

আমি অস্বস্তি অনুভব করে নড়ে চড়ে বসলাম। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললাম—কি দেখছেন অমন ক'রে?

তিনি আপনার দুই চোখ কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছে আস্তে আস্তে সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিলেন, আমাকে বললেন—কিছু না বাবা! কেবল

মনে হচ্ছিল আমার দু'টো ছেলের একটাও যদি তোমার মত আধখানাও হত!

কি বলব! চুপ করেই রইলাম। তিনি অকস্মাৎ সব যেন ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—জয় ভবসুন্দরী! শোন আরম্ভ করি এবার!

চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল বাইরের চাঁপা গাছে ক'টা পাখী ডাকছে। মাঝে মাঝে অনেক দূরে কখনও গরুর ডাক, কখনও মানুষের অন্য মানুষকে আহ্বানের ক্ষীণ ধ্বনি ভেসে আসছে। চন্দ মশায় উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আবার এসে বসলেন। বললেন—অতি গুহ্য কথা। কেউ জানে না, কারও জানার অধিকারও নাই। ভবসুন্দরীর অনুগৃহীত মানুষ জানতে পাবে শুধু।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। আমি কি করে ভবসুন্দরীর অনুগৃহীত হলাম জানি না। অনুগ্রহ না চাইতে নিজের অজ্ঞাতে অনুগ্রহ পেলাম—এ কেমন কথা!

চন্দ মশায় আমার দৃষ্টিতে যে প্রশ্ন ছিল তাকে এড়িয়ে গিয়ে তখন বলতে আরম্ভ করেছেন—

—অনেক দিন আগেকার কথা। কতদিন আগের কথা তা বলতে পারব না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তখন রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর এক সামন্ত, নাম চন্দ্র রায়, তিনি ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধে বহু সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ অন্তে গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজের অনুমতি নিয়ে নিজের দেশ কোশল পরিত্যাগ করে পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন গুরু, সঙ্গে চলেছে চারশো শবর সৈন্য। সঙ্গে এক কপর্দ্দক অর্থ নাই। তবে দশটি অশ্বের পিঠে স্বর্ণ পেটিকায় সরস্বতীর আশীর্ব্বাদী পুষ্প আর মালা। সে পেটিকাগুলি বন্ধ করেছেন গুরু নিজে। নিয়ে চলেছেন শিষ্যের জন্য। রাজা চন্দ্র রায় ক্ষত্রিয়, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা সকলেই শবর।

পূর্ব্ব দিকে চলতে চলতে দীর্ঘ সাত বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। চলেন, থামেন আবার চলেন। দলের সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। তখন তাঁরা অঙ্গ দেশে এসে পৌচেছেন! কিন্তু যাত্রার বিরাম নাই। সামনেই বর্ষার গঙ্গা। চন্দ্র রায় পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে গুরুর মুখের দিকে তাকালেন। প্রশ্ন এই—আরও অগ্রসর হতে হবে?

গুরু তাঁর প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলেন। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন—যদি তোমার সংশয় হয়ে থাকে তবে আর অগ্রসর হ'য়ো না।

চন্দ্র রায় গুরুকে প্রণাম করে বললেন—না প্রভু, সংশয় আমার নয়। সংশয় আমার সঙ্গী শবর বাহিনীর। তারা বলছে—সমাজ, আত্মীয় সকলকে পরিত্যাগ করে এ আমরা কোথায় চলেছি কোন মায়া মরীচিকার উদ্দেশে?

গুরু হেসে বললেন—বৎস, এই এক যুগ পূর্ব্বে ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্ব-রূপ দেখিয়েছিলেন। সে ভয়াল-সুন্দর সত্যকে আমি দেখি নাই। আমার দেখার পুণ্য, চরিত্র কিছুই নাই। আমি শুধু এই ত্রিলোকের মূলীভূতা, সকল সৌন্দর্য্য, সমস্ত প্রজ্ঞার আধার দেবী নীল-সরস্বতীকে, তারাকে অর্চ্চনা করেছি। সেই মন্ত্রে দীক্ষা দেব তোমাকে। সে মন্ত্রে দীক্ষা দেবার অনুকূল স্থানও দেবী আমাকে জানিয়েছেন। সে স্থান আরও পূর্ব্বে। তোমাকে রাজা করে দেব, সম্পদ দেব এমন কোনও প্রলোভন তো আমি দেখাইনি বৎস!

চন্দ্র রায় আবার গুরুকে প্রণাম করলেন—অপরাধ নেবেন না প্রভু। আমার ভুল হয়েছিল। দলের যারা সংশয়াপন্ন তারা যদি দেশে ফিরে যেতে চায় যাক।

আদেশ মাত্র প্রায় সমস্ত শবর অনুগামী তাঁদের ত্যাগ করে কোশল অভিমুখে পশ্চিম মুখে যাত্রা করলে। যাত্রার মুহূর্ত্তে তারা চেষ্টা করেছিল, স্বর্ণ পেটিকাবদ্ধ সরস্বতীর মন্ত্রপূত মালা আর আশীর্ব্বাদী কেড়ে নেবার। গুরু আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি চন্দ্রকে নিয়ে খড়্গাঘাতে তাদের শেষ করলেন। বাকী থাকল মাত্র ত্রিশজন।

গুরু এবং চন্দ্র রায় সেই ত্রিশজন অনুগামীকে নিয়ে পূর্ব্ব দিকে আবার যাত্রা করলেন। তারপর ধীরে ধীরে গুরুর ইঙ্গিতে একদা সন্ধ্যায় তাঁরা এই উত্তরে ও দক্ষিণে নদী-বেষ্টিত, ঘন-অরণ্য-সমাকুল ভূমিতে এসে পৌছুলেন। সূর্য্য তখন সদ্য অস্তাচলগত! গুরু এক ভীমকায় প্রস্তরখণ্ডের কাছে অশ্ব থেকে নেমে শিষ্যকে আদেশ দিলেন—অবতরণ কর।

শিষ্য এবং শবর অনুগামীরা তখন পথশ্রমে ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত।

গুরু বললেন—এই নাও তারার ধ্বজদণ্ড এই প্রস্তর বেদিকার পাশে মৃত্তি-কায় প্রোথিত কর।

শিষ্য বললেন হাত জোড় করে—প্রভু, অনুমতি করুন, হাত মুখ ধুয়ে ক্লান্তি দূর করি, নদীতে অবগাহন স্নান করে তৃষ্ণা নিবারণ করি, তারপর গুরু-বাক্য পালন করব।

গুরু কঠোর স্বরে বললেন—গুরু আজ্ঞা পালন কর। এই মুহূর্ত্তে! মাহেন্দ্র-ক্ষণ অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। নম্র চিত্তে মা তারাকে স্মরণ করে এই মুহূর্ত্তে

এই ধ্বজদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত কর। প্রার্থনা কর—মা, তুমি আমাকে আমার আত্মার ও দেহের তৃষ্ণার শান্তিবারি দাও।

চন্দ্র রায় গুরুকে প্রণাম করে, মা তারাকে স্মরণ করে ধ্বজদণ্ড সেই মুহূর্ত্তে মৃত্তিকায় প্রোথিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকার কোন্ তলদেশ থেকে পাতাল-বাহিনী ভোগবতীর ধারা ধ্বজদণ্ডের চারিপাশ দিয়ে ঊর্দ্ধমুখে আকাশ সমান হয়ে উৎক্ষিপ্ত হল।

গুরু চঞ্চল হয়ে বললেন—ঐ জলে অবগাহন কর। পান কর ঐ তৃষ্ণার বারি। এই সন্ধ্যার মুখে মাহেন্দ্র-ক্ষণে ভোগবতীর জলে তোমার অভিষেক হল। এই ভূমির নাম হোক সন্ধ্যাজল।

তারপর সেইখানে সেই শবর অনুগামীদের দিয়ে পত্তন হল নূতন জনপদ। সেখানে রাজপ্রাসাদ তৈরী হল না, বিপনি হল না। তৈরী হল ছোট ছোট কুটিরের শ্রেণী। গুরুর নির্দ্দেশ। এ তো রাজ্যস্থাপন নয়, এ দেবী তারার সাধন পীঠ।

শিষ্যকে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, ছোট একটি জনপদের পত্তন করে গুরু চলে গেলেন। যাবার সময় শিষ্যকে সাবধান করে গেলেন, বললেন—তোমাকে মন্ত্র দিয়ে গেলাম। এ ক্ষুরস্য ধারা। চিত্ত সংযত করে এই মন্ত্র জপ কর। ত্রিলোকের সমস্ত প্রজ্ঞার তপস্যা এ। এর মধ্যে কাম নাই, লোভ নাই। নারী নাই, সম্পদ নাই। এই মন্ত্র জপ কর। আর সদ্‌বংশের কন্যা দেখে বিবাহ কর। সংসারধর্ম্ম, জীবসৃষ্টি, প্রজাবৃদ্ধি অব্যাহত রাখ। আমি চললাম।

চন্দ্র রায় হাত জোড় করে বললেন—প্রভু আর দেখা হবে না আপনার সঙ্গে?

গুরু হাসলেন, বললেন—জানি না। ভবিষ্যৎ তো জানি না। সে তারা তাঁর ত্রিনয়নের আলোয় যদি দেখান দেখতে পাব। তবে তোমার যদি সিদ্ধি হয় তবে সেদিন ঠিক আসব।

হাত জোড় করে শিষ্য বললেন—প্রভু, যদি হয় কেন বলছেন? আপনি মন্ত্র দিলেন, আপনার শক্তির মাহাত্ম্য দেখেছি, তবু আমার সিদ্ধি হবে না?

—জানি না বৎস। তবে আশীর্ব্বাদ করি তোমার সিদ্ধি হোক।

গুরু চলে গেলেন। চন্দ্র রায়ের তপস্যা আরম্ভ হল। সাত বৎসর চলল তপস্যা। এরই মধ্যে গুরুর আদেশে বিবাহ করেছেন। একটি সন্তানও হয়েছে। গৃহধর্ম্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্র সাধনা করে চলেছেন।

সে বৎসর চন্দ্র গৃহ ত্যাগ করে সেই ধ্বজদণ্ডের পাশে এসে বসলেন এক

বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে তপস্যার জন্য। তিনি তপস্যায় বসেছিলেন মহালয়ার দিনে।

তখন নদী খুব কাছে ছিল, গভীর জঙ্গলে সমাকীর্ণ সমস্ত স্থান। সেইখানে মহালয়ার দিনে চন্দ্র বসলেন। মাথার উপর দিয়ে শরতের হালকা মেঘ পার হয়ে গেল, হেমন্তের দিনে পাকা ফসলের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠে বাতাস উতলা হল, চন্দ্র এক মনে হোমকুণ্ডে অনির্ব্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রেখে জপ করে চললেন।

কেবল একবার হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করে দেবীকে নিবেদন করে প্রসাদ গ্রহণ করেন তিনি। স্ত্রীর পর্য্যন্ত মুখ দর্শন করেন না। সমস্ত মুখ দাড়ি গোঁফে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, মাথার চুলে জটা ধরল। শীত এল, অতি কঠিন শীত। সেই শীতেও ক্লিষ্ট দেহে জপ করে চললেন তিনি। তারপর এল দুরন্ত গ্রীষ্ম। গ্রীষ্মের সমস্ত উত্তাপ মাথায় করে পঞ্চতপা করলেন চন্দ্র। বর্ষার দিনে নদীর প্লাবন এল নিকট পর্য্যন্ত। স্ত্রী একান্ত অনুরোধ করে পাঠালেন আসন সরিয়ে পাতবার জন্য। শুনে চন্দ্র একটু হাসলেন মাত্র। সেই ধ্বজদণ্ডের পাশে চারিদিকে বর্ষার প্লাবনের জলরাশি নিয়ে সিক্ত দেহে অগ্নিকে মাত্র আচ্ছাদিত করে অনির্ব্বাণ রেখে ছেদহীন জপ করে চললেন।

বর্ষা গেল। আবার শরৎ এল। পিতৃপক্ষ পার হয় হয়। চন্দ্র প্রত্যাশা করেছিলেন এইবার বৎসরান্তে সাধনার সিদ্ধি আসবে। কিন্তু কৈ, কোথায়? এর চেয়ে আর কঠিন কোন্ সাধনা আছে?

অনেক ভাবলেন চন্দ্র। হয়েছে। একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণও বন্ধ করলেন তিনি। শুধু ঐ ধ্বজদণ্ডের পাশ দিয়ে যে জল মধ্যে মধ্যে তারার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বেরিয়ে আসে সেই জল মাত্র আহার হল।

মহালয়া থেকে তাই আরম্ভ করলেন চন্দ্র। আর আসন ত্যাগ করলেন না। সমস্ত মানুষের আগমন শুদ্ধ নিষেধ করে দিলেন।

এমনি করে দিন চলল। এদিকে দিন থেকে অন্যদিনে চন্দ্রের দেহ দুর্ব্বল হতে দুর্ব্বলতর হল, অন্যদিকে দেবীপক্ষের চন্দ্র কলায় কলায় বাড়তে লাগল। হোমকুণ্ডের পাশে আর বসে থাকতে না পেরে চন্দ্র মৃত্তিকায় শুয়ে পড়লেন! দশমী গেল, একাদশী গেল, দ্বাদশী গেল, ত্রয়োদশী শেষ হয়ে সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ তখন সদ্য উঠছে।

চারিদিক অন্ধকার! চারিদিকে অরণ্যের মধ্যে জন্তুর আর সরীসৃপের সঞ্চরণের শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে ছেদহীন ঝিল্লী-

ঝঙ্কারে ত্রিভুবন যেন সমাচ্ছন্ন। এমন সময় যেন কে এসে দাঁড়াল ধ্বজদণ্ডের পাশে।

চন্দ্রের অনুভবের শক্তি তখন প্রায় বিলুপ্ত। অনন্ত ঝিল্লীঝঙ্কারের মধ্যে তিনি তখন মহা-পরিণামের গান শুনছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তৃষ্ণার্ত্ত হয়ে তিনি শেষবার মন্ত্রঃপূত পানীয় পান করবার জন্যে পাশ ফিরলেন।

হোমকুণ্ডের অস্ফুট রক্তাভ আলোয় তিনি দেখলেন কে দাঁড়িয়ে কাছেই। তিনি ভাবলেন বোধহয় স্ত্রী এসেছেন তপোভঙ্গ করতে। তিনি অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে গর্জ্জন করে উঠলেন—কে তুমি?

—আমি? কথার সঙ্গে সঙ্গে হাসি। যেন সহস্র বীণা একসঙ্গে গান পেয়ে উঠল।

যিনি কথা বললেন তাঁর দেহ যেন এক মুহূর্ত্তে জ্যোৎস্নার মত আলোয় অস্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই অস্পষ্ট আশ্চর্য্য আলোয় চন্দ্র আলোকমণ্ডলের মধ্যস্থিতাকে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনিই কথা বললেন এবার। কথায় যেন কত কাতরতা! তিনি বললেন—আমায় একটু জল দেবে? বড় তৃষ্ণার্ত্ত আমি!

—জল? আপনি জল পান করবেন? চন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলি পাতলেন ধ্বজদণ্ডের কাছে। ভোগবতীর ধারা প্রার্থনা মাত্রেই উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁর হাতে এসে পড়তে লাগল।

চন্দ্র বললেন—আপনি অঞ্জলি পাতুন। আমি আমার অঞ্জলি থেকে ঢেলে দি।

তিনি অঞ্জলি পাতলেন, চন্দ্র অঞ্জলি থেকে জল ঢেলে দিলেন। ঢেলে দিতে গিয়ে আশ্চর্য দেহগন্ধ তাঁর নাসারন্ধ্রের পথে তাঁর মস্তিষ্কে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে অনাহার, অনিয়ম, এবং দীর্ঘ দিনের কৃচ্ছ্র সাধনের সমস্ত কষ্ট এক মুহূর্ত্তে দূর হয়ে গেল।

তিনি জল পান করে পাশেই সেই বৃহৎ পাথরের উপর বসলেন। চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশের উপর তখন খানিকটা উঠে এসেছে। যিনি বসেছিলেন পাথরের উপর এক অস্ফুট আশ্চর্য্য আলোকমণ্ডলের কেন্দ্রবর্ত্তিনী হয়ে তিনি বললেন—এত ক্লেশ, এত কৃচ্ছ্র কেন করলে? আমি তো তোমার সঙ্গেই আছি সর্ব্বদা! তোমার প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম্মে আছি, তোমার চিত্তে আছি, তোমার এই দীর্ঘ তপশ্চারণের মধ্যে তোমার সঙ্গেই থেকেছি কায়াহীন হয়ে। আজ তোমার জন্যে কায়া ধারণ করতে হল! বল কি চাই।

স্থির হয়ে চন্দ্র বুঝতে পারলেন সিদ্ধি এই মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি দেখছিলেন দেবীকে! তাঁর আশ্চর্য্য দিব্য দেহগন্ধ এইমাত্র তিনি অতি সন্নিকট থেকে অনুভব করেছিলেন! কি রূপ! দীর্ঘাঙ্গী, গৌরী, ললিতছন্দা, বিদ্যুত-বল্লরীর মত। দেহে যেন কিশোরীর পবিত্রতা, অথচ পরিপূর্ণ যৌবনবতী! মুখে কিশোরীর অনুপম লাবণ্য, অথচ কি স্থির প্রজ্ঞা! চন্দ্র রাজকুলের বহু বধূ ও কন্যাদের দেখেছেন! কিন্তু এ দিব্য রূপের তুলনা কোথায়?

চন্দ্রের মনে হল দেবী তাঁর মনোভাব যেন বুঝে নিয়েছেন। তিনি যেন অল্প অল্প হাসছেন। চন্দ্র ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠলেন। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? তারা?

দেবী সকৌতুকে ঘাড় দুলিয়ে বললেন—না। আমি তারার কন্যা, আত্মজা, সখী, সহচরী! আমি ভবসুন্দরী!

—কিন্তু আপনাকে তো আমি ডাকিনি।

—আমি তারার মর্ত্তলোকের রূপ! পৃথিবীর প্রজ্ঞা, সুষমা ও সৌন্দর্য্যের আধারস্বরূপা আমি! আমি ভবসুন্দরী। আমাকে ডেকেছ কেন? কি চাই তোমার?

অকস্মাৎ চন্দ্রের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—তোমাকে। তিনি নিজে কি বললেন তাও সঠিক অনুধাবন করতে পারলেন না তিনি।

দেবীর মুখ বিস্ময়ে ভয়ে যেন বর্ণহীন হয়ে গেল। তিনি তবু হেসে বললেন—মূর্খ, কি চাইছ তার অর্থ বুঝছ না তুমি। আমি তো তোমারই। অনুক্ষণ কায়াহীন হয়ে তোমার মধ্যে ছিলাম, তুমি আমার উপস্থিতি সজ্ঞানে অনুভব করতে পারতে না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি এই মুহূর্ত্ত থেকে তুমি আমার উপস্থিতি তোমার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ সজ্ঞানে অনুভব করতে পারবে। তোমার কল্যাণ হোক!

দেবী চলে যাবার জন্যে প্রস্তর-বেদিকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দ্রের মন এক মুহূর্তে দেবীর অদর্শন কল্পনা করে হাহাকার করে উঠল। এই অপরূপ দিব্য দেহ-বল্লরী এখনই অন্তর্হিত হয়ে যাবে? আর কখনও দেখতে পাবেন না এই হাসি, এই রূপ, এই সুষমা। চন্দ্র আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—কোথায় যাচ্ছ তুমি? তুমি যা দিয়েছ তা তো আমি নিই নি।

দেবী চলে যেতে যেতে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতে হল তাঁকে। ফিরে বললেন—তবে কি চাও তুমি?

অবুঝ শিশুর মত চন্দ্র বললেন—আমি তোমাকে কায়াহীন ভাবে আমার নিজের মধ্যে অনুভব করতে চাই না, তোমাকে পৃথক ভাবে তোমার ঐ দিব্য কায়া শুদ্ধ তোমাকে পেতে চাই।

দেবীর মুখে অতি নিষ্ঠুর হাস্য ফুটে উঠল, আবার মিলিয়ে গিয়ে মুখখানি অত্যন্ত কোমল বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তিনি ফিরে এসে প্রস্তর-বেদিকার উপর বসলেন আবার।

চন্দ্রের মুখের দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—ছি, অবুঝ শিশুর মত কথা বলো না। তোমাকে দিব্য-জ্ঞান দিয়েছি, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যবোধ দিয়েছি। তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে। আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি রাজা হবে। তুমি সংসারে দ্বিতীয় রাজর্ষি জনক হয়ে মর জীবন যাপন কর। আমার আশীর্ব্বাদে তোমার মর জীবন দিব্য জীবন হয়ে উঠবে। আমি চললাম।

চন্দ্র তখন সেই আশ্চর্য্য রূপ দেখে মোহগ্রস্ত। তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন—আমার রাজ্যে, সংসারে, স্ত্রীতে, পুত্রতে, ইহলোকে, পরলোকে কিছুতেই কোন প্রয়োজন নাই। আমি কায়াময়ী তোমাকে চাই!

যখন চন্দ্র এই কথা বলছিলেন তখন দেবী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলেন। চন্দ্রের কথা শেষ হলেও তাঁর সে বিস্ময় দূর হল না। তিনি বিষণ্ণের মত মাথা নেড়ে বললেন—মূঢ়, তুমি কি চাইছ তুমি নিজেই জান না। তারপর অত্যন্ত সকাতর মিনতি করে বললেন—চেও না। তুমি যা চাইছ চেও না! তা চাইতে নাই!

চন্দ্র অত্যন্ত কঠিন হয়ে বললেন—দেবী, তোমাকে না চেয়ে যদি আমি তোমার দেওয়া জ্ঞান নিয়ে তুষ্ট থাকি তবে কাল কেন, আজই, তোমার অন্তর্ধ্যানের পর তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি আত্মহত্যা করব। যদি বা বেঁচে থাকি তবে জন্ম-জন্মান্তর নিজেকে ধিক্কার দেব তোমাকে চাইনি বলে। তুমি কি আমাকে এমনই মূর্খ মনে কর যে আমি যা পাবার তার অংশমাত্র পেয়েই সন্তুষ্ট হব?

দেবীর ঠোঁটে সেই পূর্ব্বের নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল। তিনি সেই হাসি হেসে বললেন—তোমার কায়াময়ী আমাকে ছাড়া অন্য কিছুতে তৃপ্তি হবে না? বেশ! কিন্তু তার পরিবর্ত্তে আমি যা চাইব আমাকে দিতে পারবে?

অকম্পিত ভাবে চন্দ্র বললেন—পারব।

—এ জন্মে তুমি আমাকে পাবে না। এ জন্মের তোমার এই সাধনাসিদ্ধ

দেহ পার্থিব ভোগে কলঙ্কিত হবে না। পরজন্মে আমাকে পাবে তুমি। তুমি সম্মত?

—সম্মত।

—পরজন্মে আমি ঐ শবর কুলে ব্রাত্য হয়ে জন্ম নেব। নিজের উচ্চ বংশ থেকে তোমাকে আমাকে ঐ নীচ কুল থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। পারবে?

—পারব।

—শুধু তাই নয়। আমি সঙ্কর কন্যা হয়ে জন্ম গ্রহণ করব। তাতেও আমাকে তুলে নিতে পারবে?

—পারব।

—আমার জন্যে তোমাকে সম্পদ, রাজ্য, প্রতিষ্ঠা, সম্মান সব ত্যাগ করতে হবে।

—করব। কিন্তু পরজন্মে আমি বুঝব কি করে যে আমি পূর্ব্বজন্মের সাধনার পুণ্যফলে ভবসুন্দরীকে পেলাম?

—তুমি জাতিস্মর হয়ে জন্মাবে। কিন্তু কেউ জানবে না। তুমি ঠিক আমাকে চিনতে পারবে।

—যদি আমার এক জন্মে তোমাকে পেয়ে তৃপ্তি না হয় তবে—

এবার দেবীর মুখের নিষ্ঠুর হাসি মিলিয়ে গেল। মুখ কেমন হয়ে গেল তাঁর। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললেন—আমি জন্ম জন্ম তোমার জন্যে ঐ শবর কুলে কালো মানুষের মধ্যে গৌরী রূপ ধারণ করে সঙ্কর কন্যা রূপে জন্ম নেব।

চন্দ মশায় এই পর্য্যন্ত বলছেন এমন সময় বাইরে কার মৃদু কণ্ঠের আওয়াজ হল—কর্ত্তা মশাই? কর্ত্তা মশাই আছেন?

মৃদু বিনীত কণ্ঠস্বর। স্ত্রীলোকের কণ্ঠ।

চন্দ মশাই উঠে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। আমিও যেন কোন্ স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে, পুরানো কাল থেকে আধুনিক কালের জোয়ারের টানে ভেসে ফিরে এলাম। ধূমপান করার প্রয়োজনে আমিও চন্দ মশায়ের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম।

দেখলাম একটি সুগৌর তরুণী দাঁড়িয়ে আছে দুধের ঘটি নিয়ে।

বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম মেয়েটি আমাকে দেখে কেমন

জড়োসড়ো হয়ে নিজের শাড়ীর প্রান্তদেশ দিয়ে নিজের উর্দ্ধাংটা সম্পূর্ণ আবৃত করার চেষ্টা করে মাথাটি নামালে। বোধ হয় লজ্জায়। অত্যন্ত লজ্জাশীলা পাড়া গাঁয়ের মেয়ে। চন্দ মশায় দুধের জন্য একটি মাজা কড়াই তার কাছে বারান্দার উপর নামিয়ে দিলেন। হাতের ঝকঝকে করে সোনার মত মাজা ঘটিটি থেকে সে দুধ ঢেলে দিলে। আমি বেরিয়ে গেলাম। এবং বাইরে নিরিবিলি আরাম করে একটি সিগারেট ধরালাম।

সিগারেট খেতে খেতে পায়চারী করছি এমন সময় দেখলাম মেয়েটি দুধের খালি ঘটিটি হাতে করে মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসছে। তার লজ্জা যায় নাই। সে জানে লজ্জার ও সমীহের কারণ স্বরূপ আমি দরজার ঠিক বাইরেই কোথাও আছি।

সে বেরিয়ে ইতস্ততঃ চেয়ে নিঃশব্দ দ্রুতপদে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। একবার মুখ তুলে প্রশ্ন করলে—আপনি বড দাদাবাবুর বন্ধু ?

বডদাদাবাবু ? কে ? ওঃ ! হঠাৎ মনে পডল বডদাদাবাবু মানে জ্ঞানেন্দু। আমি নিজে কথা সংশোধন করে বললাম—হ্যাঁ, জ্ঞানেন্দু আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়েছি আমরা !

চারি পাশ দেখে নিয়ে অত্যন্ত সকাতর ভাবে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে গলা নামিয়ে—আচ্ছা, বড় দাদাবাবু ভাল আছেন ? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মেয়েটির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

আমি এক মুহূর্ত্তে মেয়েটির প্রশ্নের অনাদ্যন্ত ইতিহাস বুঝে ফেললাম। আমি তার লজ্জা দেখে বুঝে নিলাম এ মেয়েটির সেই ভূতটার সম্পর্কে দুর্ব্বলতা আছে। আমি সহজভাবে বললাম—ভালই আছে সে !

—ভাল আছেন ? আমি এর আগে শুনেছিলাম যে তাঁর অসুখ করেছে ! সেই জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম।

মেয়েটি আর কথা না বাড়িয়ে সন্তর্পণে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আমি সিগারেটটা পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভিতর চলে এলাম। মনে একটি বিচিত্র, সুস্বাদু, সুগোপন সত্যের অনুভব ও প্রসাদ নিয়ে চন্দ মশায়ের কাছে গিয়ে বসলাম।

চন্দ মশায় বললেন—বস বাবা। মেয়েটা এসে গল্পটায় ব্যাঘাত করে দিয়ে গেল। আমি কাঁচা দুধ খাই কি না। তাই মেয়েটা কাপড় ছেড়ে নিজে গরু দুইয়ে আমায় দিয়ে যায়। মেয়েটি বড় ভক্তিমতী, আমাকে বড় ভক্তি করে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটি কে চন্দ মশায় ?

—ও আমাদের নিধির মেয়ে। মেয়েটা খুব আশ্চর্য্য মেয়ে জান ! ওদের মেয়েদের বিয়ে হয় বড় হয়েই, নিজেদের ইচ্ছায় ! মেয়েটা বড় হল যখন আর বিয়ে করলে না কিছুতেই। ওর নাকি কাউকেই পছন্দ হয় না !

আমি হাসলাম। কেবল আশ্চর্য্য মনে হল এই ভেবে যে যা কেউ জানে না তা আমি কেমন এক মুহূর্ত্ত আগে জেনে ফেলেছি।

চন্দ মশায় আবার গল্পে ফিরে এলেন।

—দেবী চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। যাবার আগে বললেন—এবার যাই আমি ?

চন্দ্র তখন পাথরের মূর্ত্তির মত ধ্বজদণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে। দেবী প্রস্তর বেদিকা থেকে নেমে দাঁড়িয়েছেন। চন্দ্রের মুখ বর্ষার আসন্ন-বর্ষণ মেঘের মত ভয়াল। বর্ষার মেঘের গুরু গুরু মৃদঙ্গ-ধ্বনি তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল, যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন—তুমি যাবার অনুমতি চাইলেই কি আমি সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে অনুমতি দিতে পারি ? তুমি খুব ভাল করেই জান তোমার অদর্শনের পর মুহূর্ত্তে আমি আমার মৃত্যু কামনা করব ! আমি আমার ইহকাল, পরকাল, জন্ম-জন্মান্তর, সম্পদ-রাজ্য, কুল-পবিত্রতা সব তোমার হাতে তুলে দিয়েছি। তুমি কি মনে কর তোমার বাহ্য রূপ দেখেই আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার ঐ সুন্দর দেব-দেহের অন্তরালে যে দেব-হৃদয় আছে আমার সব দিয়েও কি তার উপর এতটুকু অধিকার জন্মাল না ? তোমার দেব-হৃদয় কি পাষাণে তৈরী ?

দেবী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পদ্মফুলের চেয়ে সুন্দর মুখখানি যেন কেমন হয়ে গেল ! তিনি অতি বিষণ্ণ মুখ তুলে চন্দ্রের মুখের দিকে তাকালেন। কোন কথা বললেন না। চন্দ্রের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুই চোখ জলে ভরে এল। তারপর তিনি বললেন—কি বলব তোমাকে ! দেবলোকে এ সর্ব্বস্ব-ঢেলে-দেওয়া প্রেম কোথায় পাব ? সেখানে সকলেই সম্পূর্ণ ; তাই পরিতৃপ্ত, উদাসীন। এই উন্মাদ আহ্বান, এই স্বর্গীয় অতৃপ্তি তারা কোথায় পাবে ? আমি তোমার সব নিয়ে যাচ্ছি। তার সঙ্গে নিয়ে গেলাম তোমার ব্যথা ! তোমার ব্যথা স্মরণ করে তোমার সঙ্গ, তোমার প্রেমের কামনায় আমি মর্ত্ত-লোকে আসার জন্যে অধীর হয়ে থাকব !

চন্দ্র আর পারলেন না। তিনি যে এ জন্মে মিলন না হবার সত্যে

রাজ্যবন্দী সে কথা ভুলে গেলেন। তিনি হা হা করে কেঁদে ছুটে গিয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের বুকের সঙ্গে দেবীর দুই পা নিজের হাত দিয়ে আলিঙ্গন করে ধরলেন। কিন্তু কোথায় দেবী! শুধু শরতের জ্যোৎস্নার নির্ম্মল আলোয় শূন্য বনভূমি আলোকিত হয়ে পড়ে রইল। শুধু দেবীর দেহের জ্যোতি জ্যোৎস্নায় মিশে রইল, আর দেবীর দেহের পদ্মগন্ধে বনভূমি তখনও আকুল হয়ে দেবীর স্মৃতিকে বুকে ধরে স্তব্ধ হয়ে আছে ছবির মত।

চন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে প্রস্তর-বেদিকার কাছে ছুটে গেলেন। দেখলেন প্রস্তর বেদিকায় তখনও জলের চিহ্ন। দেবীর অশ্রুজল। চন্দ্র উন্মাদের মত সেই অশ্রুসিক্ত প্রস্তর বেদিকায় নিজের মুখ ঘষতে লাগলেন। বার বার চুম্বন করলেন সেই প্রস্তরবেদিকায়। তারপর দেবীর দেহগন্ধে আকুল বনভূমিতে উন্মাদের মত ছুটে ছুটে বেড়ালেন। শেষে সেই জ্যোৎস্নালোকিত নির্জ্জন বনভূমিতে পরজন্মের জন্য আকুল চন্দ্র ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

কখন যেন অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল কে যেন তাঁর ঘুমের মধ্যে তাঁর ক্লান্ত উত্তপ্ত ললাটে আপনার পদ্ম হস্ত বুলিয়ে দিচ্ছিল। হ্যাঁ, এখনও তো সেই দিব্য দেহ-গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। তিনি যেন হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন। তা হলে? তা হলে সে তাঁকে ছেড়ে যায়নি! মায়াবিনী তা হলে তাঁর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে আছে?

কিন্তু এ গন্ধ কত অম্লান! কোথা থেকে আসছে এ গন্ধ? তাঁরই মধ্য থেকে? তাঁরই দেহ থেকে? তা হলে? তা হলে মায়াবিনী তাঁর সব নিয়ে তাঁরই প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁরই হৃদয়ে বন্দী হয়ে রইল? তাইতো আছে! কিন্তু তাঁকে বাইরে না দেখে তিনি বাঁচবেন কি করে? আর তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই! এই দিব্য গন্ধ কেবল তাঁরই স্মৃতি দিয়ে তাঁকে পীড়ন করবে।

তিনি নিজের সমস্ত বেদনাকে নিজের মধ্যে সম্বৃত করে নিয়ে বনভূমি থেকে বের হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার আগে প্রস্তরবেদিকায় বারবার পরম আদরে চুম্বন করলেন। তারপর ধ্বজদণ্ডের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করে অঞ্জলি পাতলেন। স্নান করে ঘরে ফিরবেন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে, জন্মান্তরের জন্য আকুল প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু এ কি! ধ্বজদণ্ডের নিম্নদেশে ভোগবতীর ধারা আজ তাঁর প্রার্থনা শুনে আশীর্ব্বাদের অঞ্জলি পাঠালে না তো! সে ধারার উৎস মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে! একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে তিনি বনভূমি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন গৃহাভিমুখে! তিনি শান্ত হয়েছেন, ভবিতব্যকে মেনে নিয়েছেন তিনি।

বন থেকে বেরুতেই দেখলেন ছুটি মানুষ তাঁরই দিকে আসছে। কে ওরা? এখানকার মানুষ তো নয়! এখানকার মানুষ, তাঁর চিরদিনের সঙ্গী যারা তারা তো ঐ শবরের দল, কৃষ্ণকায় ওরা! কিন্তু দুজনের দেহে প্রভাত সূর্য্যের আলো পড়ে তাদের দেহের উজ্জ্বল দেহবর্ণ ঝলমল করছে।

দুই উজ্জ্বল গৌরকান্ত সবল দেহ মানুষ তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—কে আপনারা?

দুই ব্রাহ্মণ। অনাবৃত উর্দ্ধাঙ্গে শুভ্র উপবীত। তাঁরা দুজনেই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন। চন্দ্র প্রণাম করলেন।

তাঁদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি বললেন—গুরু পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

গুরুর নাম শুনে চন্দ্রের চোখে জল এল। গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে বললেন—কি বার্ত্তা পাঠিয়েছেন প্রভু?

—তিনি আপনার লৌকিক কল্যাণ কামনা করেছেন।

চন্দ্র স্তব্ধ হয়ে রইলেন মাথা হেঁট করে।

জ্যেষ্ঠ বললেন—তিনি আপনাকে আদেশ করেছেন ভবসুন্দরীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে। আর আপনার পুত্রের জন্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে রাজ্য স্থাপন করতে।

চন্দ্র আবার মাথা হেঁট করলেন। যে লৌকিক প্রতিষ্ঠার পথ গুরু একদিন তাঁকে পরিহার করে চলতে বলেছিলেন সেই লৌকিক প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করবার নির্দ্দেশই আজ জানিয়েছেন তিনি।

—কিন্তু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার, ভবসুন্দরীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আমি কোথায় পাব?

—তার উত্তরও গুরু দিয়েছেন। কোশল-ত্যাগের সময় গুরুদত্ত যে বহু স্বর্ণপেটিকাবদ্ধ সরস্বতীর নির্ম্মাল্য আপনি দশটি ঘোড়ার পিঠে নিয়ে এসেছিলেন গুরুর আশীর্ব্বাদে তা মণিমানিক্যে পরিণত হবে।

—বুঝলাম। কিন্তু তক্ষণ, ভাস্কর এ সব কোথায় পাব?

এবার কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কথা বললেন—তার ব্যবস্থা আমি করব। সেই ভার দিয়েই গুরু পাঠিয়েছেন আমাকে।

—কিন্তু উপকরণ? ভবসুন্দরীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপযোগী প্রস্তর?

—সে তো এই সামনে পড়ে আছে! তাঁর অশ্রুসিক্ত এই প্রস্তরের এক অংশে তাঁর বিগ্রহ, অপর অংশে তাঁর বেদী রচিত হবে।

—কিন্তু তাতেই কি সব হল? আপনি যে সেই অপরূপ দিব্য-দেহ নির্ম্মাণ করবেন, কি করে করবেন? আপনি তো তাঁকে দেখেন নি?

গুরু-প্রেরিত ভাস্কর হাসলেন। বললেন—না, তাঁকে আমি দেখিনি। তবে কি করে সে বিগ্রহ নির্ম্মাণ করতে হবে সে নির্দ্দেশও গুরু আমাকে দিয়েছেন।

গভীর কৌতূহলের সঙ্গে চন্দ্র প্রশ্ন করলেন—কি নির্দ্দেশ দিয়েছেন গুরু?

—তিনি আপনাকে সামনে রেখে, আপনাকে দেখে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে বলেছেন।

এইবার হা হা করে অতি গভীর কৌতুকে চন্দ্র অট্টহাস্য করে উঠলেন। বললেন—বা অতি চমৎকার কথা! আমার এই বিপুল শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত মুখ আর এই পরুষ, কর্কশ অবয়ব দেখে সেই সুকুমার, সুকোমল দিব্য স্ত্রীদেহ রচনা করবেন এ অতি উত্তম কল্পনা!

ভাস্কর গম্ভীর ভাবে বললেন—গুরুর তাই নির্দ্দেশ!

চন্দ্র হাস্য সম্বরণ করে বললেন—গুরুর নির্দ্দেশ যখন, তখন তাই হবে।

তারপর অন্যজনের দিকে ফিরে বললেন—কিন্তু আপনি?

—আমি আপনাকে রাজকার্য্যে মন্ত্রণা দেব, আপনার পুত্রকে শিক্ষা দেব, আর ভবসুন্দরীর বিগ্রহের নিত্যপূজা করব।

—তাই হোক। গুরুর ইচ্ছা, গুরুর নির্দ্দেশ প্রতিপালিত হোক।

তারপর এক সঙ্গে আরম্ভ হল সমস্ত কাজ। কোথা থেকে কে জানে, দলে দলে তক্ষণ, ভাস্কর, কুলিক, শ্রমিক এনে উপস্থিত করলেন। এক সঙ্গে প্রাসাদ ও ভবসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ হল। অন্যদিকে রাজ্যবিস্তার, রাজধানী পত্তন, পুত্রের শিক্ষা, রাজ্য চালনা চলতে লাগল জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশে। কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমস্ত গঠন-কর্ম্মের অধিকর্ত্তা। তিনি প্রাসাদ মন্দির সব কিছু নির্ম্মাণের নির্দ্দেশ দেন। নিজে কিছু করেন না।

বৎসর ঘুরে এল। আবার দেবী পক্ষ পড়ল। ভাস্কর একদিন গোপনে চন্দ্রকে বললেন—মহারাজ, শুক্লা চতুর্দ্দশীর দিন আপনি স্নান করে উপবাসী থাকবেন। আমি সন্ধ্যালগ্নে জ্যোৎস্না প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ আরম্ভ করব।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ চন্দ্র গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ভাস্কর সদ্য স্নান শেষ করে নানান বিচিত্র যন্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত। মহারাজকে প্রণাম করলেন ভাস্কর।

মহারাজ শশব্যস্তে পিছিয়ে গিয়ে বললেন—একি, আমি ক্ষত্রিয়, আপনি ব্রাহ্মণ, আমি আপনার প্রণাম গ্রহণ করব কি ক'রে?

অবিচলিতভাবে ভাস্কর বললেন—আপনি আজ ক্ষত্রিয় নন। আপনি আজ স্বয়ং দেববিগ্রহ। আপনার থেকেই ভবসুন্দরীর মূর্ত্তি গঠিত হবে। আপনি আসন গ্রহণ করুন।

মহারাজ আসন গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করের অস্ত্রের এক আঘাতে সেই প্রস্তর বেদিকার আসনখানা দু'টুকরো হয়ে গেল। ছোট টুকরোটিতে ভাস্কর হাত দিলেন তারপর। চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের জ্যোৎস্না তখন ফুলের মত ফুটে উঠেছে।

এমনি করে কাজ চলতে লাগল। আকাশে যতক্ষণ চাঁদ থাকে ততক্ষণ মহারাজ চন্দ্রকে সামনে রেখে কাজ করে চলেন ভাস্কর। কাজ চলে অতি গোপনে। মহারাজ চন্দ্র অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর শ্মশ্রু-গুম্ফ-সমন্বিত মুখ ও পরুষ কর্কশ অবয়ব দেখেই ভবসুন্দরীর সুকুমার মুখ আর তনুদেহ নির্ম্মাণ করে চলেছেন ভাস্কর! আশ্চর্য্য! সেই মুখ, সেই সুঠাম, বিদ্যুৎ-বল্লরীর মত দেহলতা সবই ধীরে ধীরে আকার গ্রহণ করছে।

সে মূর্ত্তি মহারাজ চন্দ্র যত দেখেন মনে মনে তত উতলা হয়ে ওঠেন। দেবীর জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতির কথা হতে মনে পড়ে যায়, তিনি ভাস্করকে তত ব্যতিব্যস্ত করেন। আর কতদিন লাগবে মূর্ত্তিনির্ম্মাণ শেষ হতে? ভাস্কর হাসেন, কোনও জবাব দেন না। কিন্তু দিনে দিনে কাজ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

এদিকে রাজ্য বহুবিস্তৃত হয়ে পড়েছে, প্রাসাদ ও মন্দির নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ, পুত্র প্রায় যুবক হয়ে উঠেছে, তার সর্ব্ববিধ শিক্ষা সমাপ্তপ্রায়। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ। ভাস্কর কালো অবগুণ্ঠন দিয়ে ঢেকে রেখেছেন মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার দিন পর্য্যন্ত। বেদী-নির্ম্মাণে হাত দিয়েছেন ভাস্কর। কিন্তু মহারাজের নির্দ্দেশে অসম্পূর্ণ বেদীতেই সমাগত দেবীপক্ষের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা হবে। ভাস্কর আপত্তি করেছিলেন কিন্তু মহারাজ শোনেন নি।

অকস্মাৎ পিতৃ-পক্ষের আরম্ভে বারুণী নদীতে প্রবল বন্যা এল। প্রাসাদের আধখানা ভেঙে ধুয়ে নিয়ে গেল সে বন্যা। মন্ত্রী সেই জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহারাজকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—আপনি চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমি আরও কঠিন করে প্রাসাদের ভগ্ন অর্দ্ধাংশ আবার নির্ম্মাণ করব। আর বারুণী নদীকে এখান থেকে সরিয়ে দেব।

মহারাজ হাসলেন। উদ্‌ভ্রান্ত হাসি। ভগ্ন প্রাসাদ নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তা নাই। তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন ভবসুন্দরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দিনটির জন্যে। বর যেমন করে বাসর শয্যায় বধূর সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করে তিনি তখন মনে মনে তেমনি অধীর!

মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার দিন সে কি উৎসব! মহারাজ চন্দ্রের সে কি উন্মাদ আনন্দ! দেবীপক্ষের শুক্লা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় প্রায় সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মন্দিরের সামনে সুবিশাল, কাক-চক্ষু-জল সরোবরে তার পূর্ণ ছায়া পড়ল। জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রাজমন্ত্রী পূজায় বসলেন। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত পূজা করে পূজা সাঙ্গ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে অপেক্ষারত মহারাজ চন্দ্রকে বললেন—যান আপনি এবার মূর্ত্তি দর্শন করুন মহারাজ। আপনি দ্বার বন্ধ করে দর্শন করবেন। এখানে মন্দির-প্রাঙ্গণে এক প্রাণীও থাকবে না।

ভাস্কর, মন্ত্রী সকলে চলে গেলেন। মহারাজ চন্দ্র একবার বাইরে আকাশে চাঁদের দিকে চেয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দ্বার বন্ধ করে দিলেন। ধূপের, ফুলের, ঘৃতের, সুপক্ক ফলের গন্ধে ঘরের বাতাস পরিপূর্ণ, ভারী। বন্ধ-দ্বার মন্দিরের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর বুক দুরু দুরু করে উঠল। মনে হল যেন বিবাহের লগ্নে শুভদৃষ্টির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যেন দাঁড়িয়েছেন তিনি।

মূর্ত্তির মুখ চেলির অবগুণ্ঠনে ঢাকা। তিনি প্রণাম করে আস্তে আস্তে আলগোছে মূর্ত্তির মুখের গুণ্ঠনখানি সরিয়ে নিলেন! একি! এ সেই তো! যে মায়াবিনী নিষ্ঠুরা একদা তাঁকে বলে গিয়েছিল জন্মান্তরে দেখা হবে সেই আবার এই জন্মেই সামনে বেদীর উপর দাঁড়িয়ে হাসছে!

তিনি সকৌতুকে বললেন—তবে, তবে যে বলেছিলে এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হবে না? বলে ছুটে মূর্ত্তিকে জড়িয়ে ধরতে গেলেন। কোথায় কি? পাথরের মূর্ত্তির কঠিন দেহে তাঁর কপালে আঘাত লাগল। ঘরের ঘৃত প্রদীপ কোন্ অদৃশ্য কৌশলে নিভে গেল।

তারপর? তারপর আর কি? পরদিন প্রাতে দেখা গেল মন্দিরের বেদী শূন্য, মূর্ত্তি নাই। আর মহারাজ চন্দ্রের শালপ্রাংশু মহাভুজ দেহ সেই সরোবরের মাঝখানে ফুটন্ত পদ্ম ফুলের সঙ্গে ভাসছে। মহারাজ চন্দ্র যেন জন্মান্তরের তপস্যায় ক্ষীর সমুদ্রশায়ী যোগমগ্ন নারায়ণের মত ঘুমিয়ে পড়েছেন।

এতক্ষণ নিঃশ্বাস রোধ করে শুনছিলাম। কাহিনী যেন ধাপে ধাপে আমাকে তুলে কোন্ প্রাসাদ চূড়ার শেষ শীর্ষ বিন্দুতে নিয়ে উপস্থাপিত

করেছিল। এইবার সেখান থেকে মাটিতে নেমে এসে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস ছাড়লাম। চন্দমশায়ও চুপ করে রইলেন।

একটু হেসে ঘড়িটা দেখে একবার নড়ে চড়ে বসলাম। মৃদু কণ্ঠে যেন আত্মগতভাবেই বললাম— আজ আর যাওয়া হল না।

চন্দমশায় আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন—বাবা, তুমি এই ক'টা দিন থেকে যাও। এই তো আর ক'টা দিন পরেই শুক্লা চতুর্দ্দশীতে ভবসুন্দরীর পূজো! পূজোটা দেখে যাও।

আমি একবার ঢোঁক গিলে বললাম—থাকলে তো মন্দ হত না। আমারও ইচ্ছে করছে থাকতে। কিন্তু জ্ঞানেন্দু আমাকে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যেতে বলেছে। হাজার হোক চাকরী তো!

চন্দমশায় বললেন—তুমি জ্ঞানেন্দুকে লিখে দাও তার আবেদন আমি মঞ্জুর করলাম। তবে আমি তোমাকে ভবসুন্দরীর পূজো পর্য্যন্ত আটকে রাখলাম।

একটু খেদের হাসি হেসে চন্দমশায় বললেন—ভবসুন্দরীর এ সব গুহ্য কথা আমার ছেলেরাও জানে না। জানবে কি করে? স্থূল, বৈষয়িক, বস্তু-সর্ব্বস্ব মন যাদের তাদের কাছে ভবসুন্দরীর কোন অস্তিত্বই নেই যে! ভবসুন্দরীর কথা তো ঐখানেই শেষ নয় বাবা। ও আরম্ভ মাত্র। সে সব অতি গুহ্য কাহিনী। তুমি থাক ক'দিন, সব বলব তোমাকে।

অকস্মাৎ অত্যন্ত সচেতন হয়ে তিনি বললেন—তুমি আগে চিঠিখানা লিখে আমাকে দাও দেখি। আমি ডাকে পাঠিয়ে দিই। পোষ্ট অফিস আবার এখান থেকে ক্রোশ দুয়েক।

চিঠিখানা পাঠিয়ে আবার তাঁর কাছে এসে বসলাম।

চন্দমশায় বললেন—ভাল করে বস বাবা! হ্যাঁ। ভবসুন্দরীর অবস্থিতির আর কোনও প্রত্যক্ষ কাহিনী নাই। যেটুকু আছে সেটুকু বলি, শোন।

—তারপর চন্দ্রের ছেলে রাজা হলেন। জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, যিনি মন্ত্রী তিনিই ভবসুন্দরীর পুরোহিত; তিনি বিবাহ করে সন্ধ্যাজলেই বসবাস করলেন। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ শেষ করেই কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চলে গিয়েছিলেন। রাজপুত্র মন্ত্রীকে বার বার অনুরোধ করলেন নব-প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির খোঁজ করবার। কিন্তু সে মূর্ত্তির কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। মহারাজ চন্দ্রই সে মূর্ত্তিকে কোথাও ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ বিশালকায় প্রস্তরমূর্ত্তি কি করে একা মহারাজ চন্দ্র বহন করে নিয়ে যাবেন? সেও তো অসম্ভব কথা! অনেকে বললে—মহা-পরাক্রম ও বলশালী

মহারাজ চন্দ্র পাথরের মূর্ত্তিকে নিজের হাতে বেদী থেকে তুলে সরোবরের জলে নিক্ষেপ করে নিজে জলে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন। কেউ কেউ বললে—মূর্ত্তি মহারাজের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় মাত্র ভবসুন্দরীর জীবন্ত দেহ ধারণ করে, পরস্পরের হাত ধরে অনন্ত মিলনাকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করে জন্মান্তরে যাত্রা করেছেন ঐ সরোবরের মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজপুত্র অনেক চেষ্টা করলেন সেই মূল মূর্ত্তি আবিষ্কারের। কিন্তু নিষ্ফল হলেন। পরে মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে মৃত্তিকায় প্রতিমা গড়ে পূজার সিদ্ধান্ত হল। রাজপুত্র বললেন—কিন্তু ভবসুন্দরীর মূর্ত্তি কে গড়বে? কেউ তো দেখেনি সে মূর্ত্তি?

মন্ত্রী আশ্বাস দিলেন, বললেন—ভাস্কর আর মহারাজ চন্দ্র ছাড়া সে মূর্ত্তি আমি দেখেছি। আমি পূজা করে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছি সে মূর্ত্তিতে, তারপর আমিই তাঁর মুখ গুণ্ঠন দিয়ে গুরুর নির্দ্দেশে আচ্ছাদিত করে দিয়েছি। আমি মৃৎশিল্পীকে দেখিয়ে দেব, সে প্রতিমা নির্ম্মাণ করবে।

তাই হল। সেই ভাবে প্রতিমা গঠিত হল। মন্ত্রী পূজা করলেন। সেই রাত্রেই মূর্ত্তি সামনের সরোবরের জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হল।

কালক্রমে পূজা-পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। সে সব দেখতে পাবে।

কিন্তু ভবসুন্দরী তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তিনি এখানে সশরীরে অধিষ্ঠান করছেন। তবে তপস্যা ভিন্ন তাঁর সাক্ষাৎ মেলে না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ মশায় বললেন—সে তপস্যাই বা কে করছে!

অবশেষে ভবসুন্দরীর পূজার দিন এল। দেবী পক্ষের শুক্লা চতুর্দ্দশী।

চন্দমশায় সারাদিন উপবাস করে আছেন। নিরম্বু উপবাস।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকেই মন্দিরের বারান্দায় গিয়ে বসলেন তিনি। তিনি গ্রামের ষোল আনার জমিদার, তার উপর মহাজন। গ্রামের সমস্ত প্রবীণ মানুষ এক একবার করে মন্দিরচত্বরে এসে চন্দমশায়ের সঙ্গে পূজার সম্পর্কে কথাবার্ত্তা বলে গেল। ঐ শবর কুলের সকলেই চন্দমশায়ের প্রজা এবং খাতক। তা ছাড়া গ্রামদেবীর পূজা হিসাবে ভবসুন্দরীর দায়িত্ব সকলের। তার উপরে প্রবাদ ভবসুন্দরী জন্ম-জন্মান্তরে তাদের কুলে তাদের কন্যার গর্ভে দেহধারণ করেন। তারা সকলে কোদাল শাবল জলের টিন নিয়ে এসেছে। মন্দিরের সামনে অনেকখানি জায়গা চেঁছে পরিষ্কার করছে। জল দিয়ে মন্দির পরিষ্কার করছে।

সব পরিষ্কার হয়ে গেলে খুঁটো পোঁতা হল বলির জন্য।
বলিও যোগ হয়েছে। সামিয়ানা খাটানো হল মন্দিরের সামনে। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হয়ে অপরাহ্ন হতে না হতে দু'জনের কাঁধে বাঁশের উপর চাপানো ভবসুন্দরীর মূর্ত্তি কাপড়ে আবৃত করে কুম্ভকারের বাড়ী থেকে এসে পৌছুল। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত, যিনি ভবসুন্দরীর পূজা করে আসছেন বংশানুক্রমে। এই-ই নিয়ম। পুরোহিত কুম্ভকারের বাড়ী থেকে নিজে প্রতিমা নিয়ে আসেন।

সন্ধ্যায় আগেই এসে পৌছুল বাদ্যকরের দল। তিনটে ঢাক, দুটো ঢোল, সঙ্গে কাঁসি, বাঁশী আর ভুড়ুং। আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একদফা ঐকতান বাদনে ভবসুন্দরীর শান্ত মন্দির প্রাঙ্গণ এক মুহূর্ত্তে উৎসব-মুখর হয়ে উঠল।

একটু পরেই চন্দ মশায়ের বাড়ী থেকে এসে পৌছুতে লাগল পূজার বহুবিধ উপকরণ। তিনটি মিশকালো পাঁঠাও যথাসময় খুঁটোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বহুকালের মত শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠল আকাশে কোণভাঙা সোনার থালার মত। একটা বড় পেট্রোম্যাক্স আলো ঝুলছে সামিয়ানার মাঝখানে। তবু চাঁদের আলোয় চারিদিক কেমন মোহময় হয়ে উঠল। পুকুরের জলে তার ছায়া গলা সোনার মত ভাসতে লাগল। ঢাক ঢোল ভুড়ুং কাঁসি বাঁশী বেজে উঠল একসঙ্গে। ভবসুন্দরীর পুজো আরম্ভ হল।

পুরোহিত থরে থরে পিতলের পরাতে পরাতে, শালপাতায় নৈবেদ্য সাজিয়েছেন। এক পাশে পিতলের প্রকাণ্ড পুষ্পপাত্রে রাশি রাশি ফুল, বিল্বপত্র রূপার বাটিতে বাটিতে রক্ত চন্দন, সিন্দুর। একপাশে মদের বোতল। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পূজা।

প্রতিমা বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত হল। সমস্ত বাজনা একসঙ্গে বেজে উঠল। চন্দ মশাই, চন্দমশায়ের দেখাদেখি আমিও উপস্থিত সকলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। প্রতিমার অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হল, দেখলাম মূর্ত্তির মাথায় সিঁদুর নাই, কুমারী কন্যার মূর্ত্তি।

এই সময়ে দেখলাম শশব্যস্তে সকলে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। কে আসছে? আমিও সরে দাঁড়ালাম। কোরা লালপাড় সাড়ী-পরা একটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল সসঙ্কোচে। সে ঘরে ঢুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে ভবসুন্দরীকে।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। এবার তাকে দেখতে পেলাম। গৌরী, সুরূপা কুমারী। আরে এ যে সেই মেয়েটি! নিধির মেয়ে! যে চন্দ মশায়কে রোজ

দুধ দিয়ে যায় সসংকোচে, সসম্ভ্রমে। মেয়েটির হাতে পুরোহিত একটি পিতলের শূন্য ঘট তুলে দিলেন সে নিজের মাথায় সে ঘটটি বসিয়ে নিলে। বাদ্যভাণ্ড আবার বেজে উঠল।

মাথায় পিতলের শূন্য ঘট স্থাপন করে সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মন্দিরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। একজন একটা হ্যাজাক বাতি ধরে রাস্তা দেখিয়ে চলল আগে আগে। কন্যাটির পিছনে পিছনে চললেন পুরোহিত। তাঁর পিছনে গায়ে রেশমের চাদর জড়িয়ে উপবাসী চন্দমশায় চললেন হাত জোড় করে। আমিও সঙ্গী হলাম তাঁর।

মন্দির-চত্বরের নীচে বহু লোক দাঁড়িয়ে আছে। বাদ্য-ভাণ্ড বাজতে বাজতে এগিয়ে চলল সমস্ত শোভাযাত্রার আগে আগে। সমস্ত শোভাযাত্রাটা থামল গিয়ে দিঘীর ঘাটে। আলো ধরে ঘাটের চত্বর অতিক্রম করে আমরা কিছু লোক নামলাম। এগিয়ে গেলাম জলের ধার পর্য্যন্ত। মেয়েটি জলে নেমে গেল শূন্য ঘটটি মাথায় নিয়ে। পুরোহিত সামান্য জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। যে আলো ধরেছিল সে আলোটি উপরে তুলে ধরলে।

মেয়েটি ঘটটি কাঁখে করে জলে ডুব দিলে। ডুব দিয়ে ঘটটি ভর্ত্তি করে আর একহাত দিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে নিজের দেহ সলজ্জভাবে আবৃত করে দুই হাতে পূর্ণ ঘট মাথায় তুলে নিলে। তারপর সমুদ্র মন্থনের পর অমৃতভাণ্ড কক্ষে নিয়ে লক্ষ্মীর মত জল থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল।

আমার পাশ থেকে চন্দমশায় মৃদু কণ্ঠে কাকে যেন কি বললেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। আমার মনে হল তিনি যেন পাশের আলো-হাতে মানুষটিকে বললেন—আলোটা আমাকে দাও। আমি লোকটির দিকে ফিরে তাকালাম। ওমা, এযে আমাদের জ্ঞানেন্দুর ভাই ধ্যানেন্দু। দেখলাম ধ্যানেন্দু আলোটা তুলে ক্ষুধিত শ্বাপদের মত পূজারিনী ঘটবাহিনীর ভিজে-কাপড়ে মোড়া দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। আলোটা যে সর্ব্বাগ্রে তার মুখখানাকেই আলোকিত করছে এটা তার একদম খেয়াল নেই।

চন্দমশায় তার হাত থেকে আলোটা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন। কেবল ছেলেকে বললেন মৃদু কঠিন কণ্ঠে—তুমি আর এস না আমাদের সঙ্গে। তুমি চলে যাও।

আমরা এসে মন্দিরে উঠলাম। বাদ্যভাণ্ড চলল ললিত ছন্দে বাজতে বাজতে আমাদের আগে আগে। মেয়েটি পূর্ণঘট মাথায় ভিজে কাপড়েই

মন্দিরে ঢুকল, ঘটটি স্থাপন করে প্রণাম করলে। তারপর মন্দিরের ভিতরেই আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

পূজায় বসলেন পুরোহিত। পূজা হল। কালী কি তারার পূজার মত পূজা! বলি হল অনেক রাত্রে। তারপর আবার যে পদ্ধতিতে ঘট এনেছিল সেই ভাবেই মেয়েটি নূতন কাপড় পরে মাথায় ঘট নিয়ে গিয়ে আবার ডুবে স্নান করে ঘট বিসর্জ্জন করলে। তার পিছনে পিছনে প্রতিমা বহন করে এনে বিসর্জ্জন করা হল।

পূজা, বিসর্জ্জন সমাপ্ত হলে চন্দমশায় এসে আবার মন্দিরে প্রণাম করলেন।

আমিও প্রণাম করলাম। তারপর চন্দমশায়ের সঙ্গে বাড়ী চলে এলাম।

বাড়ী আসছি আমরা দুজনে। আমার হাতে হ্যাজাকটা। আমি আগে আগে চলেছি। হঠাৎ যেতে যেতে নজর পড়ল প্রকাণ্ড বড় বটগাছটার নীচে ধ্যানেন্দু হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। আমি আর থাকতে পারলাম না। আলো তুলে বললাম—একি, ধ্যানেন্দু কেমন ভাবে গাছতলায় শুয়ে আছে দেখুন। ওকে ডেকে দেব? ঠাণ্ডা লাগবে। তা ছাড়া সাপ-টাপ থাকতে পারে!

চন্দমশায় গম্ভীর ভাবে আমার একটা হাত ধরে বললেন—না, ওকে ডাকতে হবে না। চলে এস। আর ডাকলেও ও এখন উঠবে না, উঠবার শক্তি নাই ওর। মদ্যপান করে ও এখন অচেতন। ও একদিন ভবসুন্দরীর কোপেই যাবে! আমি আর কি করব! সেই বোধ হয় ওর প্রাক্তন!

তারপর সেই শেষ রাত্রির নির্জ্জন মুহূর্ত্তে চন্দমশায় আমাকে বললেন—বাবা, তুমি জান ভবসুন্দরীর শক্তি কত? আমি জানি। আমি বলব তোমাকে।

সেই শেষ রাত্রিতে বারান্দায় কম্বল পেতে চন্দমশায় বলতে লাগলেন—ভবসুন্দরী কে? জ্ঞান শাস্ত্রে আছে—

ব্রহ্মমানসসঞ্জাতাং কারণ-সলিলোদ্ভবাং।
পদ্মিনীং পদ্মগন্ধাঞ্চ নমামি ভবসুন্দরীম্॥
লোকত্রয়স্য রূপস্য ধারয়িত্রীং সুশোভনাং।
কল্যাণরূপিনীং দেবীং নমামি ভবসুন্দরীম্॥
মূঢ়ান্ মোহেন বধ্নাতি মুঞ্চতি মুক্তি কাঙ্ক্ষিনং।
মোহিনীং তারিনীং দেবীং নমামি ভবসুন্দরীম্॥

সুন্দরীমূর্তি চার্বঙ্গীং লীলাবিভ্রমবিহ্বলাং।
ষোড়শীং শবরসম্ভূতাং মুগ্ধানাং কামদায়িনীম্ ॥
শবচ্ছশাঙ্কবিম্বাভাভাস্বতীং মুনিলোভনাং।
মদোল্লাস-লোলনেত্রাং নমামি ভবসুন্দরীম্ ॥
জননীরূপেন যা দেবী জায়ারূপেন বৈতথা ॥
কন্যাভ্রাতৃ সুহৃদ্‌স্বস্সুতরূপেন তিষ্ঠতি ॥
সন্ধ্যাজল বিধাত্রীং তাং জীবকল্যাণদায়িনীং।
বরদাং শুভদাং সৌম্যাং নমামি ভবসুন্দরীম্ ॥

সেই ভবসুন্দরীকে বোঝা তো সোজা কথা নয়। ভবসুন্দরী সর্ব্বত্র আছেন প্রজ্ঞা আর সুষমার মূর্ত্তিতে। তাঁকে ধ্যান করে অনুভব করা, উপলব্ধি করা চাই। যেমনি কায়াময়ী করে কামনার মধ্যে তাঁকে পাবার চেষ্টা হবে তেমনি মহারাজ চন্দ্রের মত ইহকাল-পরকাল, জন্ম-জন্মান্তর সব বিকিয়ে দিতে হবে। বুঝলে বাবা? আমার ঐ ছোট ছেলেটাকে আমি সেই জন্যে খরচের খাতায় লিখে রেখেছি। ও যে পথে চলেছে তাতে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ডেকে আনবে ছেলেটা। কি বলব! রাজা চন্দ্রকে তাঁর গুরু বাঁচাতে পারেন নি। আর আমি আমার ছেলেকে বাঁচাব কি করে?

বিপুল ক্ষোভের বেদনায় চন্দমশায়ের কণ্ঠস্বর থমথম করছিল। তিনি একটু চুপ করে থেকে বললেন—জান বাবা, এরা ভবসুন্দরীর মহিমা মাহাত্ম্য কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না। অথচ আশ্চর্য্য কি জান, আমি নিজে দেখেছি ভবসুন্দরী দেবীকে।

সে রাত্রির জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসছে। সেই আবছা আলোয় তাঁর মুখ আমি ঠিক দেখতে পেলাম না। তবু সেই কথাগুলির মৃদুতার অন্তরালে যে প্রত্যয় তাকে আমি অস্বীকার করব কি করে? আর এই প্রবীণ নীতি-পরায়ণ মানুষ সারাদিন নিরম্বু উপবাসী থেকে রাত্রির শেষ প্রহরে দেবতার পূজা সাঙ্গ করে এসে আজ আমাকে অকারণে একটা মিথ্যা-কথা বলবেন কৌতুক করে এও কি বিশ্বাসযোগ্য? অথচ যা বললেন তাই বা বিশ্বাস করি কি করে?

তিনি বোধহয় আমার মনের অবস্থাটা অনুমান করতে পারলেন। বললেন—তোমার বোধহয় বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার এই কথাটা। আমার নিজেরই কি প্রথম প্রথম বিশ্বাস হয়েছিল! তারপর—। সে অনেক কথা। সে কথা কেউ জানে না। আজ তোমাকে বলব! ভবসুন্দরীর নির্দ্দেশও পেয়েছি আমি।

চন্দ মশায় আমাকে তাঁর জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। যে কাহিনী কাউকে কোন দিন তিনি বলেননি।

আমার যাত্রার সময় এল।

গরুর গাড়ীতে উঠবার সময় প্রণাম করবার জন্যে হাত বাড়ালাম। চন্দ মশায় দু'হাত পিছিয়ে গেলেন—ছি, ছি করছ কি বাবা! তুমি ব্রাহ্মণ!

—তা হোক. আপনি দেবাশ্রিত মানুষ। আর আমি আপনার সন্তানের মত। কেন নেবেন না আমার প্রণাম?

জোর করে প্রণাম করলাম চন্দ মশায়কে। দেখলাম চন্দ মশায়ের দুই চোখ জলে ভরে এসেছে।

আমি গাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। গরুর গাড়ীর পিছন পিছন আসতে আসতে চন্দ মশায় বললেন—তোমার যখন যেমন দরকার হবে আমাকে জানাতে সংকোচ ক'রো না বাবা। আর আমার প্রয়োজন যেদিন হবে, সেদিন তুমি যেন এসো, দেরী ক'রো না।

গাড়ী থেকে বললাম—নিশ্চয়। আমি আপনার সন্তান। যেদিন ডাকবেন আমি আসব।

আর বলা হল না। গরুর গাড়ী একটা বাঁক ফিরল।

* * * *

কলকাতা ফিরে অফিসে যেতেই জ্ঞানেন্দু এক মুখ হেসে বললে—যাক, অবশেষে এলে তা হলে?

হেসেই বললাম—হ্যাঁ এলাম! আমার চিঠি পেয়েছ?

—হ্যাঁ পেয়েছি। কাজটা বেশ ভাল করেই করেছ বুঝতে পারছি! কিন্তু বাবার সঙ্গে অমন করে জমালে কি করে হে? আর আসবার নামই কর না সেখানে গিয়ে! সে হা হা করে হাসতে লাগল।

বললাম—ভবসুন্দরীর দয়া!

আবার হাসতে লাগল জ্ঞানেন্দু, বললে—তুমি যে cult of Bhara-sundri. মানে ভবসুন্দরী সম্প্রদায়ের সভ্য হয়েছ দেখছি।

আমার আর বেশী কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, বললাম—যা বল!

অকস্মাৎ গলা নামিয়ে জ্ঞানেন্দু আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—হ্যাঁ হে বাবার যে চরিত্র-দোষের কথা শুনেছিলাম, সেটার কি ব্যাপার বলতো! নিধের মেয়েটাকে দেখলে না কি বাবার ঘরে?

মন আমার ধিক্কারে ভরে গেল ! ছি, ছি, এ বলে কি ! অন্ধ, অন্ধ ! সেই সূর্য্যমুখীর মত সুকুমারী কুমারীর সম্পর্কে এ কি কথা ! আর কি বাপের কি ছেলে ! কি করব, চাকরী করি ! কিছু বলতে পারলাম না। পারা উচিত ছিল তবু পারলাম না। শুধু বললাম—না, সে রকম কিছু দেখিও নাই শুনিও নাই !

খানিকটা বিরক্ত হল জ্ঞানেন্দু, বললে—তুমি তো চিরকালের 'গবেট' একটা। তোমার চোখ পড়বে না তা আমি জানতাম। একটু চোখ খুলে এ সব দেখতে হয় হে ! যাই হোক ! তুমি এবার গল্পটা লিখে ফেল। বাবাকে বোঝাতে হবে ব্যাপারটা !

বাঁচলাম। বললাম—তা আমি লিখে দিচ্ছি। আমি তো সব দেখে এসেছি।

—বাঁচালে আমাকে। আমাকে আর বকে বকে তোমাকে সব বোঝাতে হবে না। তবে বেশ হুঁস করে লিখে ফেল গল্পটা গুছিয়ে।

গল্পটা মাস দুয়েক চেষ্টা করে লিখে ফেললাম ! দিলাম জ্ঞানেন্দুকে। সে খাতাখানা বাড়ী নিয়ে গেল। ক'দিন পর রুষ্ট মুখে আমার দিকে খাতা খান ছুঁড়ে দিয়ে বললে—খুব লিখেছ। নিয়ে যাও। ছাপ ওখানা, ছেপো সাহিত্যিক হও।

খাতাখানা নিয়ে বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিলাম এতদিন। পড়ে দেখুন এখন পচ্ছন্দ হয় কি না !

এক

প্রায় ষাট বছর আগের কথা।

পৃথিবী তখন অনেক নবীন ছিল, গাছের পাতা তখন আরও সবুজ ছিল, ারুণী নদী আর চাদা দিঘীর জল তখন আরও নীল ছিল। পাখীর গলায় তখন আরও মধু ছিল, জীবনে তখন আরও মহিমা ছিল। মানুষের দেহ আরও বিশাল ছিল, চোখে আরও বেশী হিংসা, ক্রোধ, বুকে অনেক বেশী সাহস, লোভ আর কামনা ছিল। প্রবৃত্তিগুলি আজকের মত অত গোপন ছিল না।

ভবসুন্দরীর মন্দির তখন আরও উঁচু মনে হত। সন্ধ্যাজলে গাছে গাছে তখন ভয় ভূত প্রেত পিশাচের আকারে ঝুলে ঝুলে থাকত, পথের বাঁকে বাঁকে আবছা অন্ধকারে আত্মগোপন করে লুকিয়ে থাকত, কখন লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে কে জানে!

বাড়ীর দাওয়া থেকে চাঁদা রাজার ভিটেটা একটা নীল পাহাড়ের মত মনে হত। পাহাড়ের মত উঁচু টিবিটা নিজের চারিপাশে দুর্গম জঙ্গল আর দুর্ভেদ্য বিভীষিকা দিয়ে ঘিরে কত কত কাল আগে থেকে দাঁড়িয়ে আছে। গ্রামের গাছপালার মাথা থেকে, পথের বাঁক থেকে সমস্ত ভয়কে তাড়ানো যায়, কিন্তু তারা তখন গিয়ে আশ্রয় নেয় চাঁদা রাজার ভিটের জঙ্গলে। সেখানে কারো যাবার উপায় নাই, মতা নাই।

আর কেউ দেখুক না দেখুক পাঁচ বছরের চন্দর এমনি চোখেই আপনার আশপাশের পৃথিবীকে দেখত।

ছোট্ট সংসার।

বাবা আর মা। আর খুদি পিসি; তারও পিসি তার বাবারও পিসি।

বাবা ছিল সন্ধ্যাজলের উপযুক্ত পুরুষ মানুষ। কোন্ সুদূর দেশ থেকে কবে কোন্ মহাভারতের কালে একদল বিপুলকায় কালো মানুষ, সৃষ্টির আদি পর্বের অতিকায় প্রাণীর মত, এই অরণ্য আর জলধারা বেষ্টিত অঞ্চলে কেমন করে এসে এখানে বসতি গেড়েছিল সে কথা বহু কালের ঘসা লেগে এবং রঙ মেখে এখন

এক বিচিত্র অদ্ভুত কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কালো কালো অতিকায় মানুষগুলি এখনও বেঁচে আছে, চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। তার বাবা অবশ্য তাদের জাতির কেউ নয়। রাম রায় জাতিতে ছত্রী, কিন্তু চেহারায় ওদের সঙ্গে কোনও তফাৎ নাই। অমনি কষ্টি-পাথরের মত কালো, অমনি ভীমকায়। কেবল শণ্ডাদের মত দীঘল গড়নের নয়, ওর চেহারা একটু বেঁটে ধরনের।

দেহে যেমন বিপুল স্বাস্থ্য, মনে তেমনি অপার আশা আর অশেষ লোভ। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স, গলার হাঁকে সমস্ত গঙ্গাজল, এমন কি চাঁদা রাজার ভিটের সব চেয়ে উঁচুতে যে গাছটা তার পাতা শুদ্ধ শিউরে ওঠে। তবু এখনও গাম্ভীর্য্য আসে নি। রাগ হলে কি খুসী হলে সে রাগ বা খুসী মনের ঘরের দরজা পর্য্যন্ত এসেই থেমে থাকে না; মনের দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসে। রাগ হলে গাঁ গাঁ করে চীৎকার করে, খুসী হলে হা হা করে হাসে। রেখে ঢেকে রাখতে পারে না কিছু। এই জন্যে বাবাকে চন্দরের যত ভাল লাগে তত ভয় করে। খুসী যদি হল রামের তা হলে আর কথা নাই। সময় অসময় না দেখে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে পাঁচটা দশটা চুমু খেয়ে স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও গোটা গ্রামটা একবার ঘুরে আসবে। আর যদি মেজাজ খারাপ থাকল তো অকারণে ছুতো করে ছোট্ট কচি শরীর কতটা পর্য্যন্ত আঘাত সইতে পারবে তা বিবেচনা না করে দুমদাম করে দু চার ঘা লাগিয়ে দেবে। স্ত্রী ছুটে এসে তাকে তার সামনে থেকে কেড়ে নিয়ে গেলে তবে শান্তি।

আসল কথা মানুষটার স্বভাব এখনও ছোট ছেলের মত আছে। তার কারণ বোধ হয় ওকে জীবনের আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে চলতে হয় নাই। বিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তার আগে আগে চলেছিল তার বাবা। সে বাপের পিছন পিছন চলত একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে, চোখ বন্ধ করে। বাবা মারা গেল। গেল গেল যাবার সময় ঋণ রেখে গেল। সেই ঋণের দায়ে জমি গেল অনেকখানি। এ বললে অত পাব, সে বললে এত পাব। যে যা বললে সে মেনে নিলে। বাপের জমি থেকে বের করে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হল বাবার ঋণ শোধ হয়েছে। তার চোখ খুলল শীতের সময়। বাবা থাকতে খামারের প্রায় সবটা ধানের পাঁজায় ভরে যেত। সেবার কিন্তু অর্দ্ধেকটাও ভরল না। সে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মনের ক্ষোভ সে প্রকাশ করবে কার কাছে! কেউ নাই তার! স্ত্রী ছিল, বার বছর বয়সে, বাবা মারা যাবার আগের বছরেই সে মার গেছে। আর থাকবার মধ্যে আছে খুদি পিসি। ছোট্ট খাট্ট ফর্সা গোল গাল

শওড়াদের ঘরের মেয়ে ; তার বাবার আমল থেকেই তাদের বাড়ীর পাটকাম করে। তার বাবা তাকে দিদি বলত। জমি নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দেবার সময় সে বার বার আপত্তি করেছে, তাকে বলেছে—'ওরে রামা, এমন করে ঘরের লক্ষ্মীকে ডাকিয়ে দিস না ভাগাড়ে। কাগজগুলো একবার কিশোরী ঠাকুরকে দেখা। সত্যি কি মিথ্যে একবার দেখা তো প্রয়োজন'। সে মানে নি, বলেছে —খতে কি মিথ্যে লেখা আছে ?

খতে সত্যি অথবা মিথ্যে যাই লেখা থাকুক খামারে ধানের পরিমাণ দেখে তার মেজাজ বিগড়ে গেল। একবেলা সে ধান না পিটিয়ে বসে রইল চুপ করে। খুদি পিসি তাকে একাদিক্রমে ঠায় অমনি চুপ করে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে রে রামা, অমন করে বসে আছিস !

তার শোক পিসির সান্ত্বনা বাক্যে উথলে উঠল। সে প্রায় ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার মত কাতর ভাবে বললে—বাবার সময়ে, এই আর বছর ধানে গোটা খামার বাড়ীটা ভরে গিয়েছিল মনে আছে ? আর এবার একবার অবস্থাটা দেখ ! আধখানা খামারও ভরে নাই !

পিসির কাছে বোধহয় সে সান্ত্বনার প্রত্যাশায় কথাটা বলেছিল। কিন্তু পিসি তার কথার উত্তরে বললে—তখন যখন বলেছিলাম—বাবা, লক্ষ্মীকে নিজে হাতে ভাগাড়ে পাঠিও না মানিক, তখন কথা কানে তোল নাই। আজ ছোট ছেলের মত দেয়ালা করে কাঁদলে কি হবে ?

পিসির কাছে সান্ত্বনার বদলে তিরস্কার পেয়ে তার মনোকষ্ট, ব্যথা এক মুহূর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। সে প্রবল ক্রোধে এক মুহূর্ত্তে ছুটে গেল পিসির কাছে। নিজের হাত দুটো মুঠো করে, দাঁতে দাঁত কষ কষ করে বললে— আমাকে হিত-কথা শোনাতে এসেছিস ? এখুনি দোব কিল ধমাধম ; গতর ভেঙে যাবে। বুঝবি তখন !

পিসি তার কাছ থেকে শশব্যস্তে পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ডাকাবুকোকে বিশ্বাস নাই, ও সব পারে। সে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতে যেতে বললে—মর খালভরা, আমাকে কিল মারলে যেন ওর জমি ফিরে আসবে ? মুখ্যু, বোকা, আঁড়োল কোথাকার ! ঐ দেখ, আবার কে ডাকছে তোকে। পারিস তো আরও দু' এক বিঘে যে ডাকছে তার হাতে গুঁজে দিয়ে আয়।

কথাগুলো বলে পিসি তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

এ সময়ে কে ডাকছে, কে ? সে বিরক্ত হয়ে খামার বাড়ীর দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

রাম আছিস নাকিরে? রোগা লিকলিকে শরীরের উপর ছোট মুখ-খানায় প্রকাণ্ড বড় এক জোড়া বেমানান গোঁফের আড়ালে অতি অকৃত্রিম হাসি নিয়ে ভিন্ন গ্রামের চারু মণ্ডল তাকে ডাকছে।

অতি কুটিল-বুদ্ধি মহাজন চারু মণ্ডল। ধনেশ পাখী। সম্মান করে হেসে সে এগিয়ে গেল—কি গো মোড়ল, বলছ কি? এস, বাড়ীর ভেতরে এস।

হেসে ধনেশ পাখী ভেতরে এল।—এলাম। তোর কাছে যে একটু দরকার আছে রাম!

—বল।

—তোর বাবা আমার কাছে খতে কিছু টাকা নিয়েছিল।

—তাই নাকি। রাগে তার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জলে গেল। সে অত বোকা লোক নয়। তার বাবা মারা যাবার আগে তাকে কার কার কাছে ঋণ আছে বলে গিয়েছিল। কিন্তু ধনেশ পাখীর নাম করে নাই। সে জিজ্ঞাসাও করেছিল। তাতে বাবা বলেছিল ক্ষেপেছিস, ঐ সাক্ষাৎ সংক্রান্তি পুরুষের কাছে কিছু ধার করে মানুষ! তা হলে ওর হিসেবের পাকে জড়িয়ে তোর সব বেরিয়ে যাবে। সে রাগ সামলে হিসেব করে বললে—তা বাবা কত টাকা নিয়েছিল?

—একশো পঁচিশ টাকা।

—অ! তা উশুল দিয়েছিল কত?

—এক পয়সা না! এখন স্থদে আসলে তোর দুশো তের টাকা ছ' পয়সা হয়েছে।

—খত কৈ?

—খত দেখে তু' কি করবি? দেখে বুঝবি কি? তু' পড়তে জানিস্?

বেশ বোকার মত হাসল রাম, বললে—এই দেখ, লেখাপড়া শিখেছি গো। ঠেকে ঠেকে শিখলাম যি গো পড়তে!

—বেশ দেখ! বলে ট্যাঁক থেকে ভাঁজ করা কাগজ সন্তর্পনে বের করতে করতে বললে—তা আমি বলছিলাম কি, বারুণীর ধারে তোর যে ন' কাঠা দোফসলা জমিটা আছে ঐটা আমাকে দে!

—বেশ আগে দেখি তো!

—ত্যাখ। বলে কাগজখানা খুলে তার হাতে দিলে চারু।

কাগজখানা ভাল করে দেখলে রাম। অনেক খেসারৎ দিয়ে বাবার সইটা চিনেছে রাম। সে খতখানা ভাল করে দেখে ভাঁজ করে অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠল

—শালা, চোর, চালাকি করবার যায়গা পাও নাই! সে খতখানা কুচি কুচি করে ফেললে প্রথমেই। তারপর ভেঙিয়ে বললে—আমাকে বড় বোকা পেয়েছ লয় মোড়ল! লেখা পড়া জানি না, আকাট মুখ্যু, হাবা গোবা, সবাই ঠকিয়ে ঠকিয়ে নিলে অনেক। তুমিও ঠকাবার তাল খুঁজছিলে! দানছত্র খুলেছি, তুমিও লেবে খানিকটা! দাঁড়াও! দিচ্ছি তোমাকে।

বলেই পাশ থেকে গরু তাড়ানো পাঁচন তুলে নিয়ে তার ঘাডটা ধরে তার পিঠে বেশ সজোরে ঘা কয়েক বসিয়ে দিলে—এই লাও আসল, এই লাও সুদ! সব শোধ! হয়েছে।

মার খেয়ে কুট-বুদ্ধি চারু মণ্ডল ছুটে পালাল। সে বুদ্ধিকে বুদ্ধি দিয়ে প্রতিরোধ করার শক্তি রাখে। কিন্তু সহজ বোধ আর ক্রোধের সঙ্গে লড়বার হাতিয়ার নাই তার।

চারু মণ্ডল চলে যেতে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে—শালা, সমস্ত সংসার চিলের মত চোখ করে তাকিয়ে আছে তার দিকে, কি করে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করা যায়।

অনেকক্ষণ কেঁদে চোখ মুছে সে মার খাওয়া ছেলের মত আপন মনে বললে—যাঃ শালা, নিলি নিলি, বেশ করলি। আমিও মেয়ে মানুষ নই, বেটা ছেলে। আবার বানাব সব, আবার তৈরী করব সব! বাবার চেয়ে বাড়িয়ে ফেলব!

তারপর থেকে সেই কাজেই লেগেছে সে। যেন সন্ধ্যাজলের রাম রায় থেকে আস্তে আস্তে একটা মৌমাছি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ আপনার মধুচক্রটিকে ঘিরে সমস্ত ক্ষণ মধুসন্ধানীর মত কাজ করে ফেরে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বছরের পর বছর খানিকটা খানিকটা করে জমি কিনে বাড়িয়ে চলেছে সে। শুধু কি তাই? মাসে একবার করে গঞ্জে যায়, সেখান থেকে নুন, তেল, মশলা, কেরোসিন তেল, অল্প অল্প কাপড়-চোপড় কিনে গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে আসে। বাড়ীর বাইরের ঘরে সন্ধ্যার সময়, চাষবাস ও রঙ-তামাসার পর দোকান খুলে বসে। জিনিসপত্র বিক্রী করে ধারে। দফায় দফায় ক্রেতার সুবিধা মত টাকা নেয়। ধারের হিসেব লিখে রাখে কিশোরী পণ্ডিত। লেনদেনের সময় দোকানে এসে বসে সে।

শেওড়াদের পাড়ায় কুস্তীর শেষে আবার দোকানের মধ্যে আড্ডা বসে। বিকিকিনির সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলে। নানান রঙের, নানান রসের গল্প।

তারপর আরম্ভ হয় রামায়ণ পাঠ। কিশোরী পণ্ডিত পড়ে, তারা শোনে। শুনতে শুনতে হাই উঠতে আরম্ভ করে আপনার অজান্তে। আসর ভেঙে যায়। পরদিন ভোরে কোন্ কাজে লাগতে হবে ঘুম চোখে হিসেব করতে করতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। তারপর নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব নিদ্রা!

এই করেই সে রামা থেকে রাম, রাম থেকে রায়, রায় থেকে রায় কর্ত্তা অথবা রায় মশায় হয়েছে! এ কি সোজা ব্যাপার!

সেদিন অমনি শুতে যাবার আগে হাই তুলে বললে—আর লয়, থাম পণ্ডিত। এইবার ঘুম লাগছে!

কিশোরী পণ্ডিত হেসে বললে—ঘুমের দোষ কি বল! সারাদিন যা তোর 'কেরা-মাতুনি' চলে?

শেওড়াদের মাতাব্বর হারা, ভাল নাম, হারাধন, হেসে বললে—আমাদের শরীরেও কম তাগদ নাই পণ্ডিত। কিন্তুক রায় কর্ত্তার মনে কি ফূর্ত্তি! বাবা! ফুর্ত্তিতে যেন উড়ে বেড়াইছে!

রামের চোখের ঘুম ছুটে গেল, সে বললে—হারে শূয়োর, মনে কেনে ফূর্ত্তি হবে না? আমি কার হয়ে হম্মে' নিয়েছি না পাকা ধানে মই দিয়েছি যে আমার মনে সুখ থাকবে না!

হারাধন হেসে বললে—আমরাও তো তাই বলি গো! হ্যাঁ, ধাম্মিক মানুষ বটে রায় কত্তা!

—কচু, ধম্ম না কচু! দুই হাতের বুড়ো আঙুল হারাধনকে দেখিয়ে সে বললে—ধম্ম-টম্ম জানি না বাবা, খাটি-খুটি, খাই-দাই, ঘুমুই নাক ডাকিয়ে! ব্যস্! এই কথা! তাতে ধম্ম থাকল আর গেল আমার কচু!

হারাধন হাসল, বললে—তা তুমি যাই বল, ঠাকরুণের দয়া আছে তোমার ওপর! তারপর একটু থেমে বললে—কিন্তুক আমার যে দুটো কথা ছিল গো তোমার সঙ্গে!

—বাবা, একটা লয়, দুটো কথা! তা' বল! তা বল কেনে, হাজারটা কথা বল! ঘুম আমার গোল্লায় গিয়েছে!

এইবার জোরে হেসে উঠল হারাধন, বললে—গোল্লাই বটে। এখুনি শুলেই তোমার নাক ডাকতে লাগবে! তা আমার কথা শোন।

—বল!

—খুদি দিদি তোমার ওপর খুব রেগেছে। তোমাকে বিয়ের কথা

বলেছিল, তুমি হেসেছিলে। তা বিয়ে কর, সংসার কর এইবার! এক সংসার গিয়ে পাঁচটা সংসার করে মানুষ।

—করব রে করব। বলিস পিসিকে কনে খোঁজ করতে। পিসির কথা কি ফেলতে পারি! আর তা ছাড়া এত সব করছি কার জন্যে? বংশ চাই তো!

—ভাল কথা! বলব আমি পিসিকে। তা কনে তোমার ঠিক করাই আছে গো একরকম! বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে। বড় ঠাণ্ডা! আমাদের দশপুর-তেঘাটার রমন্দ চৌধুরীর কন্যে!

রাম একটু হাসল।

হারাধন বললে—এইবার আমার কথা বলি!

—বল!

—তুমি যেন রাগ ক'রো না কত্তা।

—বল, বল! রাগ করব না আমি।

—বাবা, তোমার যা রাগ! তা শোন। তুমি যে টাকাটা পাবে তা আর আমি দিতে লারব। তুমি তার বদলে আমার ঐ 'বাকুডির' ধারে যে দশ কাঠা জমি আছে সেটো লাও। নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

—রাত দুপুরে এই তোর কথা! সে একবার হারাধনের মুখের দিকে তাকালে। মনে একবার লোভের ছটা বেজে গেল। জমিটা ভাল, আর তা ছাড়া পাশেই তার নিজের জমি আছে। কিন্তু জমিটা নিলে হারা খাবে কি? সে বললে—হারে মুখ্যু, জমিটা তো আমাকে দিবি তা নিজে খাবি কি? শূয়োর-পেট ভরবে কি করে?

বিষণ্ণ হাসি হাসল হারাধন, বললে—করব কি বল! তোমার কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছি, সুদ বেড়েছে; লেখা নাই, জোখা নাই। শোধ করবার ক্ষ্যামতা ও নাই!

—এক কাজ কর। পাঁচ কাঠা থাকুক তোর শূয়োর পেটের লেগে। কেমন, তা হলে হবে তো?

একগাল হেসে তার মুখের দিকে তাকালে হারাধন।—কি যে বল, হবে না আবার!

—যাঃ, এইবার বাড়ী যা! আমি শোব।

—যাই। কিন্তুক আর এক মুস্কিল হয়েছে। লোটোর বেটা চরণ কিন্তুক বড় ডাকাবুকো হয়ে উঠল গো! বাপ-মরা ছেলে আর বিশেষ ওর মা বড় ভাল মানুষ। তারই লেগে ওকে কেউ কিছু বলে না!

—কি করলে কি চরণা ?

—ছোঁড়া নতুন জোয়ান হয়ে উঠেছে তো ! আজকাল কেবল আমাদের শিবের বাড়ীর চারপাশে ঘুর ঘুর করে ফিরছে । কি করি বল দেখি ?

—কি আর করবি ? আর কিছু দিন দেখ । তা বাদে একদিন মেরে গা-গতর ভেঙে দিবি !

—সেই ভাল !

চলে গেল হারাধন ।

সেই মাসেই বিয়ে হল রামের খুদি পিসির পছন্দ-করা কন্যার সঙ্গে ।

নতুন বউয়ের পয় খুব । খুদি পিসির মুখে নতুন বউয়ের পয়ের কথা ধরে না । বিয়ের পর থেকেই রামের সংসারে বাড় বাড়ন্ত আরম্ভ হল আবার নতুন করে । বিয়ের দু বছরের মধ্যেই দু' দুটো ঘটনা ঘটল রামের সংসারে । চাঁদা রাজার ভিটের পশ্চিমে, বারুণীর ধারে, অথচ একটু দূরে একটা এক-চকে আড়াই বিঘে জোল জমি কিনলে রাম । জমি তো নয়, একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আঁটন । তা ছাড়া বউ পদ্ম'র কোল আলো করে কালো কেষ্ট ঠাকুরের মত এল রামের বংশধর চন্দর ।

রামের স্ফূর্ত্তির আর সীমা নাই । তার এখন শুধু মাঠের দিকে নজর নেই, বাড়ীর দিকেও নজর এসেছে । সময় পেলেই বাড়ীতে গাছপালার পরিচর্য্যা করে, অগ্রিম সৌখীন ফল সব্জী যাতে উঠে আসে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে । আর গোটা বাড়ীতে কোথায় সামান্য ফাটল আছে খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, সামান্য ফাটল নজরে পডলেই গোবর মাটি দিয়ে বন্ধ করে দেয় । পোকা-মাকড়, বিছে-কাঁকড়া, সাপ-খোপের ভয়ে । দামাল ছেলে যা দুরন্ত । সারাদিন মায়ের চোখের একটু আড়াল হলেই ছুটে গিয়ে উঠোনে পড়ে ।

রাম বাড়ীতে থাকলে সে ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকে তুলে নেয় । স্ত্রীকে গালাগাল দেয়, তাড়না করে ছেলেকে না দেখার জন্যে । বলে—ভেবেছিস কি ? ছেলে আমার উঠোনে ধূলো মেখে ঘুরে বেড়াবে, আর উনি গিন্নী হয়ে গিন্নোমো করে ঘুরে বেড়াবেন । অমন গিন্নোমোর মুখে আগুন, বারুণীর জলে ভেসে যাক । আমার ছেলের যদি কিছু হয় তা হলে আমি আর বাকী রাখব না কিছু । দুখানা করে কেটে চাঁদা দিঘীর জলে ঠাকরুণের কাছে পাঠিয়ে দোব । সেইখানে মনের সুখে চাঁদা রাজার সঙ্গে ঘরকন্না করবি । এই বলে দিলাম । হাঁ ।

অনেক আস্ফালন করে সে ছেলেকে আদর করতে আরম্ভ করে।—ওরে আমার চন্দর রাজা রে! চন্দর বাবা রে! ঠাকরুণির আশীর্ব্বাদে আমার চন্দর চাঁদা রাজা হবে।

পদ্ম এমনিতে ঠাণ্ডা মানুষ। কিন্তু স্বামীর অকারণ তিরস্কারে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, বলে—হ্যাঁ, আমার ছেলের রাজা হয়ে কাজ নাই চাঁদা রাজার মত। আমার ছেলে চন্দর, চন্দর হলেই হবে। এইবার আমাকে একটা ঝি রেখে দাও, তা হলে রাণী মায়ের মত ছেলে কোলে করে বসে থাকি। দাও, আদর করতে হবে না ছেলেকে। আমার ছেলে আমাকে দাও।

ছেলে ততক্ষণে মায়ের কোলে যাবার জন্যে কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে। মাকে দেখে সে কান্না বেড়ে গিয়েছে আরও। ছেলে মায়ের কোলে যাবার জন্যে তখন দু হাত বাড়িয়েছে!

ছেলের রীতি-প্রকৃতি দেখে ছেলের পিঠে একটা চাপড় সজোরে বসিয়ে দিয়ে তার মায়ের কোলে ফেলে দিলে—যাঃ, যাঃ হারামজাদা। মা-সোহাগে ছেলে মায়ের কাছে যা!

পদ্ম পরম সমাদরে ছেলেকে বুকে তুলে নিয়ে চলে যায়।

এমনি করেই বাবার আকস্মিক আদর ও প্রহার, আর মায়ের সদাজাগ্রত দৃষ্টি আর স্নেহের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠতে লাগল চন্দর।

তার সব চেয়ে আরামের সময় দুপুর বেলা। ধান সিদ্ধ করে, খারে-সিদ্ধ-করা কাপড় কেচে, রান্না বান্না করে খেয়ে দেয়ে পদ্ম ঢেঁকি শালায় পান মুখে দিয়ে গিয়ে বসে। একে একে এসে জোটে পাড়ার ঝিউড়ি মেয়েরা আর বউরা। গল্প আরম্ভ হয়। মায়ের কোলের কাছে বসে থাকতে থাকতে উঠোনে উঠে গিয়ে খেলতে আরম্ভ করে।

গল্প করলে কি হবে পদ্মর এক চোখ সব সময় থাকে ছেলের উপর। রৌদ্রে বেশী ঘোরাঘুরি করলেই পদ্ম ডাকতে আরম্ভ করে—চন্দ, উঠে আয়, রোদে থাকিস না। ওরে ও মুখপোড়া!

শুনলে ভাল, না শুনলে উঠোনে নেমে এসে কোলে করে তুলে নিয়ে গিয়ে আবার কোলের ভিতর চেপে ধরে গল্প করতে বসে।

সব চেয়ে আরামের সময় সন্ধ্যাবেলা। সারাদিনের কাজকর্ম্ম সেরে খুদি পিসি মায়ের কাছে এসে বসে। মা সারাদিনের পরিশ্রমের পর মাটিতে মাদুর বিছিয়ে একবার গা গড়ায়। আর সে বসে খুদি পিসির কোলে। গল্প আরম্ভ হয়।

অতি সহজ এবং ছোট প্রতিদিনের লৌকিক জীবনে যে কাহিনী তাতে চন্দরের মন ভরে না। তার মধ্যে যা শুনবার তা সে সব শুনে নিয়েছে খুদি পিসির কাছে। পিতামহের মৃত্যু, বাবার বোকা অথচ সরল জীবনের দুঃখ, ও অবিরাম পরিশ্রম, বাবার উন্নতি, লোকের সঙ্গে বাবার ব্যবহার, তার বাবা আর মায়ের বিবাহ, সব সে শুনে নিয়েছে। খুদি পিসির এবং তার কাছে আজ আর তার কোনটাই ইতিহাস নয়, কাহিনী। যে কাহিনী তার জীবনের মর্ম্মমূলে নানান বিচিত্র রস সিঞ্চন করে চলেছে। খুদি পিসির কাছে যত গল্প শুনেছে তত তার ভাল লেগেছে বাবাকে নতুন করে। এ ভাল লাগা সে বোঝাতে পারে না কাউকে। কিন্তু নিজে বুঝে সে রসে নিজেই আপ্লুত হয়।

সন্ধ্যায় পিলসুজের প্রদীপের সামনে খুদি পিসির কোলে বসে বলে—গল্প বল।

পিসি গল্প বলতেই বসেছে। তবু শ্রোতার আগ্রহ দেখে বলে—আর কত গল্প বলব তোকে! সব বলেছি তো তোকে, তা শোন। তোর ঠাকুরদাদার গল্প বলি। সে মানুষটা তোর বাবার মত বোকা ছিল না। জানিস—

শ্রোতা বিরূপ হয়ে উঠল। বললে—না, ও গল্প শুনব না। তুমি অন্য গল্প বল। ঠাকরুণের গল্প বল।

ঠাকরুণ, ভবসুন্দরীর আসল নামটা সন্ধ্যাজলের ব্রাত্য, শিক্ষাহীন মানুষের কাছে হারিয়ে গিয়েছে। তাদের কাছে তিনি গ্রাম-দেবী, ঠাকরুণ।

এখানকার ছোট লৌকিক জীবনের চারিপাশে অতি বৃহৎ অলৌকিক ও অতি-প্রাকৃত জীবন আপনার পরিধি বিস্তার করে আছে। তাকে আপনার জীবনের পরিমণ্ডলে ধারণ করে নিয়েছে এখানকার মানুষ। দিনের আলোয় আলোকিত কালের এ-পাশে ও-পাশে যে সুবিস্তীর্ণ অন্ধকার, তাদের জ্ঞানের চারিপাশে কল্পনা ও সংস্কারের সুবৃহৎ যে কুহেলিকাচ্ছন্ন পরিমণ্ডল তার মাঝখানে অন্ধকার রাত্রির ধ্রুব তারার মত দেবী ভবসুন্দরীর আসন। দেবী অপরূপা সুন্দরী, দয়াময়ী। কিন্তু তাঁর প্রকাশ সব সময় বিভীষিকার মধ্য দিয়ে। ঠাকরুণের গল্প, মানে তাঁরই গল্প!

পিসি তো তাই বলতে চায়। সেই কাহিনী বলতেই তার রুচির ও চিত্তের সব চেয়ে বেশী স্ফূর্ত্তি। যে সব কাহিনী পিসি নিজের বাল্যকালে শুনেছে, তার জীবনকালের মধ্যে এখানে যা ঘটেছে সব কিছুকে পিসি মিলিয়ে নিয়ে জুড়েছে নিজের অভিজ্ঞতায়। শুকনো কাঠ কি ডালপালা সংগ্রহ করতে গিয়ে, গোবর

কি বন্যফল সংগ্রহ করতে গিয়ে পিসি সন্ধ্যাজলের ভূগোলটা জেনেছে খুব ভাল করে। সেই ভূগোলের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে খাসা মিলিয়ে নিয়েছে পিসি।

শ্রোতার অনুরোধে সেই কাহিনীই আরম্ভ করে পিসি। প্রথমেই ঠাকরুণের উদ্দেশে প্রণাম করে।—জানিস ঠাকরুণের অশেষ দয়া এই গাঁয়ের ওপর। ঠাকরুণ এই গাঁয়ে আছে জন্ম জন্ম ধরে, এই গাঁ'কে পাহারা দিচ্ছে। আবার ঠাকরুণের রোষেই চাঁদা রাজার বংশ শেষ হয়ে গিয়েছে।

দেখেছিস তো গাঁয়ের দক্ষিণে বারুণী নদী? তুই দেখিস নাই! ছোট ছেলে, দেখবি কি করে? ঐ বারুণী নদীর গায়ে চাঁদা রাজার ছেলে গড তৈরী করিয়েছিল। প্রথম গড করিয়েছিল চাঁদা রাজা নিজেই। তা দেবীর রোষে গডের একদিক তৈরী করার প্রথম বছরেই ভেঙে গেল। তারপর দেবীর মূর্তি গড়ে পূজো করলে চাঁদা রাজা। দেবীর রাগ তখনো যায় নাই। পূজোর দিনেই প্রাণ পেয়ে ঠাকরুণ নিজেই মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবল। দেবীর পিছু পিছু চাঁদা রাজাও জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু ঠাকরুণ যা পারে তা কি মানুষে পারে? চাঁদা রাজা জলে পড়ে জল খেয়ে মরে গেল, ভাসতে লাগল জলে। সেই থেকে মাটির পিতিমে তৈরী করিয়ে পূজো!

ঠাকরুণের রাগ আর যায় না। এ্যাঁ, গোটা পিথিমীর দেবতা, আর তুই কি না আমাকে এই ছোট গাঁয়ে মন্ত্র দিয়ে বেঁধে আটকে রাখলি? আচ্ছা রাখ, দেখি তোর কত শক্তি!

স্বপ্ন দেখে চাঁদা রাজার ছেলে ঠাকরুণের কাছে হত্যে দিলেন। শেষে ঠাকরুণ আর স্থির থাকতে না পেরে স্বপ্নে তাকে দেখা দিলেন। সেই 'সোন্দর' মুখ রাগে রাঙা টকটকে হয়েছে, চোখ লাল হয়ে ঘুরছে ভাঁটার মত।

রাজপুত্র বললেন—মা, আমি তোমার কাছে কোন্ অপরাধ করেছি। আমি তো তোমার ছেলে! ছেলের যদি দোষও থাকে তবু কি মা রাগ করে? কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়!

ঠাকরুণ শান্ত হলেন, বললেন—খুব যে আমাকে আটকে রাখলি! কিন্তু তার ফল দেখলি তো! তোর বাবাকে দিঘীর জলে ডুবিয়ে মেরেছি। তোর বাড়ী ভেঙে দিয়েছি বানের জল দিয়ে! এখনও হয়েছে কি?

রাজপুত্র বললেন—মা, তোমাকে মা বলেছি, এখন যা হয় কর।

—মানলাম। তোর আর ক্ষতি করব না। আমাকে জোড়া পাঁঠা দিবি আসছে বছর থেকে।

—দোব মা! তুমি আমার রক্ত চাও, তাই দোব তোমাকে।

—না। তুই আমার ছেলে। তোর ওপর আমি খুসী হয়েছি। তোর বংশে যেন আমাকে সবাই মা বলে পূজো করে!

—করবে মা জননী। আমি আমার বংশাবলীকে সেই হুকুম দিয়ে যাব।

—শুধু আমাকে নয়, স্ত্রীলোককে মায়ের চোখে দেখবে।

—যে আজ্ঞা মা জননী!

—আর কিছু না। তোর ওপর আমি তুষ্ট হয়েছি। আয় উঠে আয় আমার সঙ্গে!

—কেমন করে যাব মা? এখন যে 'রাত্তি'র অন্ধকার! পথ চিনব কেমন করে?

—আমার সঙ্গে আসতে তোর ভয়? উঠে আয়, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব তোকে। কেমন করে গড তৈরী করবি তোকে দেখিয়ে দি!

রাজপুত্র স্বপ্নের ঘোরে উঠে দাঁড়ালেন। মায়ের অঙ্গের জ্যোতিতে সমস্ত জায়গাটা আলো হয়ে উঠল। মা আগে আগে পথ দেখিয়ে চললেন, পিছন পিছন হাত জোড় করে চললেন রাজপুত্র।

সেই নির্জ্জন অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকারে মা সব আলো করে চললেন বারুণী নদীর ধারে ধারে, তারপর হঠাৎ উত্তর মুখে ফিরলেন। ফিরে চলতে লাগলেন। মায়ের পায়ের ছাপ পড়তে লাগল। মা বললেন—বাবা, আমার পায়ের এই ছাপে ছাপে সীমানা নিয়ে গড় তৈরী কর। বানের জলে আর কিছু করতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে মা হঠাৎ মাটির ভেতর ঢুকে গেলেন। রাজপুত্র আর যেতে পারলেন না ভয়ে। তিনি হাত জোড় করে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মা মাটির ভেতর থেকে ডাকলেন—আয়, ভয় কি? আমার পিছন পিছন চলে আয়!

—বড় অন্ধকার যে মা!

গর্ত্তের মুখ থেকে আলো বেরিয়ে এল। সেই উঁচু ঢিবির ভেতর সেই আলোয় পথ দেখে রাজপুত্র ঢুকে পড়লেন, খানিক পরে মায়ের পিছন পিছন গিয়ে ওপরে উঠলেন।

তারপর আবার পশ্চিম মুখে চলে বারুণীর মুখে এসে থামলেন মা। বললেন—বাবা, বারুণীর খাল কেটে উত্তর মুখে মাটির তলা দিয়ে নিয়ে এসে

আবার এই দিক দিয়ে বারুণীর সঙ্গে যোগ করে দাও। আর তোমার গাঁয়ের বাইরে যে 'কাঁদর' আছে সেটাও জুড়ে দাও নদীর সঙ্গে অমনি করে। একটায় তোমার গড়ের, আর একটায় সন্ধ্যাজলের সীমানা আটকানো থাকবে। বাইরে থেকে কেউ এসে তোমার ঘরে ঢুকতে পারবে না। আমি বর দিলাম তোমাকে।

তারপর ঠাকরুণের দয়ায় সন্ধ্যাজলে কত বড় রাজ্যের পত্তন হল। ছোট রাজার কত নাম, কত রবরবা। মস্ত বড় গড় তৈরী হল, বারুণী নদীর জল খালের ভেতর দিয়ে, রাজবাড়ীর ভেতর দিয়ে, মাটির তলা দিয়ে রাজবাড়ীকে ঘিরে রইল। মায়ের দয়ায় কার সাধ্যি ছোট রাজার রাজ্যে হাত দেয়!

ছোট রাজা রাজকার্য্যে বসবার আগে প্রতিদিন ঠাকরুণের মন্দিরে প্রণাম করেন, হাত জোড় করে বলেন—মা, আমাকে ভক্তি দিও! তোমার উপরে আমার যেন অচলা ভক্তি হয়! পরের 'স্ত্রী'কে, কন্যেকে, যেন নিজের মায়ের মত দেখি, পরের টাকাকে যেন আঁস্তাকুড়ের ময়লা জ্ঞান করি! তোমাতে যেন মতি থাকে মা!

মায়ের বরে ছোট রাজার কত বাড়বাড়ন্ত!

এমনি করে ছোট রাজার দিন গেল। ছোট রাজার ভক্তিতে ঠাকরুণ 'পসন্ন' হয়ে সন্ধ্যাজলে বাঁধা রইলেন তিন পুরুষ ধরে। তারপর রাজবংশে পাপ ঢুকল।

তখন বারুণী নদী কত চওড়া ছিল, এ-কূল ও-কূল দেখা যেত না। আর তেমনি জলের টান আর জলের কি নীল রঙ! তখন নদীতে পারাবার হত অবিরাম। আর বড় বড় কিস্তী, গয়নার নৌকো, ছিপ চলত বারুণী বেয়ে! কত ব্যবসা! তসর আর রেশমের কাপড়, লা, পেতলের বাসন বোঝাই হয়ে নৌকো যেত অন্য দেশে; আর এখানে সুতী কাপড়, নুন, মশলা সব বোঝাই হয়ে বড় বড় নৌকো আসত দেশান্তর থেকে। যারা যেত কিংবা আসত নৌকো করে তারা যখন থেকে দূর রাজবাড়ীর চূড়া আর ঠাকরুণের মন্দিরের চূড়া দেখতে পেত তখন নৌকো থেকে ঠাকরুণের নাম করত, উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করত ঠাকরুণকে।

একদিন তখন সন্ধ্যে হয় সবে। ঠাকরুণের মন্দিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা সন্থ থেমেছে। তখনকার রাজার ছেলে আরতির সময় ঠাকরুণের মন্দিরে না গিয়ে নদীর ধারে বারান্দায় ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে গল্প করছে এমন সময় দেখলে একটা বড় নৌকো, বারুণীর জলে ভেসে চলেছে আস্তে আস্তে। নৌকোয়

অনেক আলো জ্বলছে, গান চলছে নৌকোয়! নদীর ধারে বারান্দা থেকে হঠাৎ রাজপুত্র ডেকে উঠল—কে যায়? থামাও নৌকো!

নৌকো থামল না। এগিয়েই চলল।

রাজপুত্রের রাগ হল। হুকুম দিলেন এখুনি আমার ছিপ বের কর। আমি ধরব ঐ নৌকোকে।

'মন্ত্রীপুত্র' ছিল কাছেই। সে হাত জোড় করে বললে—'রাজপুত্র', এ কাজ আপনি করবেন না। ঠাকরুণের নিষেধ।

—আমি মানি না কিছুই। নামাও ছিপ!

বিশ বৈঠার ছিপ নামল খালের জলে। এদিকে দশ দাঁড় ওদিকে দশ দাঁড় পড়ে ছিপ পাখীর মত ছুটে চলল। নৌকোর কাছাকাছি আসতেই রাজপুত্র হেঁকে বললেন—থামাও নৌকো! তাঁর দলবল সব নৌকোতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ওদের নৌকোর সব আলো নিভে গেল, কান্না উঠল ওদের নৌকোয়! আবার থেমেও গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকারের মধ্যে ছিপখানা সাপের মত আবার এসে গড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এক বড় জমিদারের মেয়ে আর জামাই চলেছিল শ্বশুর বাড়ী থেকে। রাজপুত্র সেই ছেলেকে মেরে নদীতে ফেলে দিয়ে সেই মেয়ে আর ধন-দৌলত নিয়ে এসে তুললেন গড়ের মধ্যে।

এর পর থেকেই আরম্ভ হল ডাকাতি। রাজপুত্রের ছিপ জলের শয়তান কুমীরের মত চুপিসারে বিশ দাঁড় বাঁয়ে, বিশ দাঁড় ডাইনে ফেলে চল্লিশ পা-ওয়ালা কুমীরের মত অন্ধকারে নিরীহ যাত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, অন্ধকারের মধ্যে কাজ সেরে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু পেঁটরায় পেঁটরায় সোনাদানা জমল রাশি রাশি। তাই নিয়ে আর রাজপুত্রের অহঙ্কারের আর ফুর্তির শেষ নাই।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে ঠাকরুণের শোধ নেবার রোষ জেগে উঠল। মাটির তলা দিয়ে বারুণীর যে জল যাবার রাস্তা ছিল, ওপরে বাড়ী ধ্বসে সে পথ বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর দু-পুরুষ যেতে না যেতে বংশ নির্ব্বংশ। শেষকালে বাড়ীও ধ্বসে পড়ল। ঠাকরুণের কোপে পড়ে গাঁয়ের দক্ষিণে সেই রাজবাড়ী আজ পাহাড় প্রমাণ ঢিবি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ঠাকরুণের কোপ আজও কমে নাই।

সেই যারা ডাকাতি করত, যারা ডাকাতি করে এসে রাজবাড়ীতে ফিরে সোনাদানা নিয়ে ফূর্তি করত তাদের ঠাকরুণ আজও ছাড়ে নাই। তারা সব প্রেতাত্মা পিশাচ হয়ে ঐ টিবির ভেতর ঘরে ঘরে বন্দী হয়ে আছে। চাঁদনী রাতে যেদিন ঠাকরুণের মন খারাপ করে সেদিন টিবির উপর উঠে হয় বারুণীর জোছনায় চিক-চিকে জলের দিকে না হয় চাঁদা দিঘীর আয়নার মত জলের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। তাঁর কান্না শুনে সেই বন্দী পিশাচরা উঁকি মেরে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের দেখেই ঠাকরুণের চোখ রাগে জলে উঠে ভাঁটার মত ঘুরতে আরম্ভ করে, তারা সব ভয়ে ছুটে এসে ভাঙা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ইঁদুর, চামচিকে আর সাপের মধ্যে ইঁদুর সেজে কিচমিচ করে ঘুরে বেড়ায়, নয় সাপ হয়ে বুকে হেঁটে ফেরে, নয় চামচিকে হয়ে কড়ি ধরে ঝোলে।

আবার বর্ষার দিনে অন্যরকম ঘটান ঠাকরুণ! তখন বারুণী জলে থৈ-থৈ করে, বান আসে নদীতে। সেই পিশাচগুলো ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলসানিতে, মেঘের গুরু গুরু ডাকে, ঝম ঝম বৃষ্টিতে যখন ভয়ে ঘরের ভেতর কোনে কোনে লুকিয়ে থাকে তখন ঠাকরুণ এসে ওদের ঘরের থেকে বের করে দেন যা, বেরো। যা এইবার নদীতে যা। লোকের কেড়ে নিয়ে আয়। তারা সেই জল ঝড় বিদ্যুৎ মাথায় করে ভয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়, কিন্তু ভয়ে টিবির ওপরে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাকরুণ তখন জঙ্গলে বেতের লতা থেকে বেত টেনে নিয়ে এলো পাথাড়ি মারেন। বলেন—যা পাপ কর গিয়ে।

ওরা ভয়ে ছুটে নেমে আসে টিবির ওপর থেকে। ওদের পায়ের ঠেলায় গাছ-পালা ইট পাথর খসে খসে পড়ে।

শীতের দিনে অন্য শাস্তি! বলতে গায়ে কাঁটা দেয়। একথা আমি শুনেছিলাম আমার বাবার পিসির কাছে। বাবার পিসি তখন বার তের বছরের মেয়ে।

সাঁঝ বেলায় শেয়ালরা ডাকা শেষ করে নিজের নিজের গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। চাষারা সব মাঠ থেকে বাড়ী ফিরে গিয়েছে। মাঠ থেকে তখন ধান ওঠার সময়। বেশ শীত আছে। সে গিয়েছিল ধানের শিষ কুড়োতে। শিষ কুড়িয়ে কুড়িয়ে অনেক জড়ো করেছে তখন। কিন্তু এ-মাঠ ও-মাঠ করে শিষ কুড়োতে কুড়োতে সে একবারে গিয়ে পড়েছে নদীর ধারে। তার তখন পথ ভুল হয়ে গিয়েছে।

সাঁঝ বেলা পার হয়ে গিয়েছে। জুলকো তারা এতক্ষণ ঝকঝক করছিল,

এইবার ডুবে গেল। শেয়ালগুলো আবার ডেকে উঠল। এতক্ষণ সব কে কোথায় ছিল কে জানে, পেত্যাগুলো সব জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল। মাঠের ওপর, নদীর ওপর, ছুটে বেড়াতে লাগল। এমন সময়, কেউ কোত্থাও নাই, কোথা থেকে এক চল্লিশ দাঁড়ের ছিপ গড়ের পাশের বাঁক থেকে সটান ছিটকে এল নদীর ওপর। পেত্যার যেমন আলো জ্বলে আর নেভে, তেমনি আলো, কিন্তু জ্বলেই আছে, নেভে না। তেমনি আলো ক'টাই জ্বলছে বাতির মত ছিপের ওপরে। আর ছিপের মাঝখানে নীলাম্বরী-পরা একটি যুবতী মেয়ে একটা বেত হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আর বুঝলি ছিপের দুপাশে বসে আছে দু'সার মানুষ, দাঁড় বাইছে! কিন্তু কারও মুণ্ডু নাই। সব কবন্ধ। হেঁই হেঁই করে চল্লিশটা গলার ভেতর দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলার মত শব্দ আসছে, আর তারই সঙ্গে চল্লিশটা দাঁড় পড়ছে এক সঙ্গে, ছিপ তাতেই ছুটে চলেছে তীরের মত।

বুঝলি, সেই যে সব বদমাইস নদীতে ডাকাতি করত, লুঠ করত, মেয়েছেলে ধরে নিয়ে যেত, তারা সব মরেও খালাস পায় নাই। ঠাকরুণ তাদের বেত হাতে শাস্তি দিচ্ছে—কেমন, কর চুরি, কর ডাকাতি!

আর একবার সে ভীষণ ব্যাপার! সে কে দেখেছিল তা জানিনা। সে আরও আগের কথা! ঐ নিধির বাবার বাবার বাবা। সে যা দেখেছিল! সে যে কেন গিয়েছিল বাপু, তা আমি জানি না। সে একদিন বিকেল বেলা, পড়ন্ত রোদের ধারা গিয়ে পড়েছিল খালের ধারে। যেখানে নদী থেকে খালটা বেরিয়েছে। সে গিয়ে দেখে কি—সাতটা মানুষ গলা পর্যন্ত খালের ধারে পাঁকে পোঁতা! আর তাদের মুখের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে দু দু'টো করে শেয়ালে! সে কি শেয়াল সব, খায় আর মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসে!

দেখে নিধের বাবার বাবার বাবা যে সেই এসে ভয় পেয়ে শুল, আর উঠল না, তাতেই মরে গেল। বাবাঃ!—

পিসি গল্প শেষ করে চুপ করে! রাত্রির অন্ধকার তখন স্তব্ধ ঘন হয়ে পিলসুজের কাছ পর্য্যন্ত এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তারই সঙ্গে ভয়, ঠাকরুণের মহিমা, আর এক আশ্চর্য্য অলৌকিক লোকের আভাষ তার চারিপাশে এসে অন্ধকারের মধ্যে স্তরে স্তরে অপেক্ষা করে আছে যেন। চন্দর আপনার ছোট ছোট হাত দুখানা দিয়ে খুদিপিসির গলা জড়িয়ে ধরে।

খুদি পিসি তার ভয়টা অনুভব করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—ভয় কি! কোন ভয় নাই! ঠাকরুণ আছেন, ঠাকরুণকে প্রণাম করে

যেও, ঠাকরুণ যা বলেছে শুনো, কোন ভয় থাকবে না। রণে বনে অরণ্যে ঠাকরুণ রক্ষে করবেন!

অন্ধকারের মধ্যেই কে প্রশ্ন করলে—কে রক্ষে করবে পিসি?

চন্দর চমকে উঠে পিসির গলা আবার জড়িয়ে ধরল।

পিসি হেসে বললে—আরে গেল, ছেলের ভয় দেখ রে! রামা এলি নাকি?

—হ্যাঁ পিসি! অন্ধকারের ভিতর থেকে এসে পিসির পাশে মাদুরের উপর বসল রাম।

—ও কি! অমন করে পিসির গলা জড়িয়ে ধরে আছিস কেন রে? ভয় লেগেছে? কিসের ভয়? কাকে ভয়? কোন ভয় নাই! ঠাকরুণ আছে আর আমি আছি। ছেলেকে পিসির কোল থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে চেপে ধরলে।

পদ্ম উঠে বসেছে ঘুম থেকে। ঘোমটা টেনে নিয়ে সে সরে বসল।

ছেলেকে বুকে চেপে ধরে রাম বললে—ভয় কিরে বেটা? ভয়? কাল 'আমুতির' লড়াই আছে। দেখবি কেমন সব কাল তুলে তুলে আছাড় মারি। ধরব কি ফেলব!

ঘোমটার ভিতর থেকে নথ নেড়ে ধমক দিলে পদ্ম—আর বুড়ো বয়সে কুস্তী করতে হবে না। হাড়গোড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে না তা যেন মনে থাকে! ওকে বারণ কর পিসি!

হা হা করে হেসে উঠল রাম, বললে—দেখবি, দেখবি! কাল যখন সবাইকে হারিয়ে বাড়ী আসব তখন দেখবি! সেই সব ব্যবস্থা করতেই তো দেরি হয়ে গেল!

আবার নিশ্চিন্ত মানুষের অকারণ হাসি হাসতে লাগল রাম—হা হা হা হা, হা-হা!

কুস্তীর আখড়া। অম্বুবাচীর লড়াই! আখড়ার চারিপাশে বসেছে শূরবীর পুরুষেরা। ছেলেকে পাশে নিয়ে রাম রায় বসে আছে মধ্য মণির মত।

একে একে অল্পবয়সীদের মল্লযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। গায়ে মাটি মেখে, মাটি আর খুসী ছড়িয়ে ছড়িয়ে লড়াই করে গেল কিশোর আর তরুণরা। তারা যেতেই শেওড়াদের মাতব্বর হারাধন উঠল, একবার তাকাল রাম রায়ের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে।

হারাধন আসরে দাঁড়িয়ে বললে—এই কে কে আসবে চলে এস। রায় কত্তার সঙ্গে লড়তে হবে।

এল পর পর দুটো অল্পবয়সী জোয়ান ছেলে। রাম কাপড় গুটিয়ে আসরে এসে মাটির মধ্যে বসল। প্রথম জনকে মিনিট খানেকের মধ্যেই চিত করে মাটির উপর ফেলে তার বুকের উপর বসে হেসে বললে—হার? বল হেরেছিস?

বিজিত কাল মুখে সাদা দাঁত আকর্ণ বিস্তার করে বললে—হ্যাঁ হার! তোমার কাছে হারব তাতে আর লজ্জা কি?

হেসে রাম তার বুকের উপর থেকে উঠে বললে—যাঃ, ভাগ।

দ্বিতীয় জনকে মাথার উপর দুইহাতে তুলে বললে—এইবার মাটিতে ফেলে দি? হেরেছিস?

মাথার উপর থেকে সে বললে—এই দেখ, আমি যে হেরেছি তা আর আমাকে বলতে হবে কেনে? সবাই বলছে। তোমার হাতেই তো চিত হয়ে আছি।

বাস, ছুটি! আর কি লডাই শেষ!

—এ কি হল হারা? আমাদের সন্ধ্যাজলে শূরবীর নাই আর?

—তাই তো দেখছি গো।

অকস্মাৎ জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল। ঠেলাঠেলি, কে যেন পালাচ্ছে!

—কি হল রে? রাম জিজ্ঞাসা করলে।

—আমাদের চরণা গো! রায় কত্তার সঙ্গে এক হাতের বড় ইচ্ছে ওর! এখন পালাচ্ছে!

রাম ছুটে গিয়ে ছেলেটার হাত চেপে ধরে আখড়ার মধ্যে এনে ফেললে।

ছেলেটা, ছেলেটা বৈ কি, বছর, চব্বিশেক বয়স হবে, কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে—গায়ে আমার জোর খানিক-আধেক আছে, তা বলে কি তোমার সঙ্গে পারি গো রায় কত্তা?

তাকে মাটিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে রাম বললে—দেখি তোর গায়ে কেমন জোর আছে!

ধাক্কা খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছিল ছেলেটা! এবার ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মত ক্ষিপ্র গতিতে সে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল ক্রোধে রামকে সে জড়িয়ে ধরলে!

রাম তাকে ধরেই বুঝতে পেরেছে এ ছোকরাকে কায়দা করা অত সহজ

ব্যাপার নয়। সে খুব ধীর সংযত হয়ে লড়তে লাগল। অনেক ধস্তাধস্তি করে মাটিতে তাকে ফেললে রাম। তার পিঠের উপর বসল। বললে—এইবার চিত করে দি?

—পার তো কর!

—আচ্ছা! রাম বিপুল আক্রোশে তার হাতখানা মুচড়ে ধরলে।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করে তাকে হারিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়াল রাম। চরণও টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল।

রাম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে—বারে, তুই এমন জোয়ান হয়েছিস আমার তো জানা ছিল না! সাবাস।

চরণ তার পায়ে হাত দিয়ে তাকে প্রণাম করলে। বললে—তা বলে কি তোমার হাতে হাত দিতে পারি গো।

—না, না, তুই খুব জবর জোয়ান হবি রে!

ক্রমে অন্ধকার হল। আসর ভাঙল। চন্দর কাঁদতে আরম্ভ করেছে। বছর ছয়েকের ছেলে। আর কতক্ষণ মা ছেড়ে থাকে! হারাধন বললে—ও কত্তা, বাড়ী যাও এবার! ছেলে কাঁদছে।

রাম ছেলেকে কোলে নেবার আগেই চরণ এসে চন্দরকে কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে বললে—চল গো কত্তা, আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি!

রাস্তায় যেতে যেতে রাম আবার শরীরের এবং শক্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলে—বড় আচ্ছা শরীরটা বেঁধেছে রে তোর! কিন্তু তুই আজ আমার বাঁ হাতের আঙুল মচকে দিয়েছিস। ফুলে উঠল হাতটা!

চরণ হাসল, বললে—তুমিই কি আমাকে ছেড়েছ কত্তা! আমার ডান হাতে যা মোচড় দিয়েছ তাতে ঘাড়ের কাছ থেকে হাতখানা খুলে দেবার দাখিল করেছিলে!

চরণ হাসতে লাগল! হাসি থামিয়ে বললে—একটা কথা বলছিলাম গো কত্তা!

—বল। রামের হঠাৎ মনে পড়ল বছর কয়েক আগে হারাধন এই ছেলেটার নামেই অভিযোগ করেছিল।

চরণ বললে—ক' বছর আগে তোমার নাম করে আমাদের মাতব্বর আমাকে শাসিয়েছিল, বলেছিল—শিবের বাড়ীর চারিদিকে অমন করে ঘুরলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে রায়-কত্তা। তোমার নাম শুনে আমি মেনেছিলাম। আমার তখন খেতে ছিল না, পরতে ছিল না; জমি ছিল না জমা ছিল না;

তাই তোমার কাছে আসি নাই। এখন আমার তিন বিঘে জমি হয়েছে। তুমি এইবার শিব কাঁকার মেয়ের সঙ্গে আমার 'সাঙার' (দ্বিতীয় বিবাহ) ব্যবস্থা করে দাও।

তার পিঠে চাপড় মেরে রাম বললে—নিশ্চয় দোব। কাল হারাকে বলব।

বাড়ী ফিরে ছেলেকে মায়ের কাছে ছেড়ে দিয়ে বললে—লাও তোমার গোপাল লাও। সব-হারিয়ে দিয়ে এসেছি। লাও এখন খানিকটা চুনে-হলুদে কর তো! হাতে লাগাতে হবে। আঙুল মুচড়ে গিয়েছে।

পদ্ম রেগে চুনে-হলুদ গুলে তার পায়ের কাছে ঠক করে নামিয়ে দিয়ে গেল।

সে একবার স্ত্রীর দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বাটিতে আঙুল দিলে।

পরদিন সকালে আবার দরকার হল চুনে-হলুদের। রাত্রিতে কুস্তী করা এবং হাতে লাগা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে একদফা তার ঝগড়া হয়ে গিয়েছে। চন্দর জানে না। সে তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

সকালে সে মাঠে বেরুবার আগে বললে—চুনে-হলুদ চাই আমার!

পদ্ম'র রাগের জের তখনও মেটেনি। সে চুনে-হলুদ এনে তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিলে।

রাম গম্ভীরভাবে বললে—হাতে লাগিয়ে দে! সে হাতটা বাড়িয়ে দিলে রাজার মত।

পদ্ম বললে—আমি পারব না। বলে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে স্বামীর কথার অপেক্ষা না করে চলে গেল।

রাম গম্ভীরভাবে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত। তারপর লাথি মেরে চুনে-হলুদের পাত্রটাকে উঠোনের একপ্রান্তে পাঠিয়ে দিয়ে গম্ভীরস্বরে বললে—আমি চললাম। আর যেন না ফিরি আমি!

চন্দর উঠোনে খেলা করছিল। বাবা মায়ের ঝগড়া দেখেই সে খেলা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবা বেরিয়ে যেতেই তার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! বাবা যে বলে গেল আর ফিরবে না! বাবা যদি আর না ফেরে!

তার আর খেলায় মন লাগল না। সে চুপ করে বসে থাকল অনেকক্ষণ। আবার খেলতে লাগল। কিন্তু ঐ একটা কথাই ঘুরে ঘুরে মনে আসে।

রৌদ্র তখন চড়ে উঠেছে। পাখীরাও যেন ক্লান্ত। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। সে আস্তে আস্তে বেরুল বাড়ী থেকে। বাবার খোঁজে। বাড়ীর

চৌহদ্দি পার হয়ে, ঠাকরুণের মন্দিরের ধার দিয়ে, চাঁদা দিঘীর পাশ দিয়ে সে চলতে লাগল। চলতে চলতে সে এসে পৌছুল প্রায় চাঁদা রাজার ভিটের কাছে, শুকনো খালের ধারে। কেউ কোথাও নাই, কেমন ঝিম-ঝিম ঝিম-ঝিম শব্দ, আর ক্বচিৎ পাখীর ডাক। চন্দর হারিয়ে গেল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের মধ্যে। হঠাৎ একবার কাতর করুণভাবে সে ডাকলে—ঠাকরুণ, ঠাকরুণ, আমার ভয় লাগছে!

সে দাঁড়িয়েই আছে চুপ করে। হঠাৎ তার পাশ থেকে তাকে কে প্রশ্ন করলে—ঐ, চন্দ এখানে কেনে দাঁড়িয়ে রে? এ্যা? এখানে এলি কি করে?

চন্দর ফিরে তাকিয়ে দেখলে নিধি দাঁড়িয়ে আছে একটা ছাগলের দড়ি ধরে।

—বাবা কোথা?

—তোর বাবা? বাবাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলি? বাবা তোর মাঠে হাল বইছে। চল বাড়ী চল।

সে তাকে কোলে তুলে নিলে।

* * * *

আবার ক'দিনের মাথায় একদিন হারিয়ে গেল চন্দর।

প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় শুধু কি হারিয়ে যাওয়ার, ঠাকরুণ-প্রেত-পিশাচ সঙ্গে সাক্ষাতকারের ভয়ই ছিল? আরও কিছু কি ছিল না? ছিল বৈকি! বালক বয়সের বিশ্বসংসারের সঙ্গে শুভদৃষ্টির আনন্দও তো ছিল তার মধ্যে! সে কি বিস্ময়! সে কি ভয়। তাই তো আবার তারই টানে টানে বেড়িয়ে পড়ল সে!

আজ যখন বাড়ী থেকে বেরুল তখন মাথায় হিসেব ছিল খানিকটা। বাড়ীর কাছেই চাঁদা দিঘীর পাড়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরে তখন ঘণ্টা বাজছে। সে গিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়াল। কিশোরী পণ্ডিত তখন পিতলের ফুলের সাজি থেকে ফুল আর আতপ চাল বেদীর উপর ছুঁড়ে দিয়ে তারস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করছেন।

মন্দির জমিদারের। জমিদারই দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। পূজোয় পাকা বন্দোবস্তও আছে। নিষ্কর জমি ভোগ করেন কিশোরী পণ্ডিত দেবীর পুরোহিত হিসেবে।

রক্তচন্দন মাখানো, ফুল, বিল্বপত্র আর আতপচালে বেদীটি তখন প্রায় ছেয়ে গিয়েছে। কিশোরী পণ্ডিতের হাতের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল। তিনি

ফুল নিয়ে পিতলের থালায় আতপ চালের উপর সাজানো গুড়ের পাটালির নৈবেদ্যের উপর ছড়িয়ে দিয়ে, কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দিয়ে ঘণ্টাটা আবার সজোরে বাজিয়ে দিলেন। তারপর পুজোর জিনিসপত্র গুটিয়ে, শিখার ফুলটি ঠিক বাঁধা আছে কি না দেখে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

দরজার মুখেই চন্দর দাঁড়িয়ে। তার লোলুপ দৃষ্টি নৈবেদ্যের থালার উপর।

—কে রে? চন্দর? তুই কোথা থেকে এলি? খা পেসাদ খা। বলে নৈবেদ্য থেকে আতপ চাল ঝেড়ে ভিজে গুড়ের পাটালির কয়েকটা টুকরো তার হাতে দিতে গেলেন।

—এই, এই, অমন করে নয়! হাত পাত, হাত পাত। ভাল করে পাত! এ-ই! বলে তার হাতে আস্তে আস্তে পাটালিগুলি আলগোছে ফেলে দিলেন।

—যা, খেতে খেতে বাড়ী চলে যা! তা না হলে তোর মা আবার খুঁজে বেড়াবে তোকে। খুদি পিসির প্রাণান্ত হবে।

কিশোরী পণ্ডিত নেমে গেলেন মন্দির থেকে। তার পিছন পিছন পাটালির টুকরোগুলি লোভীর মত চাটতে চাটতে চন্দরও নেমে এল। কিশোরী পণ্ডিত চলে যেতেই যেতেই সে ধরলে অন্যপথ।

আজ আবার সেই কালকের জায়গায় যাবার জন্যে চলতে লাগল সে।

—এই, এই দেখ! হারে কোথা চলেছিস তুই? দেখ, দেখ ছেলের কাজ দেখ! হন হন করে কোথা চললি রে?

একপাশ থেকে তার হাতটা চেপে ধরলে এসে চরণ।—চল, বাড়ী চল। তোর বাবা এখুনি ফিরল বাড়ী মাঠ থেকে। আয়, কাঁধে লি তোকে। এক গোছা শাদা ফুলে তার এক হাত জোড়া। আর এক হাত দিয়ে তাকে তুলে সে কাঁধে নিয়ে নিলে।

বাড়ী এসে তাকে নামিয়ে দিতেই সে ছুটে বাড়ীর ভিতর চলে গেল। চরণ বাইরে থেকে ডাকলে—রায় কত্তা আছ না কিগো?

—কেরে? কপালের খাম মুছতে মুছতে রাম বাইরে বেরিয়ে এল।—চরণা? কখন এলি?

—এলাম তোমার ছেলেকে নিয়ে! কোথা চলে যাচ্ছিল আপন মনে! ধরে নিয়ে এলাম। আমার কাজও আছে তোমার কাছে!

—কি কাজ বল! বিয়ে তো হয়ে গেল। এইবার মন পাতিয়ে ঘর-সংসার কর। ভাল করে চাষবাস কর।

—হ্যাঁ, করব বৈকি গো! তোমার দয়াতেই তো আমার ঘর-সংসার! তুমি না সহায় হলে কি আমার আর 'রবিমানী' (অভিমানী)-কে বিয়ে করা হোত? মাতব্বর রাজী হত না কিছুতেই। তাই তোমাকে একবার পেনাম করতে এসেছি! এই লাও! তোমার জন্য এনেছি!

— কি রে?

একমুখ হেসে ফুলের গোছাটা রামের হাতে দিয়ে বললে—ফুল! কি ফুল বল দেখি?

—তাইতো রে! কি ফুল? এ গাছ তো দেখি নাই গাঁয়ে কোথাও।

– এ কি এখানকার ফুল যে দেখবে? এ ফুল চাঁদ রাজার ভিটের, অনেক ওপরে একটা গাছ আছে, তারই ফুল। কি ফুল তা জানি না! তবে ভারি সুবাস আছে বাপু!

সাদা ফুলের গুচ্ছটা হাতে নিয়ে তার কথা শুনে রামের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল—বলিস কি রে? তুই চাঁদ রাজার ভিটের থেকে এনেছিস? সেখানে গেলি কোন সাহসে? কেন গেলি?

চরণ হাসতে লাগল। বললে—গেলাম! এই অমনি! তবে আমি কি আজ নতুন গেলাম নাকি?

—তার মানে আগে থেকেই যাস?

চরণ হাসতে হাসতে বললে—তা তোমাকে আজ বলতে কোনও মানা নাই। তোমরা বারণ করলে, আর কি করে গাঁয়ে রবিমানীর সঙ্গে দেখা করি! তাই দেখা করার জায়গা ছিল আমাদের চাঁদ রাজার ভিটে। এখানে তো আর কেউ যায় না ভয়ে।

রাম হেসে বললে—তুমি বেটা সাক্ষাৎ একটি লঙ্কা-পোড়া! মেয়েটাও তো খুব রে! খুব সাহস তো!

চরণ বললে—তা বটে। তা রায় কত্তা! একটা পাঁঠা তোমার গোয়ালে বেঁধে দিয়ে গেলাম। খেয়ো যেন! চন্দরকেও দিও। চললাম। দাও আর একবার পায়ের ধুলো দাও।

—আয়! সুখে-সচ্ছন্দে ঘরকন্না কর।

বোকার মত হাসতে লাগল চরণ! বললে—একবার চন্দরকে ডাক কেনে?

চন্দর আসতে সে তাকে কোলে নিয়ে বললে—বাবাকে পাঁঠা দিয়ে গেলাম। তুমিও খেয়োও যেন। আর একটু বড় হও। তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে চাঁদ রাজার ভিটে দেখিয়ে আনব। বুঝলে!

শান্ত পল্লীগ্রাম।

নিত্য নিয়মিত ও প্রত্যাশিত ঘটনা ছাড়া সেখানে অন্য কিছু ঘটে না। সেইখানে একদিন এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

একদিন সন্ধ্যার সময়। সেদিন আর দোকানে ভীড় নাই। কিশোরী পণ্ডিত বসে বসে সুর করে রামায়ণ পড়ছে, আর তার শ্রোতা একমাত্র রাম। চৌকো লণ্ঠনের একপাশে রাম, অন্য পাশে কিশোরী পণ্ডিত! বাকীটা সব অন্ধকার! ঘরের বাইরে অন্ধকার ঝিম ঝিম করছে।

হঠাৎ বাইরে রাস্তায় অন্ধকারের মধ্য থেকে কে ডেকে উঠল—জয় তারা! জয় ভবসুন্দরী! আনন্দ রহো বাবা!

কিশোরী পণ্ডিত আর রাম দুজনেই চমকে উঠল। এরকম ডাক তারা শোনেনি কোনদিন সন্ধ্যাজলে।

—কে? দুজনেই বলে উঠল একসঙ্গে।

—সন্ন্যাসী হ্যায় বাবা! জয় তারা ভবসুন্দবী।

রাস্তার অন্ধকার হতে একজন সন্ন্যাসী এসে বারান্দায় উঠে দাঁড়াল। ভারতবর্ষের চিরাচরিত সন্ন্যাসী। জটাজুটধারী, নগ্নদেহে বিভূতি-মাখা, পরণে কৌপীন, হাতে চিমটে কমণ্ডলু, কাঁধে ঝোলা! বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললে—সন্ন্যাসীকো ভোজন করাও বাবা!

রাম আর কিশোরী পণ্ডিত দুজনেই সসব্যস্ত হয়ে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল—আসুন বাবা! পায়ের ধুলো দিন।

ষাট বছর আগে বাংলার পল্লীগ্রামে সাধুর যে সমাদর ছিল তা কল্পনাতীত আজ। প্রায় দেব দর্শনের তৃপ্তি ছিল সন্ন্যাসী-সেবার মধ্যে।

সন্ন্যাসীকে দোকানের একপাশে আশ্রয় দিয়ে রাম আর কিশোরী পণ্ডিত লেগে গেল সন্ন্যাসীসেবায়।

সন্ন্যাসী অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গুছিয়ে আপনার কম্বলাসনে বসে আরাম করতে লাগলেন আর মিটমিট করে শ্রদ্ধাশীল ব্যস্ত সেবক দুটির সশ্রদ্ধ কর্ম্মব্যস্ততা লক্ষ্য করতে লাগলেন।

এক সময় সন্ন্যাসী রামকে হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলেন—এ আপনার ঘর?

হাত জোড় করে রাম বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু!

—আপনি কি জাতি?

—আজ্ঞে আমি ছত্রী।

—ছত্রী ? ক্ষত্রিয় ?

—আজ্ঞে।

আর উয়ো ?

—উনি ব্রাহ্মণ।

—আচ্ছা ! তিনি তৃপ্তিতে পাশ ফিরলেন। তারপর রামের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—আপনার কোন বংশ ? মহারাজা চন্দ্র রায়ের বংশ আপনি ?

প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না রাম। অবুঝের মত সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে সে শুধু প্রশ্ন করলে—আজ্ঞে ?

সন্ন্যাসী হাসলেন। কিশোরী পণ্ডিত জল ছিটিয়ে আসন বিছিয়ে সন্ন্যাসীর খাবার জায়গা করছিলেন, তিনি বললেন—আজ্ঞে না।

—ও। আচ্ছা ! বাকী আপ ? আপনি কি মন্ত্রী ব্রাহ্মণ বংশের ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

সন্ন্যাসী আর কোন কথা না বলে খেতে বসলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কোন্ ভোরে কিশোরী পণ্ডিত এসে হাজির ! কিশোরী পণ্ডিত দেখলে সন্ন্যাসী তার আগেই উঠেছে। কোন্ আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁর স্নান, বিভূতি-বিলেপন সব সমাপ্ত হয়েছে। কিশোরী পণ্ডিত আসতেই তার সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন সন্ন্যাসী।

রাম এসে প্রণাম করলে সন্ন্যাসী বললেন—বাবা, আনন্দ রহো। আমি বাবা এইবার ভবসুন্দরীর মন্দিরে থাকব। আমাকে সেখানে নিয়ে চল।

রাম হাত জোড় করে বললে—আমি কি অপরাধ করলাম প্রভু ?

—কুছ নেহি বেটা ! তুম্হারা কসুর কুছ নহি। আমি এসেছি এখানে ভবসুন্দরীর মন্দির আর লীলাক্ষেত্র দর্শন করতে। চলো বেটা, আমাকে লীলাক্ষেত্র দর্শন করাও।

সন্ন্যাসী সমস্ত গ্রাম ঘুরে এসে ভবসুন্দরীর মন্দিরে আস্তানা পাতলেন। চাঁদরাজার ভিটের কাছে শুকনো পরিখার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন—উয়ো ? উ কিয়া হ্যায় ?

—চাঁদ রাজার ভিটে।

সন্ন্যাসী থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন পাথরের মূর্ত্তির মত। তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। কিশোরী পণ্ডিত, এমনকি স্থূল চরিত্রের মানুষ রাম পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীর সে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করতে পারলে। সন্ন্যাসী পর মুহূর্ত্তেই ওদের মুখের দিকে

তাকিয়ে মাটিতে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করলেন। কপালে তাঁর ধুলো লেগেই রইল।

কিশোরী পণ্ডিত বললে—বাবা, কপাল থেকে ধুলোটা ঝাড়ুন।

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—বাবা, সিদ্ধ সাধকের সাধনপীঠকে প্রণাম করলাম। ঐখানে সাধনা করব বলেই তো এখানে এসেছি।

রাম আর কিশোরী পণ্ডিত দু'জনেই অবাক হয়ে গেল। কিশোরী পণ্ডিত বললেন—বলেন কি বাবা? ওখানে নেকড়ে বাঘ, বন-শুয়োর আছে, তাছাড়া সাপ আছে নানান ধরনের। ওখানে মানুষ কেন, জন্তু-জানোয়ার পর্য্যন্ত যায় না! গেলে আর ফিরে আসে না। ওখানে যাবেন কি?

সন্ন্যাসী হাসলেন। আর কিছু বললেন না। প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করে বললেন—ঐ পিছনেই তো বারুণী নদী?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—সিদ্ধপীঠ বাবা। এখানকার মৃত্তিকা স্পর্শ করলেই পুণ্য।

সন্ন্যাসী এসে ভবসুন্দরীর মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। সামনে ধুনি জ্বলে, সন্ন্যাসী বসে থাকেন চুপ করে। গ্রামের লোক আসে, দূর থেকে ঠাকরুণকে প্রণাম করে, সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে, আবার চলে যায়। সন্ধ্যার পর আর ভীড় থাকে না। তখন আসে রাম আর কিশোরী পণ্ডিত। সন্ন্যাসী গল্প বলেন, ওরা শোনে। একদিন সন্ন্যাসী বললেন—বাবা ভবসুন্দরীর কাহিনী জান? জান না, শোন!

আবার একদিন সন্ন্যাসী বললেন—বাবা, চন্দ্ররায় কোশল থেকে আসবার সময় গুরু তাঁকে কুড়িটি স্বুবর্ণ পেটিকায় সরস্বতীর পুষ্প আর নির্ম্মাল্য দিয়েছিলেন। সেই পুষ্প-নির্ম্মাল্য নিয়ে রাজা চন্দ্ররায় প্রাসাদের গুপ্তগৃহে সাধনপীঠ নির্ম্মাণ করেছিলেন। সেই পীঠে সাধনা করব বলে এসেছি।

কিশোরী পণ্ডিত একটু হেসে হাত জোড করে বললেন—বাবা, অপরাধ নেবেন না। সে পুষ্প আর নির্ম্মাল্য তো আর নাই! সে কবে গুরুর নির্দ্দেশে মনিমাণিক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল!

সন্ন্যাসী গল্প বলার সময় ইচ্ছা করেই বোধহয় এ অংশটা বলেননি। তিনি চকিত হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন সাপের দৃষ্টিতে। তারপর বললেন—তব তো তুম সব জানতা হ্যায় বেটা!

—না বাবা, কিছুই জানি না। মুখ্যু লোক, বাপঠাকুর্দ্দার মুখে যা শুনেছি! আচ্ছা আজ উঠি বাবা! চলরে রাম।

রাস্তায় যেতে যেতে রাম কিশোরীর হাত চেপে ধরলে।

আচমকা হাত ধরায় চমকে ওঠে কিশোরী বললে—আরে, আরে ছাড়। লাগে।

—লাগবে না? তুমি 'বাম্‌না' তো সোজা লোক নও। তুই সব জানিস মনে হল। তবে কি জানিস, কি বললি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

—বলব। তোকে সব বলব। কাল বলব। আজ থাক।

পরদিন ভোরবেলা ছুটতে ছুটতে এল কিশোরী রামের কাছে। হাঁপাতে হাঁপাতে।

—রামা, ভীষণ ব্যাপার রে! সন্ন্যাসীর ঝোলা, কমণ্ডলু পড়ে আছে, কিন্তু সন্ন্যাসী নাই।

—সে কি রে?

—সন্ন্যাসী নিশ্চয় চাঁদরাজার ভিটেতে ঢুকেছিল টাকার লোভে। আর ফেরে নাই।

রাম সব শুনে চুপ করে রইল। তাহলে লোভী সন্ন্যাসী সম্পদের সন্ধানে গিয়ে প্রাণান্ত হয়েছে। তার চিন্তার দিগন্তে একটা চিন্তা একবার এসে আবার মিলিয়ে গেল। মনে হল চরণের কথা। রাম বললে—সন্ন্যাসী যে চাঁদরাজার ভিটেতে গিয়েছিল কি করে জানলি?

কিশোরী চটে গেল, বললে—তুই যে উকিলের মত জেরা সুরু করলি? কি করে জানলাম? আমি কি আর সেই ভয়ঙ্কর জায়গায় গিয়ে দেখে এসেছি! আমার ধারণা!

রাম বুঝলে কথাটা। বললে—তা বটে! সেখানে না গেলে আর যাবেই বা কোথা? আর ওখানে গিয়ে খোঁজই বা কে করবে? দেখ এ বেলাটা দেখ। তারপর যা হয় হবে!

—কি হবে? কি করবি তুই?

—করবই বা কি? তার আবার একবার চরণের কথা মনে হল। ছোঁড়াটাকে বললে কেমন হয় দেখে আসতে! থাক বাবা, দরকার কি? বিধবার একমাত্র সন্তান, তার উপর সদ্য বিয়ে করেছে! খোঁজ করতে পাঠিয়ে যদি কোনও বিপদ হয় তখন আর আফশোষ রাখবার জায়গা থাকবে না। দরকার নাই।

বিকেল পেরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা হল, সন্ন্যাসীর কোন সন্ধান নাই। নিজের বাড়ীতে দোকান ঘরে চুপ করে বসে রইল দুজনে মুখোমুখি হয়ে। কেউ কোন

কথা বললে না। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য সম্ভাবনাপূর্ণ কাহিনী দুজনের মনেই আষাঢ়ের মেঘের মত ঘন হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে কিশোরী পণ্ডিত উঠল। রাম কি ভাবছিল, ভাবনার ফাঁকে ফাঁকেই বললে—উঠলি ?

—হ্যাঁ যাই। রাত তো হলো! কিশোরী চলে গেল।

রাম কোন কথা বললে না, বসে রইল চুপ করে। কিশোরী চলে যেতেই ঘরে এসে ঢুকল চরণ। সে যেন বাইরের অন্ধকারে কোথায় কোন বিস্ময়কর আকস্মিকের মত লুকিয়ে ছিল। রাম চমকে উঠল—কে ?

—আমি গো কত্তা। চরণ!

—চরণা ? আয়। বস।

চরণ ঘরের মধ্যে এসে বসল তার মুখের দিকে চেয়ে। চেয়েই রইল তার মুখের দিকে। চরণ তাকে গোপন কিছু বলবে বলে মনে হল তার। তার মনে হল সন্ন্যাসীর অন্তর্ধ্যানের সঙ্গে চরণের বক্তব্যের যেন কিছু যোগযোগ রয়েছে। সে গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিছু বলবি না কি রে চরণা ?

—হ্যাঁ গো কত্তা। তার লেগেই তো আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিশোরী ঠাকুর মশায় গেল, তবে এসে ঢুকলাম। ব্যাপার খুব খারাপ গো কত্তা!

—কি বল তো ?

—সন্ন্যাসীটার কি বরাত গো! কোথা থেকে এল এইখানে আমাদের গাঁয়ে মরবার জন্যে।

—তুই চাঁদ রাজার ভিটেতে গিয়েছিলি না কি ?

—হ্যাগো, সকাল বেলায় লোকে বলাবলি করছে শুনলাম—সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঝোলা পড়ে আছে, সন্ন্যাসী নাই। শুনে আমার মনে লাগল কথাটা। তাহলে বোধহয় রাত বিরেতে চাঁদ রাজার ভিটেতে গিয়েছে। তা আমি মাঠ থেকে এক ফাঁকে চলে গেলাম। আমি পুব দিকটায় যাই আমার জানা রাস্তা দিয়ে। আমি পশ্চিম দিকে যাই না। ওদিকে ওই খালটা আছে, খালটা সব সময় পাঁকে ভর্ত্তি, আর জঙ্গলও খুব। ভয়ে আমি যাই না বাপু! কেমন গা কাঁপে। যত জন্তু জানোয়ার, সাপ-খোপ আছে ওদিকেই। আর বাপু কে জানে, ভূত টুতও আছে বোধ হয়। মাঝে মাঝে কি রকম শব্দ হয়! আমি শুনেছি! তা পুব দিকে কোথাও কিছু পাত্তা পেলাম না। শেষে ভয়ে ভয়ে, অনেক সাহস করে, এগিয়ে গেলাম পশ্চিম দিকে খালের ধার বরাবর। খানিক দূর গিয়েই দেখলাম খালের ধারে ধারে পায়ের ছাপ কাদায় উপরে ভেতরের

দিকে এগিয়ে গিয়েছে। এগিয়ে গেলাম। দেখলাম এক জায়গায় একটা আধপোড়া কাঠ মাটিতে পড়ে আছে। বুঝলাম ধুনি থেকে হাত করে নিয়ে গিয়েছিল সন্ন্যাসী। আরও খানিকটা এগুলাম। দেখলাম চিমটে পড়ে আছে সেখানে। দেখে বাপু, খুব ভয় লাগল। আর এগুতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম। বুঝলাম সন্ন্যাসী আরও এগিয়ে ভেতরে গিয়েছে, আর বেরিয়ে আসতে পারে নাই। ভেতরেই থেকে গিয়েছে।

চরণ চুপ করলে। রামও সব শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিকটা স্তব্ধতা। তারপর চরণ বললে—সন্ন্যাসীর কি মরণদশা লেগেছিল যে ওখানে মরতে গেল! সন্ন্যাসী কেনে গিয়েছিল জান না কি কর্ত্তা?

রাম তবু চুপ করে রইল। চরণ আবার বললে—আমার কি মনে হল জান? সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই গিয়েছিল সোনা-রূপোর খোঁজে। আহা, বেচারা খোঁজও পেলে না, প্রাণটাও দিলে!

রাম ঘাড নেড়ে বললে—না রে, বোধহয় তার জন্যে নয়। ওর মতলব ছিল চাঁদ রাজার ভিটেতে তপস্যা করবার।

চরণ বললে—না কর্ত্তা, টাকার পিত্যেসে না হলে কি আর অমনি লুকিয়ে একা যায়। সন্ন্যাসী নিশ্চয় সোনা-রূপোর তিয়েসে গিয়েছিল!

কথাটা শুনে রামের বুকের মধ্যে বর্ষার মেঘের মত সেই আশ্চর্য্য সম্ভাব্যতা গুরু গুরু করে যেন ডেকে উঠল।

পরদিন সমস্ত দিন আপনার কাজ কর্ম্ম করলে, কিন্তু কথাটা মন থেকে মুছে গেল না, রয়েই গেল। সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত কিশোরী পণ্ডিত আসতেই সে বললে—আচ্ছা, কিশোরী, তুই থাকতে কি আমার ছেলে আমারই মত 'মুখ্যু' হয়ে থাকবে?

—আমি কি করব বল।

—আমার ছেলেটাকে খানিক আধেক লেখাপড়া শিখিয়ে দে!

—তা আর কঠিন কাজ কি? পড়াব চন্দরকে।

—দাঁড়া, নিয়ে আসি চন্দরকে। বলে উঠে গিয়ে চন্দরকে নিয়ে এল বাড়ীর ভিতর থেকে।

—একি ঘুমথেকে তুলে নিয়ে এলি তাই বলে! তোর ঐ স্বভাব আর গেল না। উঠল বাই তো মক্কা যাই!

রাম ছেলেকে বললে—পেণাম কর চন্দ কিশোরীকে। কাল থেকে পড়বি কিশোরীর কাছে।

কিশোরী হাসতে লাগল, বললে—তুই একটা আস্ত পাগল রাম। পড়াব। কিন্তু তার আগে একটা ভাল দিন দেখাতে হবে। তুই যেদিন বাজারে যাবি ওর বই শেলেট আনবি। তারপর হবে। যাও চন্দ, শোও গিয়ে বাবা!

চন্দ চলে যেতে কিশোরী বললে—আজই তোর ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার কথা মনে হল কেন রে রাম?

কিশোরী রামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। রাম যেন ধরা-পড়া মানুষের মত তার চোখে একবার চোখ রেখে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

কিশোরী বললে—ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার কথা মনে হল গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে? তুই একটা পাগল বুঝলি! বলে হাসতে লাগল কিশোরী। হাসি থামিয়ে বললে—লেখাপড়া আমি শেখাব চন্দকে। এমন কি সংস্কৃতও শেখাব। সব শেখাব ওকে।

একটু চুপ করল কিশোরী। তারপর আবার বললে—তোর বোধহয় ধারণা আমি গুপ্তধনের সন্ধান জানি! কিন্তু তোকে সত্যি বলছি—আমি জানিনা রে। যদি জানতাম তোকে নিশ্চয় বলতাম। কারণ একটা কথা ভাল করে জানি যে এখানে বাস করে আমার পক্ষে তোকে না বলে ও ধনের সন্ধান আমার করা হবে না। কথাটা আমার মনেও হয় নাই কোন দিন। এই বেটা সন্ন্যাসীর কথা শুনে প্রথম মনে হয়েছিল। তারপর কাল সন্ন্যাসীর ওখানে যাওয়া থেকে কথাটা বেশী করে মনে হচ্ছে। আমি আজ সারাদিন কি করেছি জানিস? কথাটা মনে হতেই সিন্ধুক থেকে যত পুরানো পুঁথি ছিল সব বের করেছি। ওর মধ্যে যদি কিছুর সন্ধান মেলে! এখন সব পুঁথি পড়ে দেখতে হবে যদি কিছু পাওয়া যায়! পেলে তোর সঙ্গে পরামর্শ করে যা হয় করব। তোকে ভাগ না দিয়ে কি কিছু ভোগ করা যায় রে। অন্তত আমি পারব না আর যেই পারুক।

রাম বললে—তুই আচ্ছা করে পড় পুঁথিগুলো, বুঝলি। নিশ্চয় কোথাও কিছু সুলুক-সন্ধান আছে!

রামের মুখের দিকে ভাল করে তাকালে কিশোরী। আশ্চর্য্য রামের চোখে রাগের আগুন ছাড়া আর কোন আগুন কোন দিন দেখে নাই কিশোরী। আজ রামের চোখে নতুন আগুন জ্বলেছে। লোভের আগুন।

আজ কাল সন্ধ্যার আড্ডাটার জায়গা বদল হয়েছে। চেহারাও বদল হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

সকাল বেলা চন্দর বই শেলেট আর তারি তালপাতার পুঁথি নিয়ে কিশোরী পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে পড়ে আসে। ভোরেই স্নান সেরে নিয়ে প্রাতঃ সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা শেষ করে পুঁথি নিয়ে বসে সে। নিজে পুঁথি পড়ে আর সঙ্গে চন্দরকে পড়িয়ে যায়। খানিকটা বেলা পর্য্যন্ত পড়ে এবং পড়িয়ে চন্দরকে সে ছুটি দিয়ে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বেরিয়ে পড়ে ফুলের সাজি আর কমণ্ডলু নিয়ে। ভবসুন্দরীর পূজা সেরে এসে আবার পুঁথি নিয়ে বসে। পুঁথির নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে।

বেশ কিছু নিষ্কর ব্রহ্মত্র সে পেয়েছে পুরুষানুক্রমে। সেগুলির ব্যবস্থা রামই করে দিয়ে থাকে। তার জমির দেখাশোনা করে সে-ই। জমির বিলি-বন্দোবস্ত থেকে আরম্ভ করে, শস্যবপন থেকে গোলায় তোলা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা রামেরই, তাকে কোন চিন্তা করতে হয় না। সে পুজো-অর্চ্চনা নিয়েই থাকত এতদিন। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুঁথি ঘাঁটা।

কত পুরুষের পুঁথি কে জানে! বোধহয় সেই মহাভারতের কাল থেকেই। কৌলিক শিক্ষা হিসাবে সংস্কৃত তাকে তার পরলোকগত পিতা ভাল করেই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। তার বেশী চর্চ্চা সে করে নাই। করার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। এতদিন পর্য্যন্ত বড বড় কাঠের সিন্ধুকে রাশিকৃত পুঁথি জমা করা আছে সেই টুকুই কেবল সে জানত। স্নান করে পুজো করতে যাবার পূর্ব্বে একটা ফুল আর একটা করে বেলপাতা তিন চারটে সিন্ধুকের মাথায় ছড়িয়ে দিয়ে সে ভবসুন্দরীর পুজো করতে বেরুত।

আজ কাল সে পড়েছে পুঁথি নিয়ে। পুঁথি বের করে, ধুলো ঝেড়ে হাত ধুয়ে এসে পুঁথির বাঁধন খুলে পুঁথির পাতা উল্‌টোতে আরম্ভ করে। ভাল লাগলে পুঁথির পাতা উল্টে উল্টে পুঁথিখানা পড়া শেষ করে। ভাল না লাগলে দু একটা পাতা উল্‌টে আবার পুঁথি বন্ধ করে বেঁধে রেখে দেয়।

সন্ধ্যার সময় রাম গিয়ে বসে তার কাছে। রামায়ণ পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে আসে এক উদ্দেশ্য নিয়ে। এসে বসেই হুকোতে কল্কে বসিয়ে টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করে—কি, কিছু পেলি আজ?

ফর্সা রঙে কৌতুকের লাল ছোপ লাগে, টিকালো নাকের পাশে ছোট ছোট চোখ দুটি কৌতুকে উজ্জল হয়ে উঠে আরও ছোট হয়ে আসে। সে নিঃশব্দে হেসে নেয় কিছুক্ষণ। তারপর বলে—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ ক্ষণং তিষ্ঠ বৎস।

রাম রেগে যায়, বলে—তোর ঐ ইকড়ি মিকড়ি আমি বুঝি না, বুঝলি। সোজা করে বল কিছু পেয়েছিস কিনা!

কোন কোন দিন কিশোরী হেসেই চলে, কোন দিন তার হাত থেকে কলকেটা নিয়ে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হেসেই চলে, কোন দিন তাকে শান্ত করবার জন্যে বলে—আরে ধৈর্য্য ধর, অত তাড়াতাড়ি করলে কি চলে?

কোন কোন দিন বেশ চটে ওঠে, বলে দেখ রামা, যদি একদিনেই একখানা পুঁথি খুলে সব পেয়ে যাই তবে বড় ভাল হয়, তা আমি বুঝি! তবে একটা কথা কি জানিস? যদি এমনি করেই পাওয়া যায় কোন দিন সেই গুপ্তধনের হদিশ তবে জেনে রাখিস সে আর তোর আমার কারো ভোগে নাই। সে কবে অন্য কে হাতিয়ে সরিয়ে নিয়েছে। তোর কি ধারণা যে কেউ আমরা ভোগ করব বলে, পরিস্কার করে লিখে রেখে যাবে—বৎস অমুক স্থানে অনেক মণিমাণিক্য পুঁতে রেখেছি, তোমরা আইস, তুলিয়া লইয়া যাও। তা কেউ করে যাবে না বুঝলি। খুঁজে দেখতে হবে। তাতেও যে পাবই এমন কথা নাই। একটা হদিশ পেতেও পারি নাও পেতে পারি।

খানিকটা থেমে গলা নরম করে বলে—তুই বুঝিস না ঠিক ব্যাপারটা! আমার বাপ-পিতামহ তো কেউ গুপ্তধনের পূজো করত না। পূজো করেছে ভবসুন্দরীর। এখন রাজা-জমিদারদের সম্পত্তির খবর তো তারা নাও জানতে পারে, আর জেনে শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ তারা, তারা নাও লিখে রেখে যেতে পারে। এমন তো হতে পারে এ কথা তারা ইচ্ছা করেই লিখে রাখেনি পাছে তাঁদের বংশের কেউ এ ধন সন্ধান করে।

রাম রাগ করে উঠে চলে যায়, আর আসে না তিন চার দিন। কিশোরী জানে তিন দিন কি চার দিনের মাথায় রামের এ রাগ আর থাকবে না। রাগ পড়ে যাবে, তা ছাড়া যে লোভের আগুন তার মধ্যে এই দীর্ঘদিন অনির্ব্বান জ্বলছে তার দাহতেই সে আবার তার কাছে ছুটে আসবে। এ থেকে রামের পরিত্রাণ নাই।

কিশোরীর অনুমান মিথ্যা হয় না। রাম একদিন এসে আবার সন্ধ্যার সময় তার বাইরের ঘরের দরজায় দাঁড়ায়, ডাকে—কি রে, কিশোরী, আছিস না কি?

কিশোরী আপ্যায়ণ করে ডেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, ডাকে—আয়, আয়, তামাক খা! তামাক সেজে রেখেছি!

—তুই বুঝি জানতিস আমি আসব?

ভাল মানুষের মত কিশোরী বলে—না, তা জানব কি করে? তবে কথা

কি, ভাবতে তো ভাল লাগে তোর রাগ পড়েছে, আসবি তুই এক মুখ হাসি নিয়ে।

এক মুখ হেসে কলকেটা হুঁকোর মাথায় চাপিয়ে রাম বলে—বাম্না, তুমি সোজা লোক নও বাবা? তোমার পেটে পেটে অনেক বিদ্যে! নাও বস এবার! খবর কি বল!

একান্ত ভাল মানুষের অভিনয়টাকে টেনে চলে কিশোরী, আশ্চর্য্যের মত প্রশ্ন করে— খবর, কিসের খবর জিজ্ঞাসা করছিস?

রাম চটে যায়, বলে—ওঃ, বেজাই যে ভাল মানুষ সাজছিস লাগছে! আরে বাবা, কিছু গুলুক সন্ধান পেলি টেলি?

—নাঃ, তুই যাবার পর থেকে আমি তো আর খোঁজ খবর করিনি। কি জন্যে করব? তোর নেশাতেই আমার যা কিছু পড়াশুনো ঐ জন্যে! তা তুই রাগ করে চলে গেলি, আমি আর বেকার পুঁথি খুঁজে কি করব?

—পুঁথি খুঁজে কি করবি? ভাল! তবে পড়ছিলি কি? ঐ তো পুঁথি খোলা পড়ে আছে। কি ওটা? হাসে কিশোরী, বলে—তোর ধারণা এই সব পুঁথি আজ বিশ ত্রিশ পুরুষ ধরে আমার বাপ-ঠাকুর্দ্দারা যা লিখে গিয়েছে সব ঐ রাজা রাজড়ার কথা? তুই একটা আস্ত হাঁদা, বুঝলি!

—তবে ওটা পড়ছিলি কি?

—কি পড়ছিলাম? পড়ছিলাম বেদান্তের পুঁথি।

—সে কি?

—সে তুই বুঝবি না। তোর বুঝেও কাজ নাই।

—আমি চাই না বুঝতে। কিন্তু তুই এমন করে গা এলে দিলে কি করে চলে বলত?

একটু হাসল কিশোরী। কিছু বললে না। কিছুক্ষণ পর সে ছোট্ট করে বললে—তুই যখন চাইছিস তখন নিশ্চয় খুঁজব।

এমনি কাটল পাঁচ বছর। রামের প্রতি সন্ধ্যায় প্রশ্ন করাটা এখন একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। সে আসলে আর গুপ্তধনের আশা করে না। তবে আগুনটা নিভে যায়নি, আগুনের উপর হতাশার এক পুরু ছাই পড়েছে।

এমনি সময় একদিন। সে মাঠে চাষ করছে, কিশোরী পণ্ডিত ছুটতে ছুটতে হাজির হল তার কাছে। আলের মাথায় দাঁড়িয়ে কিশোরী ডাকছে—এই রামা, ছুটে আয়!

ব্যাপারটা রাম অনুমানও করতে পারেনি। সে হাল-গরু ছেড়ে দিয়ে

খানিকটা ভয়ার্ত্ত হয়ে উঠে এল কোন দুর্ঘটনা আশঙ্কা করে। ভয়ার্ত্ত মুখে প্রশ্ন করলে—কি হল রে?

—আয়, উঠে আয় আমার সঙ্গে।

—একটু দাঁড়া, হাল রেখে গরু দুটো খুলে বেঁধে দিয়ে যাই।

—থাকুক সব পড়ে যেমন আছে। তুই আয় আগে।

বাড়ী এসে ঘরের দরজা বন্ধ করে কিশোরী বললে—এতদিন যা খুঁজছিলাম আজ পেয়েছি!

রাম যেন বিশ্বাস করতে পারলে না, যন্ত্রের মত প্রশ্ন করলে—কি পেয়েছিস?

—বস, বলি। এই যে পুঁথিটা এতে রাজবংশের সমস্ত কাহিনী বলা আছে। এরই এক জায়গায় সংস্কৃতে পদ্য করে লেখা আছে, তোকে বাংলা করে বলছি শোন। "চন্দ্ররায় প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের ধনের তুলনা নাই। দেবতার অনুগ্রহে ও গুরুর আশীর্ব্বাদে সরস্বতীর স্বর্ণপেটিকাবদ্ধ পুষ্প ও নির্ম্মাল্য একদা মনিমাণিক্যে রূপান্তরিত হইয়াছিল। সে ধনের সামান্য অংশই দুইবার প্রাসাদ নির্ম্মাণে ব্যয় হইয়াছিল। সেই সঞ্চিত অর্থ ন্যায়-অন্যায় দ্বিবিধ পন্থাতেই বহুগুণ স্ফীত হইয়াছে। দেশে মাৎস্যন্যায় ও বহিরাগত দস্যুর উপদ্রবে চিন্তিত রাজা হরিরায় এক বিচিত্র গোপন ধনাগার নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার উর্দ্ধাংশে পর্ব্বত ও নিম্নদেশে আসব-পরিপূর্ণ পরিখা। রাজার গোপন মন্ত্রণা-কক্ষের তলদেশে তাহার প্রবেশ পথ। যে তক্ষণদ্বয় এই বিচিত্র কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিল রাজাদেশে গোপনে ঐ কক্ষে হত যক্ষস্বরূপ তাহারা সেই কুবেরের সম্পদ রক্ষা করিতেছে।" বুঝলি কি ব্যাপার?

বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল রাম।

কিশোরী হেসে বললে—বুঝলি না তো? মোদ্দা কথা হল, প্রথমতঃ এখনও অনেক টাকা ঐ ভিটেতে আছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে আছে সেখানে উপরে পাহাড় নীচে মদের খাল। মদের খাল কি? বারুণী মানে মদ রে বোকা। বারুণীর জল। এইতো পেয়ে গেলি এবার।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে অবস্থাটা পরিপাক করলে রাম। তারপর বললে—এইবার কি করি বল?

কিশোরী হাসল, বললে—আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিস না। যা করবি এবার নিজে কর।

অবাক হয়ে গেল রাম—কেন?

কিশোরী হেসে বললে—ও টাকায় আমার দরকার নাই ভাই। আমি গরীব ব্রাহ্মণ! আমার ঐ একটা ছেলে, এক বছরের। যা সামান্য জমি-জমা আছে তাতেই ওর চলে যাবে। ও গুপ্তধন তুই নে গিয়ে! আমাকে কি করব জিজ্ঞাসা করলি তাই বলছি—ওর জন্যে তুইও হাত বাড়াস না। কি হবে কে জানে? তোর তো অনেক আছে!

রামের মস্তিষ্কে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে জিজ্ঞাসা করলে—সত্যিই তোর ভাগ চাই না?

কিশোরী হেসে বললে—না ভাই, ও তুই নে গিয়ে! তুই আমার একটা উপকার করেছিস। আমি জীবনে লেখাপড়া করি নাই। তোর দৌলতে লেখাপড়া করলাম পাঁচ বছর প্রাণভরে। তাতে বুঝলাম—টাকা কড়ি বেশী পেয়ে লাভ নাই। দরকারও নাই কিছুর। তুই সব নে গিয়ে!

রাম আর কথা বাড়ালো না। নেবে, সে সব নেবে! কাউকে সে দেবে না কিছু! সব তার! তার পা টলছে, মাথা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে, তেষ্টায় মুখ থেকে গলা পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। বুকের ভিতর আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। সব, স-ব তার চাই!

পাঁচ বছর আগে যেদিন প্রথম আগুন জ্বলেছিল রামের বুকে সেদিন না বুঝলেও পরে মধ্যে মধ্যে মনে হত এ লোভ তার ভাল নয়, এ লোভ তার ক্ষতি করছে। তার শান্তি নষ্ট হচ্ছে। সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। নিজের চাষ-বাস, কাজ-কর্ম্মে মন দিয়েছে বেশী করে। আরও খেটে চাষ করেছে। জমি জেরাত দেখে শুনে, পতিত জমি কিনে জমি কাটিয়ে জমির পরিমাণ অল্প সময়ে বেশী বাড়িয়েছে। জমির পরিমাণ এখন তার অনেক। একশো বিঘার উপর। আরও একটা কাজ সে করেছে অতি সংগোপনে। নগদ টাকা জমিয়েছে বেশ কিছু। কোথায় মাটির নীচে পুঁতে রেখেছে সে-ই জানে।

এমনি করে ঘর সংসার নিয়ে কিছুদিন ব্যস্ত অন্যমনস্ক থাকতে থাকতে হঠাৎ আবার একদিন মনটা হু-হু করে উঠত। মনে হত হাতের কাছে এইরকম একটা রাজার সম্পদ থাকতে সে সেটা উদ্ধারের কোন চেষ্টা করলে না! এই সামান্য ক'বিঘে জমি নিয়ে মেতে থেকে সে একটা ভীষণ বোকামি করছে। মনের হায় হায় ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গিয়ে আবার লোভের আগুন জ্বলে উঠত দাউ দাউ করে।

এইসব হিসেব করেই সে অনেকদিন আগে চরণকে চাষের কাজে নিযুক্ত করেছে। সে যখন এই আগুনের দাহে পুড়তে পুড়তে নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থাকে তখন কোন কোন দিন শুনতে পায় বেশ উচ্চকণ্ঠে গান করতে করতে চরণ গরুগুলো নিয়ে বাড়ী ঢুকছে। তার এক একদিন আশ্চর্য্য লাগে। ছোঁড়া তো ঐ ভয়াল জায়গায় স্বচ্ছন্দে যায়! গুপ্ত অর্থের কথা ছোঁড়াও তো জানে! কিন্তু আশ্চর্য্য, ছোঁড়ার মনে সেটার কথা আসে না একবারও! ছোঁড়ার ফূর্ত্তির শেষ নাই আজকাল। কিছুদিন হল চরণ ছেলের বাপ হয়েছে। ক' মাসের ছেলেটাকে নিয়ে ওর বউ এ বাড়ীতে আসে কাজ করতে। তার মুখে চোখেও কি সুখের ছাপ! অথচ তারা তো তার উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে আছে।

সেদিন কিশোরীর বাড়ী থেকে ফিরে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। হাল-গরু যে মাঠেই পড়ে আছে সে কথাটা সে ভুলেই গিয়েছে একেবারে। বাড়ী এসে গম্ভীর ভাবে স্ত্রীকে বললে—এক ঘটি জল দাও তো!

পদ্ম অত্যন্ত মন্থরভাবে তার জন্যে জল নিয়ে এল। সে ঢক ঢক করে অনেকখানি জল খেয়ে মাথায় মুখে দিয়ে চুপ করে বসল। পদ্ম কাছে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তার মুখ চোখে অতি কঠিন যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছে। কিছুদিন থেকেই তার শরীর খারাপ যাচ্ছে এ সংবাদ রাম জানে। তার মুখের যন্ত্রনার চিহ্ন দেখে স্বামী তাকে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করবে এই প্রত্যাশাই করে ছিল পদ্ম। কিন্তু স্বামী কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না দেখে সে উপযাচিকা হয়ে স্বামীকে বললে—আবার বড বুক ধডফড করছে গো! একবার কবরেজকে ডাকলে ভাল হত।

রাম কথাগুলোর ধ্বনিটাই বোধহয় শুনেছিল, কথাগুলো শোনে নাই। সে অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিলে—উঃ! যেন কোন্ গভীর স্বপ্ন থেকে অর্দ্ধজাগ্রত হয়ে সে জবাব দিলে।

তার অত্যন্ত ক্লেশের মধ্যেও স্বামীর অন্যমনস্কতা দেখে সে একটু হাসল। মানুষটা অমনিই! আধপাগলা গোছের। নিজের জমি-জমার ভাবনা ছাডা আর কিছুর খেয়াল রাখে না। সে জিজ্ঞাসা করলে—এই শুনছ, কি হল কি তোমার?

রাম যেন এইবার জেগে উঠল, প্রায় খেঁকিয়ে জবাব দিলে—কি বলছিস কি?

পদ্ম অত্যন্ত আহত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর

কাতরভাবে বললে—আমার বুকের সেই যন্ত্রণাটা বড্ড বেড়েছে। একবার, কবরেজকে ডাকতে পাঠাও কেনে?

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে রাম বললে—'বেথা' বেড়েছে তো আমি কি করব? ছোঁড়া রাখালটাকে পাঠা কবরেজের কাছে। বলে আর কোন কথা না বাড়িয়ে সে চলে গেল সেখান থেকে। গিয়ে বাইরের দোকান ঘরে বসে রইল গুম হয়ে। যা জানার তা সব সে জেনেছে। এখন এগুবে কি করে? বসে বসে সেই কথাই সে ভাবতে লাগল। স্ত্রীর অসুখের কথাটা মনেই রইল না।

সেদিন খানিকটা বেলা থাকতেই সামনের রাস্তায় চরণের গান শোনা গেল। হাল-গরু নিয়ে ফিরছে চরণ। কিন্তু চরণ কথা বলছে কার সঙ্গে?

—হা গো, মুনিব কোথা?

—বাবা? বাবা ঐ তো দোকান-ঘরে আছে বোধ হয়।

—ও, তাহলে চন্দরের সঙ্গে কথা বলছে চরণ।

—তুমি গিয়েছিলে কোথা? পায়ে এক পা ধুলো? পডগা যাও। চরণ বলছে চন্দরকে গম্ভীরভাবে।

খিলখিল করে হেসে চন্দর বললে—ওরে বাবা, আমার গুরু কিশোরী পণ্ডিত-মশায় হলি যে তুই! গিয়েছিলাম কবরেজকে ডাকতে।

—কেনে? মুনিব্যাণের সেই 'বেথা' আবার বেড়েছে নাকি?

এই সময় সে ডেকে উঠল—চরণা!

—যাই গো, গরু বেঁধে পা ধুয়ে আসি।

একটু পরেই হাত-পা মুখ ধুয়ে হাতের জল ঝাড়তে ঝাড়তে চরণ এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর থেকেই রাম গম্ভীরভাবে তাকে ডাকলে—আয়, ঘরের ভেতর আয়।

সে ঘরে ঢুকতেই তেমনিভাবেই বললে—দরজা বন্ধ করে দে। বস।

দরজা বন্ধ করে সে সন্ত্রস্তভাবে মুনিবের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

রাম বললে—আগে ঠাকরুণের নামে প্রতিজ্ঞা কর তোকে আজ আমি যা বলব তা কখনও কাউকে বলবি না! কাউকেও না।

চরণ অবাক হয়ে মুনিবের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—বল।

কেমন অভিভূত ভয়ার্ত্তের মত কাঁপা কাঁপা গলায় প্রতিজ্ঞা করলে চরণ—ঠাকরুণের নামে পিতিজ্ঞে করছি তুমি যা বলবে কাউকে বলব না।

—বস। এইবার শোন। তাকে আস্তে আস্তে সমস্ত কথা বলে রাম

বললে—ঐখানে গিয়ে আগে তোকে জায়গাটা 'চিহ্নত্' (চিহ্নিত) করে আসতে হবে। রাস্তাটা বুঝে তারপর আমি তোর সঙ্গে যাব।

চরণের মুখটা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—উ-কাজ আমি পারব না কত্তা। তুমি আমার ওপর রাগ ক'রো না। ওখানে নেকড়ে বাঘ আছে, পাহাড়ে চিতি আছে, তা ছাড়া ভূত-পেরেত-পিশাচের আড্ডা।

—তোর কোন ভয় নাই। তুই কেবল আমি যেমন বলব তেমনি জায়গা চিহ্নত্ করে আসবি! আমি তোকে পাঁচ বিঘে জমি দোব।

—আমার ভয় লাগছে কত্তা। আমি গেলে মরে যাব। মরে গেলে জমি নিয়ে কি করব? আর তাছাড়া উ ঠাকুর-দেবতা যখের টাকা।

—তোকে ঐ নদীর ধারের যে ছ'বিঘে বাকুরীটা আছে সেটা দোব। তোর ঋণের যত তোকে ফেরৎ দোব।

—আমি হাত জোড করছি। আমাকে ছাড়ান দাও কত্তা।

রাম পাগল হয়ে গিয়েছে যেন। সে জোর করে বললে—তোকে পারতেই হবে। নইলে সেই সন্ন্যাসীকে মেরেছিলি বলে তোর নামে আমি মিথ্যে এজাহার করে তোকে জেলে পুরে দোব।

চরণ মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

রাম বুঝলে লোভে না হোক, ভয়ে রাজী হয়েছে ছোঁড়া। সে এবার নরম হয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—তোর কোন ভাবনা নাই। আমি থাকব তোর সঙ্গে। তুই ভেতরে যাবি। আমি বাইরে বারুণীর ধারে খালের কাছে থাকব। ক'দিন বাদে একদিন রাত্রিতে যাব আমরা। যা বাড়ী যা।

দরজা খুলে দিলে রাম। দরজা খুলতেই দেখলে চন্দর দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। সে অকস্মাৎ ছেলের গালে এক চড় মেরে ধমক দিয়ে বললে—এখানে কি করছিলি রে হারামজাদা? কি শুনছিলি? এ্যাঁ?

আকস্মিক প্রহারে ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে এগারো বছরের চন্দর। বললে, যেন জেদের সঙ্গেই বললে—আমি কিছুই শুনি নাই। মায়ের অসুখ বেড়েছে। ছটফট করছে, কাতরাচ্ছে যাতনায়। তাই তোমাকে বলতে এসেছিলাম।

চেঁচিয়ে উঠল রাম—তার আমি কি করব রে হারামজাদা? আমি কি কবরেজ না বদ্যি?

তারপর সে চেঁচিয়ে ডাকলে—এই চরণ, শোন।

রাস্তা থেকে মাথা হেঁট করে ফিরে এল চরণ। এসে নীরবেই দাঁড়াল রামের কাছে। নিজের ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বের করে তার হাতে দিয়ে বললে—যা, নিয়ে যা! আরে, তুই কাঁদছিস না কি। বেটা ছেলেতে কাঁদে কি রে?

চরণ লজ্জিত হয়ে চোখের জল মুছে হাত পেতে নিলে টাকাটা। ট্যাঁকে গুজে চন্দরকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে—চল, কবরেজকে ডেকে নিয়ে আসি।

রাস্তায় চরণের কাঁধের উপর চেপে যেতে যেতে চন্দর জিজ্ঞাসা করলে—কাঁদছিলি কেন রে চরণা?

—কাঁদব কেন? তুমি ক্ষেপা ছেলে! তবে খুব দুখ লাগছে মনে!

—কেন?

—কাউকে বলো না। তোমার বাবার ঘাড়ে ঠাকরুণ ভর করেছে। রেগে ভর করেছে! আর কোনও কথা কিছুতেই বললে না চরণ।

চন্দর অসহায়ের মত বললে—তা হলে কি হবে চরণা?

অত্যন্ত হতাশ হয়ে চরণ বললে—কি হবে কে জানে? কিছু 'খ্যানত' হয়ে যাবে!

তার মাসখানেকের মধ্যে চরণের কথা ফলে গেল। পর পর দু' দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেল সন্ধ্যাজলে। রামের স্ত্রী, চন্দরের মা পদ্ম সেই বুকের যাতনায় ধড়ফড় করে মারা গেল। তার ক'দিন পরেই একদিন সকালে গ্রামে খবর রটে গেল চাঁদরাজার ভিটের সীমানায় শুকনো খালের ধারে মাটির উপর উবুড় হয়ে মরে পড়ে আছে চরণ!

খবর পেয়েই অন্য অনেকের সঙ্গে সেখানে ছুটে গিয়েছিল চন্দর। দেখলে শূরবীরের মত হাত পা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছে চরণ। দেখে সুগভীর ব্যথায় ও দুঃখে তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। সে কেঁদে উঠল হা-হা করে। ক'দিন আগেই মা মারা গিয়াছে। সে ব্যথাও যেন একসঙ্গে মর্ম্মভেদী হয়ে বেরিয়ে এল।

সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে পালিয়ে এল বাড়ী। বাড়ীতে কেউ নাই। বাড়ী শূন্য। মা নাই। বাবা দোকান ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে আছে। সে নিদারুণ বেদনায় সান্ত্বনাহীন হয়ে বাড়ীর ভিতরে দাওয়ায় বসে কাঁদতে লাগল ফুলে ফুলে।

এগারো বছরের ছেলেটার কি দুর্দ্দশা! অশৌচ চলছে। গলায় কাছা

বাঁধা, পরনে কোড়া কাপড়, গায়ে মাথায় তেল নাই। মা মরার সঙ্গে সঙ্গে যেন বাপকেও হারিয়েছে ছেলেটা। রাম ঘরের মধ্যে অবিরাম চুপ করে বসে থাকে। এক আধবার বের হয়। হলেও কারও সঙ্গে, এমন কি মা-মরা ছেলেটার সঙ্গেও কথা বলে না।

কিশোরী পণ্ডিত ভবসুন্দরীর পুজো সেরে একবার আসেন, চন্দরকে সঙ্গে করে নিয়ে যান নিজের বাড়ী। নিজের কাছে খানিকক্ষণ বসিয়ে রাখেন। তারপর তাঁর স্ত্রী চন্দরকে নিয়ে যান রামের বাড়ী আপনার এক বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে। সেখানে তার কাছে বসে হবিষ্যান্ন রান্নাটা দেখিয়ে দেন, খানিকটা সাহায্যও করেন। তার খাওয়া হলে চন্দর হবিষান্নের পাত্রটা নিয়ে চাঁদাদিঘীর ঘাটে ডুবিয়ে দিতে যায়, পণ্ডিত গৃহিণী ছেলেকে নিয়ে বাড়ী চলে যান।

সেদিনও চন্দর হবিষ্যান্নের পাত্রটা দিঘীর জলে ডুবিয়ে দিয়ে এসে ভবসুন্দরীর মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসল। পড়ন্ত মধ্যাহ্নের রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে। দিঘীর জল সূর্য্যের আলোর ছটায় একখানা ঝকঝকে আয়নার মত ছটা দিচ্ছে। কোথাও কোন লোক জন নাই। মন্দিরের পাশে মস্ত বড় চাঁপা আর নাগ-কেশর গাছের মধ্যে কেবল একটা আধটা পাখী ঘন থেকে ঘনতর ছায়ার সন্ধানে লাফ দিয়ে ঘুরছে। চন্দর মন্দিরের সিঁড়িতে বসে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়েছিল। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনটা কেমন হু হু করে উঠল। মাকে পড়ে গেল তার। একবার অস্ফুট স্বরে মাকে স্মরণ করে বললে—মা, মাগো! তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রেখে কেঁদে মুখখানা তুলতেই তার নজরে পড়ল দিঘীর জলে স্নান করে একটি তরুণী মেয়ে উঠে আসছে। তার চুল থেকে, কাপড় থেকে জল ঝরে পড়ছে। আর তার পিছন পিছন আসছে একটি প্রৌঢ়া, তার কোলে একটি শিশু। চন্দরের বুকটা অকারণে কেঁপে উঠল। চরণের স্ত্রী উঠে আসছে ভিজে কাপড়ে, আর তার পিছনে চরণের মা চরণের ছেলেকে কোলে নিয়ে।

মেয়েটি এসে মন্দিরের চত্বরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে—মা, তুমি সব দেখেছ মা। যে আমার স্বামীকে মেরেছে তার বিচার তুমি ক'রো। মা, মাগো!

মেয়েটি চলে যাবার জন্যে ফিরতেই তার নজর পড়ে গেল চন্দরের উপর। অকস্মাৎ যেন পাগল হয়ে গেল মেয়েটি। তাকে সামনে দেখেই জলন্ত চোখে

তার দিকে তাকিয়ে তর্জ্জনী আস্ফালন করে সে বললে—কেমন হয়েছে তো? মা হাতে হাতে ফল দিয়েছে তো? কেমন, লিবি পোঁতা সোনা-রূপো? দেবতার ধনে হাত বাড়াবার ফল পেলি তো? নিরীহ লোককে মরনের মুখে ঠেলে দেওয়ার ফল পেলি তো? এখন হয়েছি কি? এই তো কলির সবে সন্ধ্যে! এর পর বাপ যাবে। তাপর তুই যাবি। এই রোপবাসী (উপবাসী) থেকে শাপ দিয়ে গেলাম।

প্রৌঢ়াটি এসে উন্মাদিনীর হাত চেপে ধরলে—আঃ কাকে কি বলছিস বউ? ও ছোট ছেলে, ও কি করবে? ওকে শাপমন্যি করছিস কেনে?

যেতে যেতে মেয়েটি বললে—ছোট ছেলে? ও কি করবে? সব সমান। কেউটের ঝাড! সমান বিষ! আমি বলছি—সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে, সব্বনাশ হবে।

দারুণ মর্ম্মযাতনায় হু হু করে কেঁদে চলল চন্দর। এ মর্ম্মপীডায় সান্ত্বনা দেবার, চোখের জল মুছিয়ে দেবার কেউ নাই। অনেকক্ষণ কেঁদে সে একটা সিঁডিতে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়াল ছিল না!

হঠাৎ তার মনে হল কে অতি নরম ঠাণ্ডা হাতে তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! অর্দ্ধতন্দ্রার মধ্যে চোখ মেলতেই সে যেন হাত গুটিয়ে নিলে!

—কে? সে চোখ রগডাতে রগডাতে জেগে উঠে বসল।

কে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল? চারিদিকে চাইতেই দেখলে তার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতি সুন্দর চৌদ্দ পনর বছরের একটি মেয়ে। তার দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে যেন মিটি মিটি হাসছে। সে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে তো হাসছেই। কোনও কথা বলে না। কিন্তু কি সুন্দর! বেলা পড়ে এসেছে, রাঙা রোদ আর নাগকেশর গাছের ডালের ছায়া পডেছে মেয়েটির গায়ে। কি সুন্দর রঙীন শাড়ী পড়ে আছে মেয়েটি! পোষাকে, হাসিতে, রঙে, লাবণ্যে যেন কোন্ দূর দেশের সুষমা আর মহিমা মাখানো! তার বড় ভাল লাগল। কিন্তু এ কে? একে তো আগে সে দেখেনি কোনদিন সন্ধ্যাজলে!

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—কে আপনি?

মেয়েটির মুখের সকৌতুক হাসি আরও একটু প্রস্ফুট হল, তিনি বললেন—তুমিই বল না!

হঠাৎ চন্দরের মুখ দিয়ে যেন আপনিই বেরিয়ে গেল—আপনি ভবসুন্দরী ?

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়ে মুখ মিটকে হাসতে লাগল। তারপর তাঁর মুখখানি থেকে হাসি মিললো না, কিন্তু মুখখানা যেন কেমন করুণ কোমল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—বড় কষ্ট লেগেছে মনে ? কষ্ট কি ? সব হাসি মুখে সইতে হয়। হাস তো, হাস, হাস, কেমন হাসতে পার দেখি !

সে হেসে ফেললে ফিক করে। তারপর লজ্জায় সে নিজের দুইহাতে মুখখানা আড়াল করলে। এক মুহূর্ত্ত। মুখ খুলতেই নাই, কেউ নাই। সে প্রাণভরে একবার ডাকল—কই আপনি ?

ওপাশে চাতালের আড়াল থেকে জবাব এল—এই তো আছি, তোমার কাছেই। তোমার সঙ্গেই।

সে ছুটে গেল চাতালের ওপাশে, যেখান থেকে কথার জবাব এল।

কিন্তু কৈ, নাই, কেউ নাই !

সে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইল বিভ্রান্ত হয়ে। কিন্তু মনের সব ভার, সব দুঃখ যেন ধুয়ে মুছে গিয়েছে !

পায়ের কাছে এক গোছা সাদা ফুল পড়ে আছে। কি ফুল কে জানে ! সে দেখেনি এর আগে। সে ফুলের গোছাটা তুলে নিয়ে চলল।

॥ দুই ॥

রাম বছর দুয়েকের মধ্যে কি রকম হয়ে গেল !

একটা প্রকাণ্ড বড় বনস্পতি-তুল্য গাছে বাজ পড়লে যেমন পুড়ে গিয়ে প্রথমে গাছটা শুকিয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে একটা একটা করে শুকনো ডাল ভেঙে গাছটা ছোট হয়ে যায় তেমনি হয়ে গেল রাম। সেই শূরবীর প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা বছর দুয়েকের মধ্যে কেমন যেন শুকিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে গেল।

প্রথমেই গেল মুখের হাসি !

ঐ ঘটনার পর থেকে সে আর হাসে না, রাগে না, প্রায় কথাই বলে না। মাথা হেঁট করে আপন মনে চলা-ফেরা করে। দু পাঁচটা কথা বললে একটার উত্তর দেয়। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কথা বলে না। সকালে মাঠে চলে যায়, মাঠে আপনার মনে কাজকর্ম্ম করে, তারপর আবার ফিরে আসে। এসে আপনার দোকানে বসে সন্ধ্যেবেলা। আজকাল জিনিসপত্র দেওয়ার ও হিসেব রাখার কাজটা করে চন্দর। রাম বসে থাকে আর চন্দর কাজ করে যায়।

এখনো একবার করে সন্ধ্যের সময় আসে কিশোরী পণ্ডিত। জোর করে তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যায়। নিজে যেচে রামায়ণ নিয়ে বসে। নিজের পছন্দমত জায়গা সুর করে পড়ে চলে।

রাম বাধা দেয় না। মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

পড়তে পড়তে কিশোরী মধ্যে মধ্যে বলে—কি, শুনছিস ?

সামান্য সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে—হুঁ। পড়।

কিশোরী আবার পড়ে চলে।

একদিন, ঐ ঘটনার কিছুদিন পরেই, কিশোরী রামকে জিজ্ঞাসা করলে—তোর কি হয়েছে রে রামা ?

রাম কোন জবাব দিলে না। যেন সে প্রশ্নটা শুনতেই পায়নি। যেমন মাথা হেঁট করে বসেছিল তেমনি বসে রইল।

কিশোরী আবার ডাকলে—এই রাম জবাব দে! আমি প্রতিদিন আসছি, দেখছি তুই কেমন চুপচাপ হয়ে বসে থাকিস! এমন যদি করিস আর আসব না তোর কাছে! বল কি হয়েছে তোর!

রাম এবার মাথা তুললে, চারিপাশে তাকিয়ে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেললে. তারপর বললে—কি হয়েছে শুনবি?

কিশোরী বললে—বল, বলবার জন্যেই তো হাজার বার বল্‌ছি!

আবার একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—শোন! তারপর একান্ত দীন সকরুণভাবে বললে—আমাকে ভবসুন্দরীর শাপ লেগেছে রে!

কিশোরী খানিকটা অনুমান করেছিল, তবু একান্ত বিস্ময়ের ভান করে বললে—কি বলছিস তুই?

সখেদে হেসে রাম বললে—ঠিকই বলছি ভাই! তখন তোর কথা না শুনে মহা অন্যায় করেছি।

—কি কথা?

—ঐ সোনা-রূপার ওপর লোভ না করলেই পারতাম। চরণাকে না পাঠালেই হত।

কিশোরীর একবার ঠোঁটের প্রান্তে এল সে বলে—তোকে তো তখনই বারণ করেছিলাম। কিন্তু পাছে রাম আহত হয় সেই জন্যে বললে—তাতে আর তোর দোষ কোথায়? তুই তো আর সত্যি সত্যি সোনা-রূপো পাস নাই।

কিশোরী সান্ত্বনা দিলেও সান্ত্বনাটা যে বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহ্য হল না সেটা কিশোরীর নিজের কানেই ঠেকল। চুপ করে রইল দুজনেই।

কিশোরী আবার কিছুক্ষণ পর বললে—তুই চরণাকে কি লোভ দেখিয়ে ছিলি?

কিশোরীর মুখের দিকে চাইলে রাম মুখ তুলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—তুই কি করে জানলি?

হাসল কিশোরী, হেসে বললে—এ কি আর জানতে হয়! হয় লোভ না হয় ভয় নিশ্চয় দুটোর একটা দেখিয়েছিলি, না হলে যাবে কেন?

রাম বললে—লোভ দেখিয়েছিলাম, বলেছিলাম নদীর ধারে আমার যে বড় বাকুরীটা আছে সেটা দোব। তাতেও রাজী হল না যখন ভয় দেখালাম। ভয় দেখিয়ে রাজী করালাম।

রাম চুপ করলে। তারপর বললে—লোকটাকে ভয় দেখিয়ে পাঠিয়েছিলাম তাই আজ আমি ভয় পাচ্ছি।

কিশোরী রামের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে—তোর কি ভয় লাগে? কি মনে হয়?

অসহায় ভাবে রাম বললে—সব সময় কি রকম খারাপ লাগে! কেমন ভয় ভয় লাগে মাঝে মাঝে!

আবার স্তব্ধতা। অনেকক্ষণ পর সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করে কিশোরী বললে—একটা কাজ করবি রাম?

—বল! সাগ্রহে রাম বললে।

—ঐ যে জমিটা চরণকে দোব বলেছিলি সেই জমিটা ওর ছেলে বউয়ের নামে লিখে দে!

—কক্ষনো না, কিছুতেই না। ঐ হারামজাদা মাগীকে আমি আমার কত কষ্টে তৈরী করা জমি দিয়ে দোব! যেন ক্ষেপে গেল রাম।—সে হারামজাদা মরেছে আপনার দোষে। আমি তার কি করব? আমি বলেছিলাম—তুই জায়গাটা চেহ্নত্ করে এলে তোকে দোব। তা করে এসে আমাকে বলেছিল সে? সে বেটা নিজের কথা রেখে দিয়েছে? আর তার ওপর, তুই জানিস না, ওর ওই কটা বউটা আমাকে শাপ-শাপান্ত করে বেড়াচ্ছে! বলে বেড়াচ্ছে—আমিই নাকি ওকে যেতে বলেছিলাম। আমিই নাকি চরণাকে মেরেছি। তার ওপর জমিটা এখন লিখে দিলে লোকের সন্দেহ হবে বেশী করে! আর তা ছাড়া আমি যদি ঐ সোনারূপা পেতাম তো কথা ছিল। সে সব কিছুই পেলাম না তার ওপর আমার কত সাধের জমি আমি সেধে দিতে যাই। আর যেচে গালাগাল, শাপশাপান্ত আর লোকের সন্দেহ ডেকে নিয়ে আসি। আমি এতই বোকা না পাগল! ওসব হবে টবে না!

কথা শেষ করে হাঁপাতে লাগল রাম।

কিশোরী অবাক হয়ে রামের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে অবাক হয়ে গেল রামের যুক্তির বক্রতা দেখে, তার অতি বিচিত্র স্বার্থপরতা দেখে, তার স্থূল বস্তুর প্রতি অতি প্রবল আসক্তি দেখে। অথচ রাম তো এমন ছিল না। নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা অর্জ্জন করেছে তা প্রীতির খাতিরে আর এক জনের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে হাসি মুখে। এতটুকু দ্বিধা করেনি তাতে। অথচ সেই মানুষই আজ কি হয়ে গিয়েছে! এক জনের প্রতিশ্রুত পাপ্য দেবার কথায় ক্ষেপে উঠছে।

কিশোরী চুপ করে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজ যাই বুঝলি! আবার কাল আসব!

বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললে—জমিটা দিলে ওদের কি ভাল হত জানি না তবে আমার ধারণা তোর ভাল হত। তুই এই আত্মগ্লানির হাত থেকে বাঁচতিস!

রাম বসে ছিল, সে তাকে পিছন থেকে ডাকলে, বললে—একটু দাঁড়িয়ে যা!

কিশোরী ঘুরে দাঁড়াতেই সে বললে—তোর কথা শুনলাম। আমি ভেবে দেখি তোর কথাটা! তবে যা আমি আমার বুকের রক্ত দিয়ে তৈরী করেছি, উপায় করেছি, তা আমি কাউকে দিতে পারব না! আমার বুক ফেটে যাবে! তোকে আমার কেবল একটা বলার কথা আছে! আমি বুঝতে পারছি আমি আর বাঁচব না বেশী দিন! তুই আমার সব থাকল দেখিস। আমার ছেলে থাকল, আমার চন্দ, তাকে দেখিস তুই, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে দিস!

কি অকপট স্বীকৃতি স্বার্থপরতার! কিন্তু তাতে কি তার দায়িত্ব কমল এক বিন্দু? কমেনি তো! কিন্তু কি বলবে সে রামকে! এরপর আর বলারও কিছু নাই তার! তবে হ্যাঁ, রামের ছেলেটা ভাল, চন্দ বাপের মত স্থূল বিষয়ী নয়। ছেলেটার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ আর কোথায় যেন ছেলেটার চরিত্রে একটা অতি সূক্ষ্মতা আছে, অতি সূক্ষ্ম জিনিসের গূঢ় ব্যঞ্জণাগুলো শুদ্ধ আভাসে যেন বুঝতে পারে! পিতাপুত্রের চরিত্রের কোথায় একটা ঘোর গড়মিল ও উপাদান-গত পার্থক্য আছে!

যাক ছেলেটাকেই ভাল করে মানুষ করে দেবে সে। আজ বহুপুরুষের তপস্যায় ও শ্রমে যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তার ঘরে সঞ্চিত হয়ে আছে, যাকে সে জেনেও জানেনি, কেবল ইদানিং যার সঙ্গে নূতন পরিচয় হয়েছে, যে পরিচয়ের গাঢ়তা বাড়ছে দিন দিন তাই সে দিয়ে যাবে ছেলেটাকে। শূদ্র বলে সঙ্কোচ করবে না! ভবসুন্দরীকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞান সঞ্চিত তাতে সকলেরই সমান অধিকার! দেবী ভবসুন্দরী জন্ম জন্ম ক্ষত্রিয় চন্দ্ররায়ের জন্য তো নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করছেন। সেখানে তো তিনি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ব্রাত্য কিছুই বিচার করেন না।

বার তের বছরের ছেলেটার দিন কেমন ভাবে কাটে তার খোঁজ কে করে! ছেলেটা অতি নিঃসঙ্গ। এত দিন পর্য্যন্ত ছোট ছিল, তার অনেক সঙ্গী ছিল। বাবা যখন তখন কোলে করে আদর করত মাঝে মাঝে। তা ছাড়া ইচ্ছা মাত্রেই ছুটে যেত শেওড়া পাড়ায়, কখনও একা, কখনও চরণের কোলে কিম্বা কাঁধে চেপে। সর্ব্বোপরি তার সব সময়ের সঙ্গী ছিল তার মা। আর কিছু

না হোক যখন তখন মায়ের কাছে আদর আবদার করা চলত। আজ কেউ নাই। মা নাই। বাবাকে একবার দিনান্তে সন্ধ্যার সময় গ্রামের লোককে সওদা দেওয়ার সময় কাছে পায়। সওদা দেওয়া শেষ হয়ে গেলেই বাবা বসে থাকে কিশোরী পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে। শেওড়া পাড়ায় যাওয়াও তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ওদিকে যেতে তার কেমন কেমন লাগে। মনে হয় যদি ওখানে গেলে চরণের সেই ক্রোধান্ধ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। তার উপর ওদের ঐ উলঙ্গ ছেলেগুলোর সঙ্গে সঙ্গী হয়ে খেলা করে বেড়াতে কেমন রুচিতে বাধে! তাই আপন মনেই আপনাকে নিয়েই থাকে সে!

কিন্তু তাতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধা নাই। একজন সঙ্গী তার সব সময়েই আছে তার সঙ্গে সঙ্গে, মনে মনে! সেই কিছু দিন আগে দেখা অচেনা মেয়েটি! কে সে কে জানে! বোধহয় ভবসুন্দরী।

সকাল বেলা উঠে ঘর সংসারের খোঁজ খবর করে গরু বাছুর খেতে পেয়েছে কি না দেখে বাবার জলখাবার বের করে বাবাকে খেতে দেয়। বাবা মাঠে চলে যায় হাল গরু নিয়ে। তারপর রান্নার লোকটিকে রান্নার সব জিনিস বের করে দিয়ে নিজে স্নান করতে যায় চাঁদা দিঘীতে। স্নান করে ভিজে কাপড়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরে প্রণাম করে বাড়ী আসে। কাপড় ছেড়ে জল খেয়ে চলে যায় কিশোরী পণ্ডিতের বাড়ী। সেখানে গিয়ে পড়তে বসে।

ব্যাকরণে অনেক খানি এগিয়ে গিয়েছে সে। কিশোরী পণ্ডিতের নিজের কাছে যে সব বই আর পুঁথিপত্র আছে তার থেকেই তাকে পাঠ দেন তিনি। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট হিসেব নেই। ব্যাকরণে খানিকটা এগিয়ে যেতেই তিনি তাকে খানিকটা কাব্য কিছুটা ন্যায় আর বেদান্ত ধরিয়ে দিয়েছেন।

খানিকটা পড়িয়ে কিশোরী পণ্ডিত উঠে যান। পণ্ডিতের স্ত্রী রান্না করেন। তখন আর সে বাড়ী চলে যায় না। বাড়ী যাবে কার কাছে? পণ্ডিত মশায়ের দু' তিন বছরের ছেলেটাকে আগলে রাখে, আদর করে, খেলা দেয়। আরই সঙ্গে সঙ্গে আজকাল পণ্ডিত মশায়ের পুঁথি ঘাঁটার অবাধ অধিকার পেয়ে আপনার খেয়াল খুসীতে আপনার পছন্দমত পুঁথি উলটে পালটে দেখে।

দুপুর গড়িয়ে এলে বাবার খাবার নিয়ে মাঠে যায়। বাবাকে খাইয়ে এসে নিজে খেয়ে নেয়। ব্যস, তারপর আর তার বাড়ীতে পাত্তা থাকে না। সে বেরিয়ে পড়ে বাড়ী থেকে। এই সময়টা তার গ্রাম পরিভ্রমণের সময়! মনটা এই সময় উতলা হয়ে থাকে। সে প্রথম প্রথম গিয়ে বসত ভবসুন্দরীর মন্দিরের

সিঁড়িতে। বসত গিয়ে মনে অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে। যদি সেই মেয়েটি আর একবার আসে, এসে তেমনি হেসে তার সামনে দাঁড়ায়। প্রথম প্রথম তার মনে হত বোধহয় সে প্রতিদিনই এখানে আসে আপনার কাজে! কিন্তু পর পর ক'দিন গিয়ে দেখা না পেয়ে সে বুঝছে সেদিন সে এসেছিল একান্ত খেয়ালে, আকস্মিকভাবেই।

কে সে? ভবসুন্দরী? হতেও পারে, নাও হতে পারে! সে তো নিজের কোন পরিচয় দেয় নাই! আর হয়তো কোন দিন দেখা হবে না, আসবে না সে কোনদিন! কিন্তু যদি আসে, আর সে যদি না থাকে সেখানে সে সময়! মনটা কেমন করে ওঠে। তাই দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর যখন রৌদ্রের উত্তাপে ভাটার টান ধরে থম ধরে থাকে তখন সে চুপি চুপি অতি গোপনে গিয়ে সঙ্কেতস্থলে অভিসারিকের অপেক্ষার মত ভবসুন্দরীর মন্দিরের সিঁড়িতে বসে। চুপ করে বসে থাকে। সামনেই চাঁদা দিঘীর জল কাঁচের মত ঝকমক করে। মাঝে মাঝে আয়নার মত জল কেঁপে কেঁপে ওঠে, একটা পানকৌটি কোথা থেকে উড়ে এসে ঝপ করে জলে বসল, ডুব দিলে, খানিকটা দূরে গিয়ে আবার উঠে এল জলে ভিতর থেকে কুচি মাছ মুখে করে। মাছটা খেয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে খানিকটা এগিয়ে আবার ডুব। ডাহুক পদ্মপাতা আর পানাডির উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে, চলতে চলতে পদ্মপাতার ছায়ায় খানিকটা আশ্রয় নেয়, দাঁড়ায় কয়েক মুহূর্ত। তারপর আবার চলে।

দেখতে দেখতে হাসি আসে তার। জলে ডুবছে তো ডুবছেই। ডুবছে আর উঠছে, আবার ডুবছে। ডাহুকটা চলছে তো চলছেই। ঠিক তারই মত। প্রতিদিন সে এসে এই যে বসে থাকে কার অপেক্ষায় কে জানে, তারপর উঠে যায় নিষ্ফল হয়ে, আবার পরের দিন আগের দিনের মত ফিরে আসে।

এদিকে চাঁপার গাছে, নাগকেশরের গাছে একটু শব্দ হয়। হলেই সে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। যদি সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোথায় কি? কেউ নেই! গাছের পাতায় বাতাস লেগেছে! কিম্বা একটা পাখী গিয়ে বসল আর একটা ডালে।

বেলা পড়ে আসছে, রৌদ্রে লাল রঙ ধরেছে, গাছের আর মন্দিরের ছায়া ম্লান ও দীর্ঘতর হয়ে আসছে। আর থেকে লাভ কি! আজ আর সে আসবে না, তার আসার সময় পার হয়ে গেল। কতদিনের মত আজকের দিনও গেল! সে উঠল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতেই রান্নার যে কটি তাকে বললে—কর্তা খুঁজছিল তোমাকে।

—বাবা?

—হ্যাঁ গো।

সে হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি দোকান ঘরের দিকে চলে গেল। বাবা ডাকছে তাকে? কতকাল বাবা তাকে ডেকে কোন কথা বলে নাই তার হিসেব নাই। সন্ধ্যের সময় ঐ দোকানের কাজের মাঝখান দিয়ে যতটুকু হয় ততটুকুই কথাবার্ত্তা হয় বাবার সঙ্গে। সে দোকান ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রাম লণ্ঠন জ্বেলে চাটাই পাতা চৌকির উপর বসে আছে। সে ঘরে ঢুকতেই অতি কোমল কণ্ঠে রাম ডাকলে—কে চন্দ, এসেছিস? আয়। এইখানে আমার কাছে এসে বস।

সে বাবার কাছে চৌকিতে বসে লণ্ঠনের ম্লান আলোয় বাপের মুখের দিকে তাকালে। বাবাকে দেখে তার বুকের ভিতরটা হোচড দিয়ে উঠল। আহা, সেই মানুষ কি হয়ে গিয়েছে! রোগা হয়ে গালের মাংসগুলো, গলার মাংস ঢিলে হয়ে ঝুলে পড়েছে; দুই চোখের পাশে, দুই নাকের পাশে গভীর রেখা পড়েছে। চোখের সেই উজ্জ্বল চঞ্চল তারা দুটো স্তিমিত, যেন আগুন নিভে তার উপর ছাই পড়েছে।

রাম ছেলের পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনেকক্ষণ হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—আমি তো আর সব দেখতে পারছি না বাবা! চাষ-বাস, ধান-পান একদিকে আর এই দোকান—দোকানের হিসেব আর তেজারতী সব আর আমি দেখতে পারছি না। তুই একটা দেখ!

রাম কথা না বলে বাপের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে কথা বলবে কি, তার কান্না আসছে।

রাম বললে—তুই দোকানটা আর তেজারতী দেখ। আর কিশোরীর কাছে লেখাপড়া কর। কাল মাসকাবারি জিনিস-পত্তর আনবার দিন। আমার সঙ্গে কাল তুইও যাবি। এক মাস, দু মাস দেখে নে। তারপর থেকে তুই-ই যাবি। কাল তোকে জংশনে গদিতে নিয়ে যাব। জিনিস-পত্তর কেনা, দরদস্তুর করা সব দেখবি চোখের ওপর।

চন্দর কোন কথা বললে না। সে বাপের মুখের দিকে কাতর ভাবে চেয়ে রইল। কখন তার একখানা হাত বাপের পায়ের উপর গিয়ে কোমলভাবে পড়েছে তা দু জনের কেউই খেয়াল করেনি।

রামের চোখ দিয়ে তখন জলের ধারা নেমেছে।

এই সময় বাইরে থেকে ডাক উঠল—রাম আছিস রে?

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বেদনার রেখাকে বাইরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে রাম ডাকলে—আয় রে কিশোরী!

কিশোরী ঘরে ঢুকেই পিতাপুত্রকে এক সঙ্গে দেখে বললে—কি ব্যাপার, বাপ-ব্যাটায় কি কথা হচ্ছে?

কথাটা কৌতুক করেই বলেছিল কিশোরী, কিন্তু সকরুণ জবাব দিলে রাম—আয় বস এখানে। ওকে এইবার ব্যবসা আর তেজারতির ভার নিতে বলছিলাম। আমি আর ক'দিন? সব দেখে শুনে নিক।

চন্দ কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাপের মুখের দিকে। কিশোরীর চন্দরের বেদনাটুকু অনুমান করতে কষ্ট হল না। সে সহজ লঘুভাবে বললে—তুই একটা পাগল রে রাম! কত বয়স হল তোর? আমার বয়সী তুই! তা হলে তো আমারও যাবার সময় হয়েছে।

কথাটা বলে কথাটার প্রত্যাশিত ফলের জন্য চন্দরের দিকে একবার তাকালে কিশোরী। ঠিকই হয়েছে, ঐ যে চন্দরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

এমন সময় বাইরে থেকে নারী কণ্ঠে কে ডাকলে—মাছ নিয়ে যাও গো!

রাম ডাকলে—কে রে? এইখানে আয়।

একটি বার তের বছরের ফর্সা রোগা কাঠির মত মেয়ে একটা কচু পাতার মোড়ক দু হাতে ধরে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

চন্দ এগিয়ে এসে কচু পাতার মোড়কটা মেয়েটার হাত থেকে নিলে। মেয়েটা বললে—ভাল করে ধর, নইলে মাগুর আর কৈ মাছ আছে, কাঁটা মেরে দেবে। আমাকে মেরে দিয়েছে দু বার রাস্তায় আসতে আসতে।

রাম এবং কিশোরী দুজনেই সকৌতুকে তাকিয়ে ছিল ফর্সা, রোগা, সপ্রতিভ মেয়েটার মুখের দিকে।

চন্দ মাছগুলো তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। রাম বললে—দাঁড়া বাবা। বলে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কোথাকার মাছ রে? হারা মাছ পেলে কোথা এই সাঁঝ বেলা?

—কাঁদরে ধরেছিল গো! তা কাঁদরের জমা তো তোমার। তাই বাবা 'আধেক গোলান' মাছ দিয়ে আমাকে বললে—নিভু মা, যা রায়কত্তাকে দিয়ে আয়!

তার কথা শুনে রাম আর কিশোরী দুজনেই হাসতে লাগল! কি চটপটে কথাবার্তা মেয়েটার!

মেয়েটা লজ্জিত হয়ে ছুটে নেমে গেল। রাম বললে—দাঁড়ারে। আঁধারে একা যাস না।

মেয়েটা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেতে বললে—আমার ভয় লাগবে না গো কত্তা!

রাম বললে—চন্দ, তোমার পণ্ডিত মশায়কে খানিকটা দাও বাবা!

কিশোরী বাধা দিলে, বললে—আমাকে দিয়ে কি করবি? আমি আর মাছ খাই না, ছেড়ে দিয়েছি।

রাম অবাক হয়ে বললে—কেন রে?

—অমনি।

—তা হোক। তোর বৌ তো আর মাছ ছাড়ে নাই! চন্দ, তুই বাবা একটা কচু পাতে চারটি মাছ দিয়ে মুড়ে এইখানে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দে। যাবার সময় কিশোরী নিয়ে যাবে।

চন্দ খুশীই হল। বাবার আদেশ পালন করে বাকী মাছগুলো রান্নাশালায় দিতে উঠে গেল।

চন্দ উঠে যেতেই রাম একটু হেসে বললে—মেয়েটা বেশ চটপটে আছে। আর কি গোয়ো রঙ, ঠিক তোর মত।

কিশোরী রামের মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললে—হুঁ! মেয়েটা ফর্সা খুব!

রাম আরও একটু হেসে বললে—আচ্ছা ঐ কাল শেওড়াদের ঘরে অমন ফর্সা মেয়ে কি করে জন্মায় বলত!

কিশোরীর সুগৌর মুখখানা একবার রাঙা হয়ে উঠল, সে কথাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কি বাজে যা তা বলিস তার ঠিক নাই। তোকে কিন্তু একটা কথা বলব!

চন্দ মাছ রেখে, হাত ধুয়ে, কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল এই সময়।

আগের কথার জের টেনে কিশোরী বললে—চন্দ সম্পর্কেই কথা, চন্দর সামনেই বলি। তুই যে ওকে এখন থেকেই কাজে লাগতে বলছিস এটা কি ঠিক হচ্ছে? কাজে লাগা, বারণ করব না। কিন্তু লেখাপড়ায় ওর বড় মাথা! ওর লেখাপড়াটা ছাড়াস না।

রাম বললে—লেখাপড়া ছাড়বে কেনে? পড়ুক কেনে যত খুসী! পড়ুক

তোর কাছে! বাইরে কোথাও গিয়ে পড়া-টড়া হবে না। তা হ'লে আমার এ সব দেখবে কে? আর আমিও ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

চন্দ নিজের অজ্ঞাতে কখন এসে চৌকির কাছে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিশোরী তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললে—তা ভাল। আমার কাছেই পড়বে! আমার পুঁজি সামান্য। তবে অন্যায় ক'রো না, অধর্ম্ম ক'রো না এ কথাটা প্রতিদিন ওকে বলতে পারব। ব্যবসাও করুক, লেখাপড়াও করুক। দুইয়ে তো কোন বিরোধ নাই।

অনেক দিন পর রাম যেন একটু সতেজ হয়ে উঠেছে। সে বললে—চন্দ, মান্দেরকে বলে রাখ বাবা, কাল ভোরে জংশনে যাব। তুমিও তৈরী থেক। হ্যাঁরে কিশোরী, জংশন থেকে তোর কিছু আনতে হবে? যদি হয় গিন্নীকে শুধিয়ে ভোর বেলা বলে যাস।

এ কোন্ এক আশ্চর্য্য, অপরিচিত দেশে এসে পড়ল চন্দ!

চৌদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত সন্ধ্যাজলের বাইরে সে বের হয়নি। কখনও কখনও সন্ধ্যাজালের বাইরে কাঁদরের খোলের ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছে সন্ধ্যাজলের বাইরে উত্তরে প্রকাণ্ড মাঠ প্রায় দিগন্ত ছুঁয়েছে, দিগন্তে গভীর নীল-সবুজ বনরেখা ভিন্ন জনপদ ও দেশের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছে। দেখে মনে হয়েছে ও কোন্ দেশ, কেমন দেশ। এই পর্য্যন্ত! তার বেশী কিছু নয়! তারপর আবার ঘন বন-বেষ্টনীর ফাঁক দিয়ে ক্ষীণ পথরেখা ধরে গ্রামের মধ্যে যেমনি এসে ঢুকেছে অমনি সব ভুলেছে। সব ভুলে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। এই বনের বেষ্টনী দিয়ে কৌটোর মত ঢাকা, ছায়ায় ঘেরা, পাখী ডাকা সন্ধ্যাজলের মধ্যে লালিত তার মনটি আপনার কাহিনী, স্মৃতি ও আনন্দ নিয়ে এতকাল স্বচ্ছন্দে ধ্যানমগ্ন ছিল। বাইরের কোন কিছুর তার প্রয়োজন হয়নি।

আজ বাইরে এসে তার ভাল লাগে না। সেই ধ্যানমগ্নতা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিঘ্নিত হয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে গেল।

গরুর গাড়ীতে গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে, নূতন নূতন জনপদের মধ্য দিয়ে সে যখন রামের সঙ্গে জংশন সহরে এসে ঢুকল তখন চারিপাশে তাকিয়ে তার মনটা কেমন করতে লাগল! শক্ত ইট বাঁধানো পথ, গরুর গাড়ীর চাকার আওয়াজ শুদ্ধ পালটে গিয়েছে। পথে কত মানুষ, কত গরু-মোষ' কত পায়রা! তার সঙ্গে কি অপরিচ্ছন্নতা! কত কী ভীড়, কি কোলাহল! দুপাশে বড় বড় বাড়ী ইটের তৈরী, সাদা ঝকমক করছে; তাদের মত মাটির ছোট ছোট

ঘর নয়। সে সব বাড়ীতে কত লোক, আর যেন সকলেই অকারণে গোলমাল করচে। কত ব্যস্ত সবাই!

তাদের গাড়ী গিয়ে দাঁড়াল এমনি একখানা বাড়ীর সামনে। বাড়ীটার পাশে প্রকাণ্ড মাঠ, কয়লার ধূলোয় কালো, মাটির আসল রঙ নজরে আসে না। গরু খুলে গাড়ীখানা বাবা বাঁধলে সেইখানে। তারপর হেসে রাম তাকে বললে—আয়, নেমে আয় গাড়ী থেকে। এই আমাদের দাস মশায়ের গদী!

দাস মশায়ের গদী! বাবার মুখে অনেকবার শুনেছে কথাটা!

দোকানে ঢুকতেই একটা মস্তবড় বাক্সের (চন্দ পরে জেনেছে ওটা লোহার সিন্দুক) পাশে গদির ওপর থেকে এক প্রৌঢ় পরম সমাদরে তার বাবাকে ডাকলে—আরে এস, এস রাম এস। আজ সকালেই বলছিলাম তোমার কথা রাম এখনো এল না কেনে! এস। বস তামাক খাও। ওরে কে আছিস, তামাক দে!

রাম বসল গদীর এক পাশে। হেসে বললে—আপনার কাছে তো খালি হাতে এলে চলবে না। আপনার প্রণামী তো জোগাড় করে আসা চাই!

দাস মশাই সটকার নল মুখে দিয়ে হাসতে লাগল। রামের পাশে তাকে সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—এটি? এটি কি তোমার সঙ্গে এসেছে?

রাম হাসতে লাগল, বললে—আমার সঙ্গেই এসেছ। আমার 'কোঁড়া' (নূতন শিশু বাঁশ) গো দাসমশায়!

—আচ্ছা। বেশ বেশ! তা দাঁড়িয়ে কেন বাবা? বস। তা কোঁড়া তোমার শক্ত হে রাম!

—আপনাদের আশীর্ব্বাদ। তা এবার থেকে ওই আসবে দাসমশায়। আমি এবার 'পেনসিল' লোব। তাই ওকে সব চিনিয়ে দিতে এলাম।

—কেনে হে? পেনসেন নেবার এত তাড়াতাড়ি কিসের? কত বয়স হল তোমার? বড় জোর চল্লিশ বিয়াল্লিশ। আমার তো পঁয়ষট্টি পার হল, এখনও পেনসেন মিলল না। তুমি তো পাকা বাঁশ হে! তা বাঁশ শুকোচ্ছে কেনে অমন? শরীর যে বড় কাহিল লাগছে!

রাম হেসে বললে—বাঁশ পাকছে দাস মশায়!

রাম আর দাস মশাই দু'জনেই হাসতে লাগল। বাপের পাশে বসে চন্দরের অবাক লাগল এই ভেবে যে বাবার কথা বলার ধরণটা শুদ্ধ যেন কেমন পালটে গিয়েছে। কেউ যেন কোন কথা গভীরভাবে নেয় না, কোন কথায়

সহজ উত্তর দেয় না, কথার আসল উত্তরটা হাসি-রসিকতা দিয়ে এড়িয়ে যায়, হাসি আর কৌতুকের হররা ছোটে।

দাস মশায় হাসি থামালে। একজন কর্ম্মচারীকে ডেকে বললে—ওহে পাশের মিষ্টির দোকান থেকে চারটে চারটে আটটা মিষ্টি নিয়ে এস। আর বাড়ীতে বলে এস রাম আর রামের ছেলে দুপুরে খাবে। আর এক কাজ কর। ছোট খোকাকে একবার ডেকে দিও। আজ আর তাকে ইস্কুল যেতে হবে না। আমাদের রামের ছেলেকে জংসন দেখিয়ে আনুক।

হাত পা ধুয়ে যখন সঙ্কোচে আর লজ্জায় সে মিষ্টি খাচ্ছিল তখন তার থেকে একটু বড় ফর্সা জামা-কাপড়-পরা একটি ছেলে এসে ঢুকল। তার খাওয়া হলে সকৌতুকে তার দিকে তাকিয়ে তাকে ডাকলে—এস আমার সঙ্গে।

শ্যামলা মাজা-মাজা রঙ, বড় বড় চোখ, চোখে সকৌতুক দৃষ্টি, দাস মহাশয়ের ছোট ছেলে নারায়ণ। তাকে সঙ্গে করে জংশনের সব দেখিয়ে নিয়ে এল। রেলের ষ্টেশন, ট্রেণ, লাইন, নদীর ওপর পুল, হাট, বাজার, ইস্কুল, থানা, পোষ্টাপিস। নদীর পুল দেখে অবাক হল সে। বললে—বাবা, বাহাদুরী আছে! আচ্ছা করেছে!

নারায়ণ, যার নাম নারাণ, সে বললে—করবে না? কে করেছে দেখতে হবে! সায়েবে করেছে!

—কেনে পুল করলে? বোকার মত প্রশ্ন করলে চন্দ।

—এই দেখ, বোকা কি বলে! দেশ-দেশান্তরে যাবার জন্যে, মাল আনার জন্যে।

—দেশ-দেশান্তরে গিয়ে কি হয়?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে লাগল নারাণ। চন্দ বললে—এই, হাসছ কেনে? আমাদের বারুণী নদীতেও তো পুল নাই। তাতে তো আমাদের কোন অসুবিধা হয় নাই।

—হয় নাই! পুল নাই বলেই এমনি বোকা হয়ে আছ!

এমনি করে আলাপ হল চন্দরের নারাণের সঙ্গে। সে আলাপ কিছু দিনের মধ্যেই হৃদ্যতায় পরিণত হল। নারাণের কাছ থেকে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গেই শুধু পরিচয় হয় না চন্দরের, জীবনের আরও গভীরতর, সূক্ষ্মতর, জটিলতর নানান অভিজ্ঞতার উপলব্ধিও সে পেলে তার কাছ থেকে।

সে মাসে একবার করে আসে, বেশ বুঝে-সুঝে, দাম দর ঠিক করে করে, ওজন ঠিক মত দেখে শুনে, মালপত্র নিয়ে যায়। দোকানে সাজিয়ে রাখে, বিক্রী

করে, হিসেব রাখে। আবার সকাল বেলায়, ছুপুর বেলায় কিশোরী পণ্ডিতের বাড়ীতে পড়াশুনো করে! বেলা পড়ে এলে অভ্যাস-বসে একবার গিয়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরের সিঁড়িতে গিয়ে বসে, তারপর উঠে যায়। জীবনটা একেবারে ছকে বাঁধা একটা যন্ত্রের মত হয়ে পড়েছে। সব যেন তার কেমন বিস্বাদ হয়ে আসছে। সব করে, কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না।

এমনি দিনে একদিন নারাণ বললে—চন্দ আজ থেকে যা! কোনবার তো থাকিস না! এবার রাতটা থেকে যা!

—না ভাই, বাবা ভাববে!

নারাণ বিরক্ত হল, খানিক চুপ করে থেকে বললে—আচ্ছা, খানিকটা রাত করে যাবি। তা তো পারবি?

—তা পারব।

সূর্য্য অস্ত গেল। নারাণ বেশ ভাল জামা কাপড় পড়ে এসে তাকে ডাকলে—আয় আমার সঙ্গে।

—এত সাজগোজ করে কোথা যাবি?

—আয় না।

—তা তো চললামই, কিন্তু পকেটে কি সব নিলি? পকেটা তোর যা ভারী হয়েছে!

—আয় আমার সঙ্গে, এলেই দেখতে পাবি।

সহরের রাস্তা সব চন্দরের চেনা হয়ে গিয়েছে। বড়, ছোট, সোজা, আঁকাবাঁকা নানান রাস্তা ঘুরে নদীর ধারে এসে পৌছুল তারা। জনবিরল পথ, তার ধারে এক আধটা বাড়ী। এমনি একটি ছোট্ট পাকা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল নারাণ তাকে সঙ্গে করে! একটা মস্ত অশ্বত্থ গাছের তলায় তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—এইখানে চুপ করে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাক। আওয়াজ করবি না। কেবল দেখে যা! আমি আসছি!

—কোথা চললি?

—ঐ সামনের বাড়ীতে।

—ও কাদের বাড়ী?

—আমাদের। ভাড়াটে আছে। এক ভদ্রলোক চাকরী করে এখানে। ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে। বলতে বলতে সে এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজায় ধাক্কা দিলে। দরজা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। একটি মেয়ে দরজা খুলে দিলে। নারাণ গিয়ে দরজার সামনেই চৌকিতে বসল!

চন্দর গাছতলার অন্ধকার থেকে দেখতে পাচ্ছে সব।

ছোট চৌকির উপর নারায়ণ বসে আছে। পাশে একটা টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন রাখা। তারই আলোয় নারায়ণের ঘরখানায় বেশ আলো হয়েছে। একটি মেয়ে এসে কাছ ঘেঁসে দাঁড়াল। মেয়েটির সুগৌর মুখে অতি মিষ্টি হাসি। কি সুন্দর করে কাপড় পরেছে মেয়েটি! নীলাম্বরী সাড়ির খুঁটে চাবি ঝুলছে। কিন্তু এ যেন কত চেনা মুখ! কার মত মুখ? কার মত?

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কিছুতেই মনে এল না তার! মনে যেন আসছে, অথচ আসছে না!

কিন্তু কি সুন্দর ঐ কন্যাটি! তের চৌদ্দ বছর বয়স হবে, সমস্ত শরীরে পূর্ণতা এসেও আসেনি। কি সুন্দর ওর হাসি! হেসে হেসে নারাণকে কি বলছে!

জীবনে সে কোন দিন কোন স্ত্রীলোককে দেখে নাই। মানুষকে দেখেছে। মানুষের যে প্রকার ভেদ আছে, মানুষের যে মানুষকে দেখে এত ভাল লাগে তা তো তার জানা ছিলনা! সে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে ঐ আলোকিত স্বর্গলোকের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে নারাণকে কি বলছে! মেয়েটি যেন ঘাড় দোলাচ্ছে, হাসছে অকারণে। ঘাড় দোলালে, হাসলে ওকে ভাল লাগে তা যেন ভাল করে জেনেই হাসছে ঘাড় দুলিয়ে।

কি রকম বিচিত্র দৃষ্টিতে ও তাকাচ্ছে নারাণের দিকে! কেমন ঘাড়টা বাঁকিয়ে, ঠোঁটে অকারণ হাসি নিয়ে তীর্য্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে নারাণের দিকে!

আরে, আরে, কোন্ যাদুতে যেন মুখখানা কেমন হয়ে গেল। হাসি মিলিয়ে গেল, চোখের পাতা নেমে পড়ল, ঘাড়টা ঝুঁকে পড়ল। কি বললে নারাণ! কেমন করে হল? নারাণ তো মারে নি ওকে! নারাণ তো চোখের সামনে দাঁড়িয়ে! তা হলে এমন কি কথা বললে নারাণ যা মারের চেয়েও বেশী!

না, না, ঐ তো কেমন অদ্ভুত হাসি হেসে মুখ তুলেছে মেয়েটি! ওকি, আবার মুখটা নেমে পড়ে যে! যেন ফুলের ডাঁটি আর ফুলের ভার বইতে পারছে না।

তার কান এতক্ষণ ঝাঁ ঝাঁ করছিল, চোখ গরম হয়ে জ্বালা করছিল দেখতে দেখতে। এবার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। ওকি, নারাণ মেয়েটির

একখানা হাত আলগোছে নিজের এক হাতে তুলে নিয়েছে। অন্য হাতে পকেট থেকে কি বের করে ওর সেই ধরা হাতখানায় চাপিয়ে দিচ্ছে।

আঃ, মেয়েটি হঠাৎ হেসে উঠল। ওর হাত থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে ছোট্ট করে ভেংচি কেটে ছুটে পালাল। নারাণ রাগ না করে হাসছে! হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে!

তার একি হল! অন্ধকারের মধ্যে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার আঘাতে সব টলছে যেন! নারাণ এসে তার কাছে দাঁড়াল।

সমস্ত দেহের কোষে কোষে যেন জন্ম-জন্মান্তর থেকে বাঁধ-বাঁধা কোন্ আবেগ এক সঙ্গে বাঁধ ভেঙ্গে বর্ষার বন্যার মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। এ কি বিচিত্র অদ্ভুত আস্বাদ জীবনে! এত তীব্র অনুভবও কি সম্ভব!

নারাণ অন্ধকারের মধ্যে হেসে বললে—কি রে কথা বলছিস না যে! কেমন দেখলি?

তবু উত্তর নাই। নারাণের পিছন পিছন অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সে বুক ভরে গোটা কয়েক নিশ্বাস নিলে। তাতেই খানিকটা সোজা ও সহজ হল যেন সে।

চলতে চলতে তার হাতে চাপ দিয়ে নারাণ বললে—কি, কেমন দেখলি বল?

—ভাল। বেশ মুখখানা মেয়েটার! আর বলা হল না। কেমন সঙ্কোচে থেমে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ আর একখানা মুখ তার মনে পড়ে গেল। যে মুখ সে বহু বহু দিন আগে অকস্মাৎ একদিন কবে একবার দেখেছিল। সে যেন পূর্ব্ব জন্মে দেখা স্বপ্নের মত। সে মুখ আজ যেন স্মৃতিতে ঘসা পয়সার ছাপের মত হয়ে গিয়েছে। তবু যেন মনে হল সেই মুখখানার মত!

—সুন্দর নয়? খুব সুন্দর! নারাণ খুসী হয়ে অকুণ্ঠ তৃপ্তির সঙ্গে বললে।

আজ বহুদিন পর সেই মুখখানার কথা মনে পড়তেই মনটা তার শান্ত হয়ে এল এক মুহূর্ত্তে। আর অকুণ্ঠ প্রশংশা করতে কোন সঙ্কোচ রইল না তার। অকুণ্ঠ আবেগে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বললে—সত্যিই খুব সুন্দর!

—ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমার বাবার কাছে কথা পেড়েছে ওর বাবা। আমার বাবাও মত দিয়েছে।

—আচ্ছা, কি দিয়ে এলি ওকে?

—আটো দিল বাহার, গন্ধ, সুবাস! এইবার তোর দোকানের জন্যে তুইও নিয়ে যাস দু এক শিশি!

দোকানের কথা মনে পড়তেই তার বাড়ী ফেরার কথা মনে হল। সে বললে—চল ভাই, অনেকটা রাত হল। তাড়াতাড়ি চল। এখন না বেরুলে অনেক রাত হয়ে যাবে।

মাল বোঝাই করে গরুর গাড়ীতে যেতে যেতে বার বার সেই মেয়েটির হাসি, চোখের তীর্য্যক দৃষ্টি, ঘাড়ের আর গ্রীবার মনোরম ভঙ্গি ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে মনে আসতে লাগল। সেই বহুদিন আগে দেখা পুরানো মুখখানার কথা একবারও মনে হল না। চারিপাশের অন্ধকার যেন কোন্ তীব্র আবেগে থম থম করছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ সেই তীব্র আবেগেই যেন তারায় তারায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। তারই মাঝখানে সে নিজে যেন সমস্ত আবেগের পুঞ্জীভূত স্বরূপের মত সঞ্চরণ করছে।

জীবনে নূতন আস্বাদ, নূতন অনুভব অতি তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই পুরানো অবসাদ কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে কোন যাদুমন্ত্রে যেন। কাজ করার জন্যে, বাঁচার মধ্যে নূতন আনন্দ এসেছে। সকাল থেকে পুঁথি ঘাটায় যেমন আনন্দ, সন্ধ্যায় দোকানে বসে হিসেব লেখাতেও সেই তৃপ্তি। এখন নূতন চোখে সংসারকে সে দেখতে শিখেছে।

এমনি একদিন।

ভবসুন্দরীর মন্দিরের সিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে উঠে আসার জন্যে সে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় কার পায়ে শব্দ উঠল।

—কে? চমকে উঠে তাকাল সে।

মানুষ নয়, একটা গরু ছুটে আসছে যেন তাড়া খেয়ে। তার পিছনে পিছনে একটা কিশোরী মেয়ে আসছে হাসতে হাসতে। কে মেয়েটা? আরে, হারার মেয়ে নিভু! নিভুই তো! কিন্তু কি হয়েছে মেয়েটা! সেই রোগা কাঠির মত, হাড়-ডিগডিগে, কটা কটা চুলে টান করে ঝুঁটি বাঁধা, খালি গা, ফেরাণী (টুকরো কাপড়)-পরা সেই মেয়েটা! সে এমনি হয়েছে? এ যেন গ্রীষ্মের ছিলছিলে-জল বারুণী কোন্ পাহাড়ে বর্ষার ঢলে এক রাত্রে প্রায় দু-কূল ভরে উঠে অতি তীব্র অথচ নিঃশব্দ স্রোতে ছুটে চলেছে।

তার বুকটা তাকে দেখে দুলে উঠল। কি সুন্দর হয়েছে মেয়েটা! তবু সে একটু ধমক দিয়ে উঠল—অমনি করে গরু তাড়া করে?

মেয়েটা একটা শুকনো ডাল হাতে গরুটার পিছন পিছন ছুটছিল। ধমক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার কথা শুনে এক মুহূর্ত তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললে—কেন, তাতে দোষটা কি হোল?

—কি দোষ হল? এখুনি যদি তোর গরু আমাকে ঢুঁ মারত। একটু দেখে গরু তাড়াতে হয় তো!

মেয়েটা ঠোঁট মচকে হাসলে একটা অবজ্ঞার হাসি। তারপর বললে—আমার গরু তো আর মারে নাই গো তোমাকে। মারলে বলতে! তোমার কথা শুনে এখুনি যদি আমি 'মূচ্ছে' যেতাম এইখানে। একটু বুঝে শুনে কথা বলতে হয় তো!

বাবা, কি উল্টো চাপ মেয়েটার! সে হতভম্ব হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

মেয়েটা তার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ আর ভ্রূ প্রশ্নে কুঞ্চিত করে বললে—তা তুমি এখানে করছিলে কি? রোজ এখানে বসে কর কি?

আরে, মেয়েটা তো তার উপর দিব্যি জোর ফলাচ্ছে! ঘাড় বাঁকিয়ে যেন তার কোন দুষ্ট বুদ্ধি ভেদ করে ফেলেছে এমনি ভঙ্গিটা তার! চন্দর চটে গেল, বললে—আমি এখানে রোজ বসে থাকি আমার খুসী! তাতে তোর কি?

—আমার কি? তেমনি সর্দ্দারি ভঙ্গিতে মেয়েটা বলতে লাগল—তুমি বুঝি মনে কর আমি জানি না তুমি এখানে কেনে বসে থাক?

বারে মেয়ে! ও মনে করে নিয়েছে ওরই জন্যে সে এখানে এসে বসে থাকে! তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড করে উঠল কেন কে জানে! পর মুহূর্ত্তেই কেমন আশ্চর্য্য লঘুতা এল মনে। মনের সমস্ত ভয়টা কেটে গেল এক মুহূর্ত্তে। সে বললে—আর আমি বুঝি জানি না তুই কেন এখানে গরু নিয়ে এসেছিস?

মেয়েটার মুখখানা থেকে তার সর্দ্দারি ভাবটা এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। যেন ধরা পড়ে গিয়ে তার মুখের একটা অতি বিপন্ন অসহায় ভাব ফুটে উঠল। কাঁদ কাঁদ স্বরে সে বললে—আমি কেনে গরু নিয়ে এসেছি এইখানে? তুমি জান? ছাই জান? মিথ্যেবাদী কোথাকার!

বলতে বলতে গরুটার পিছন পিছন সে ছুটে চলে গেল।

পিছন থেকে চীৎকার করে চন্দ ডাকলে—এই নিভু, শোন্ শোন্ রে! একটা অপরিমেয় কৌতুকে সে হেসেই চলেছে।

নিভু দাঁড়াল না। চলতে চলতেই পিছন ফিরে তাকিয়ে সে একটা ভেংচি কেটে তাকে ব্যঙ্গ করে আবার মুখ ফিরিয়ে সে ছুটতে লাগল।

বিকেল হয়ে এসেছে! সাদা আলোয় রাঙা রঙের ছিটে লেগেছে। সমস্ত অভিজ্ঞতাকে আর একবার স্মরণ করতে গিয়ে তার বুকের ভিতরটা আবার ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

পরদিন দুপুরে, তার নির্দ্দিষ্ট সময়ের খানিকটা আগে গিয়ে সে হাজির হল ভবসুন্দরীর মন্দিরে।

পিছনেই মস্ত বড আমবাগান। আমবাগানের ছায়ায় নীচেটা যত অন্ধকার তত ঠাণ্ডা! সে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে উঠে আমবাগানের ভিতরে একটা বড় আমগাছের গুঁড়ির পাশে লুকিয়ে বসে রইল। আজ আর হয় তো মেয়েটা আসবে না। কাল যা রেগে গিয়েছে!

বসে থাকতে থাকতে তার ঢুল এসে গিয়েছিল। হঠাৎ কার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। তা হলে মেয়েটা কি আজ সঙ্গী সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে? সে গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলে। হ্যাঁ নিভুই বটে! একাই রয়েছে! কথা বলছে গরুর সঙ্গে!

সে বুঝতে পারলে না যে-আশ্চর্য্য অদৃশ্য টানে সে এখানে এসেছে সেই আশ্চর্য্য অদৃশ্য টানেই গরু চরাবার ছলনা করে নিভুও গরু নিয়ে এসেছে এখানে। তার বুক দুর দুর করতে লাগল। সে আস্তে আস্তে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে একেবারে নিভুর পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁক মেরে উঠল—এই মেয়েটা!

—ওরে বাবা! কে রে? চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠল নিভু! পিছন ফিরে তাকে দেখে যেন আরও চমকে গেল। তার কাছ থেকে সরে গেল খানিকটা! স্থিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললে—তুমি তো বেশ বসে থাকতে মন্দিরের সিঁড়িতে! এখানে কেনে এলে?

—এলাম, আমার খুসী! তাতে তোর কি?

—বেশ আমি চলে 'যেছি' গরু নিয়ে! তুমি থাক এই ঠায়ে।

—কেনে যাবি কেনে? চলে যাবি কেনে?

—আমার খুসী!

নিভু চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে।

চন্দ্র একান্ত অনুনয় করে বললে—নিভু যেয়ো না, লক্ষ্মী-মেয়ে? শোনো, শোনো। চলে যেও না। দাঁড়াও।

নিভু ঘুরে দাঁড়াল রোষভরে—কি?

চন্দ্রের মুখের দিকে তাকাতেই তার নিজের মুখখানাই কেমন হয়ে গেল!

থমকে দাঁড়াতে হল তাকে। তার পা দুখানা যেন সেখানকার মাটির সঙ্গে গেঁথে গিয়েছে!

চন্দ তার মুখের দিকে তাকিয়েই আছে। সে চাউনি দেখে নিভু আস্তে আস্তে মুখ নামালে। ছলনা যেন এতক্ষণ সাপের মত উদ্যত বিস্তারে ফনা মেলে রেখেছিল। এবার সে ফণা গুটিয়ে নিলে।

সেই সুরু।

তারপর দিনে দিনে দুটো বছর পার হয়ে গেল। তার দেখার গুণে ব্যবসাটা বড় হয়েছে। দোকানের জন্যে নতুন ঘর তৈরী করতে হয়েছে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বারুণী পার হয়ে খদ্দের আর জংশন পর্য্যন্ত না গিয়ে তার দোকানেই আসে সওদা করতে। রাম এখন নিজে হাতে চাষ করা ছেড়েছে। ছাড়িয়েছে চন্দ জোর করে। লোকজন দিয়ে চাষ হয়। রাম কেবল যায় তদারক করবার জন্যে।

মাসের জিনিসপত্র এখন একবারে আনলে চলে না। মাঝে মাঝে দাস মশায়ের গদিতে লোক পাঠাতে হয়। অধিকাংশ সময় সে নিজে যেতে পারে না। লোক যায় তার চিঠি নিয়ে, মাল নিয়ে ফিরে আসে।

সেবার পূজোর ঠিক আগেই। তাদের ভবসুন্দরীর পূজোও ঠিক ক'দিন পরেই। অনেক টাকার মাল দরকার। সে নিজেই গেল জংশন সহরে। দাস মশায়ের গদিতে যেতেই সে কি খাতির। দাস মশায় আজকাল অবশ্য তাকে একটু বেশী খাতিরই করেন। তার কারণ সে বোধ হয় এখন দাস মশায়ের সব চেয়ে বড় খরিদ্দার। কিন্তু আজকের খাতিরের পরিমাণ যত বেশী ধরণটাও তত ভিন্ন।

গদিতে পা দিতেই দাস মশায় পরম সমাদর করে ডাকলেন—এস, এস, বাবা এস। কতদিন তোমাকে দেখি নাই! বস বস। বলতে বলতে নিজে হাতে গদির একটা পাশ ঝেড়ে পরিষ্কার করে দিয়ে তার বসবার জায়গা করে দিলেন। সে বসতেই জোরে হেঁকে বললেন—ওরে, চন্দরের জন্যে হাত-পা ধোবার জল দে!

হাত-পা ধূয়ে জল খেতে খেতেই সে শুনলে দাস মশায় বলছেন—ওরে বাড়ীতে বলে আয়, সন্ধ্যাজলের রায় মশায়ের ছেলে চন্দর বাবু রাত্তিরে থাকবেন এখানে। এইখানে গদিতে শোবার ব্যবস্থা করে দিবি।

এমন সময় এসে পৌছুল নারাণ। তার আসার খবর পেয়ে গুদাম থেকে

ছুটে এসেছে। সেও পড়াশুনো ছেড়ে বাপের ব্যবসায় ঢুকেছে। হাসি মুখে তার কাছে এসে তার হাত দুখানা ধরে বললে—যাক, এলি তা হলে? আমি তো ভাবলাম তুই ভুলে গেলি আমাদের! কিন্তু তুই কি সুন্দর হয়েছিস রে? লম্বা হয়েছিস, শক্ত হয়েছে শরীর, রঙ শুদ্ধ পরিস্কার হয়েছে!

এই সমাদরে এবং প্রশংসায় কেমন অস্বস্তি আর লজ্জা অনুভব করছিল চন্দর। নারাণের কথা শুনে সে এবার অকুণ্ঠভাবে হেসে উঠল। বললে—যা বলেছিস, রঙ শুদ্ধ ফরসা হয়েছে!

—আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো? আচ্ছা দোকানের আর সবাইকে জিজ্ঞাসা কর আমার কথা সত্যি কি না!

রাত্রিতে দাস মশায়ের বাড়ীর অন্দর মহলে দাস মশায়ের সঙ্গে খেতে বসে তার লজ্জা আর অস্বস্তি বেড়ে গেল। খাওয়ার ও যত্নের সে কি প্রাচুর্য্য, কি সমারোহ। দাস মশায়ের স্ত্রী পাখা হাতে তার থালার কাছে বসে তাকে বাতাস করতে লাগলেন।

দাস মশায় বলতে লাগলেন—বুঝলে বাবা, ভগবানের দয়ায়, তোমাদের পাঁচজনের আশীর্ব্বাদে, রান্নার লোক রাখার ক্ষমতা আমার আছে। কিন্তু আমি রান্নার লোক রাখি না। পরের হাতের রান্না খাওয়া পছন্দ করি না। এসব রান্না আমার বাড়ীর মেয়েদের। তুমি খাবে বলে সব রান্না করেছেন আমার স্ত্রী আর ছোট কন্যে।

সে দাস মশায়ের কথার উদ্দেশ্য, এত সমাদরের অর্থ যেন বুঝতে পারছে। সে মাথা হেঁট করে খেয়ে চলল। মাথা হেঁট করে খেতে খেতে দেখলে কালো স্থূল, পরিপুষ্ট, পরুষ দুখানা হাত এক গোছা করে সোনার চুড়ি দিয়ে মোড়া, তার আর দাস মশায়ের পাতের কাছে এক একটা বাটি নামিয়ে দিয়ে গেল। তার মাথাটা লজ্জায় আরও নুয়ে পড়ল।

খেয়ে উঠে হাত ধোবার সময় সে এদিক ওদিক চাইতেই দেখলে পাশের ঘরের দরজার আড়াল থেকে একখানা কালো রঙের গোল মুখ কুতুহলী হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। তার সামনের দাঁত উঁচু, গোল চোখে ধূর্ত্ত অলজ্জ দৃষ্টি যেন খানিকটা প্রগল্‌ভ। মনটা এক মুহূর্ত্তে খারাপ হয়ে গেল তার। কাল, স্থূল, পরুষ হাতের উপরে মুখখানা তো লাবণ্যময় হলেও পারত! এই তা হলে দাস মশায়ের ছোট কন্যা!

মনমরা হয়েই সে খাওয়া দাওয়া সেরে গদিতে ফিরে এল। নারাণ ও এল

তার সঙ্গে। সেও তাঁর সঙ্গী হিসেবে রাত্রিতে গদিতে থাকবে তার কাছে।

পাশাপাশি বিছানায় বসে গল্প করতে করতে তার মন-মরা ভাবটা কেটে গেল অনেকখানি। সে হাসতে হাসতে নারাণকে জিজ্ঞাসা করলে—তারপর নারাণ, তোর 'তার' খবর কি? বিয়ের দেরী কত?

নারাণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ কেঁদে ফেললে। খানিকক্ষণ কেঁদে যা জানালে তার সার মর্ম্ম হল—মেয়েটির বাবা তার বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করায় তার বাবা এত পন চেয়ে বসেছিলেন যে ভদ্রলোক পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিছু দিন আগে ভদ্রলোক এখান থেকে বদলী হয়ে গিয়েছেন।

চন্দর বন্ধুর এই বেদনায় ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল। মেয়েটির সেই ঘাড়-বাঁকানো হাসি-হাসি মুখখানা মনে পড়ল একবার।

পরদিন মালপত্র নিয়ে রওনা হবার সময় দাস মশায় সকৌতুকে গাম্ভীর্য্যের সাথে বললেন—চল তুমি। আমিও দু'একদিনের মধ্যে যাচ্ছি তোমার বাবার কাছে। তাঁর কাছে দরকার আছে আমার! বলে তিনি ইঙ্গিত করে হাসলেন যেন।

সারা পথ একটা মন-মরা ভাব নিয়ে বাড়ী ফিরল সে।

পরদিন বিকেলের দিকে আমবাগানের মধ্যে নিভুর সঙ্গে দেখা হতেই সে হৃদয়-বেদনা আর গোপন রাখতে পারলে না।

নিভুই তুললে কথাটা খুঁচিয়ে—কি হল, এমন মুখ শুকনো কেনে? তুমি তো বড় মানুষ, ব্যবসাদার লোক। কারবারে লোকসান হয়েছে না কি?

নিভুর পাশে বসে তার হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে সে বললে—নারে, আমার কারবারে লোকসান নয়। তার চেয়েও মুস্কিল হয়েছে। আমার ঘাড়ে এক ভূত চাপাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নিভুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল এবার। পরক্ষণেই ঠোঁটে জোর করা হাসি চাপিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে—ওমা, বিয়ের ভাবনা লেগেছে বুঝি?

নিভু হেসে ভেঙে পড়ল।

এইবার নিভুর মুখের দিকে চেয়ে ব্যথাহত হয়ে চন্দ বললে—তুই হাসছিস?

নিভু একগাল হেসে বললে—তোমার বিয়ে হবে আর আমি হাসব না? কত মিষ্টি খাব দুহাতে। ভালমন্দ জিনিস খাব!

চন্দ বিরক্ত হয়ে ঘাড় নেড়ে বললে—তুই বুঝছিস না! সে যা মেয়ে! কালো খসখসে রঙ, শক্ত ধুম্বো চেহারা, মুখখানা ডাকিনীর মত।

নিভু স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অস্বস্তিকর সে চাউনী সে চাউনী দেখে চন্দ বললে—ওকি, অমন করে চেয়ে আছিস কেনে?

নিভু একটু হাসল, বললে—তোমার বুকের ভেতরটো দেখে নিলাম। তোমার আপত্তি তা হলে কালো-কুচ্ছিৎ মেয়ে বলে। 'সোন্দর' হলে তা হলে তোমার কোন আপত্তি থাকত না?

হতভম্ব হয়ে গেল চন্দ, বললে—কি বলছিস রে তুই! তুই বেঁচে থাকতে আমি কাউকে বিয়ে করতে পারি? তোকে ছেড়ে আমি বাঁচব কি করে!

নিভু বোধহয় তার কথায় সান্ত্বনা পেলে না। সে কেমন সাপের চোখের মত চাউনী নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। চন্দ'র ভিতরটা কেমন করতে লাগল। সে বললে—তুই পাগল হলি নাকি? তুই তো জানিস তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না! আমিও ঠিক করে রেখেছি বিয়ে করব না কোন দিন। তোকে ছেড়ে আমি বাঁচব না। আমার যা টাকা-কড়ি আছে তা নিয়ে আর তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব দেশদেশান্তরে। সেখানে গিয়ে ব্যবসা পাতি করব, তোকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকব।

একগাল হেসে দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে নিভু বললে—সত্যি? ঠিক বলছ?

—হঁ্যা।

—বেশ তিন সত্যি কর।

—হঁ্যা, হ্যাঁ, হঁ্যা। হল তো।

নিভু গলে গিয়ে তার কোলের উপর পড়ল।

ঠিক দুদিন পরেই দাস মশাই দলবল সমেত এসে হাজির রামের কাছে। সারিবন্দী গরুর গাড়ী বাড়ীর সামনে দাঁড়াতেই সসব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে হল চন্দকে, পরম সমাদরে আপ্যায়ণ করতে হল। খবর দিতে হল রামকে। রাম তো শোনা থেকে দাস মশায়ের আসার জন্যে ছটফট করছিলই। সে ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ীর ভিতর থেকে—আসুন, আসুন, কি ভাগ্যি আমার! আসুন!

জংশন থেকে ফিরে এসে রামকে কথায় কথায় খবরটা দিয়েছিল চন্দ—দাস মশাই আপনার কাছে দু তিনদিনের মধ্যে একবার আসবেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল রাম, কখন আসবেন, কেন আসবেন দাস মশাই। চন্দ কি করে জানবে সে কথা। রাম ঘাড় নেড়ে বলেছিল—সত্যিই তো

তোকে না বললে তুই জানবি কি করে! নিজেই বলেছিল—দাস মশাইয়ের তো এ চত্বরে অনেক জমি-জমা আছে। বোধহয় টাকার দরকার হয়েছে দাস মশায়ের! ব্যবসা-পাতি বাড়াবে, কিম্বা ধারধোর হয়েছে, শোধ করবে। সেই জন্যে কিছু জমিজমা বিক্রী করতে আসছে হয় তো!

চন্দ আপন মনে একটু হেসেছিল। বাবা সংসারে টাকা আর জমি ছাড়া কিছু জানে না। ওর ভাবনা, কল্পনা সব কিছু ঐ দুটোকে কেন্দ্র করে ঘোরে। ওর বাইরে বাবা আর কিছু ভাবতে পারে না। সে মুখে শুধু বলেছিল—তা হবে!

তারপর এই দু দিনে রাম ক্রমাগত ছেলেকে প্রশ্ন করছে—কৈ, দাস মশায় এল না তো?

কিশোরী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে—সে ভদ্দলোক আসব বলেছে যখন তখন বুঝতেই পারছিস গরজটা তার। তুই এত অকারণ ভাবছিস কেনে বল দেখি! আসে আসবে, না আসে না আসবে।

তাতেও মানতে পারে নি রাম, মাথা নেড়ে বলেছিল—তুই বুঝছিস না! ভদ্রলোক আসব বলেছিলেন, অথচ এলেন না! ব্যাপারটা কি হল জানা তো দরকার!

আজ সেই মান্য অতিথি উপস্থিত হতেই কি ভাবে যে রাম তাঁদের অভ্যর্থনা করবে বুঝতে পারলে না রাম। আজে বাজে আবোল তাবোল কথা বলতে সুরু করলে। অতিথিদের জন্যে আসন বিছিয়ে দিয়ে সে ছুটে গেল কিশোরী পণ্ডিতমশায়ের কাছে, তাঁকে ডাকতে।

কিশোরী পণ্ডিত এসে বসে আলোচনাটা একটা সাধারণ ভব্যতার গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে এলেন!—তারপর কৈ রে রাম, পান তামাক কই? এই সব মানী লোক, তামাক ছাড়া কতক্ষণ বসে থাকবেন। অথচ তোর মুখেই শুনেছি দাস মশায়ের নাকি সটকার নলে আর মুখে!

পান এল, তামাক এল। পান খেয়ে তামাক টানতে টানতে দাস মশায় প্রস্তাবটা পেশ করলেন—তা রায় কত্তা যদি অনুমতি করেন তবে কথাটা বলি।

—বিলক্ষণ, অনুমতি কিসের? বলুন আপনার হুকুম!

—আমার ছোট কন্যের সঙ্গে আপনার চন্দরের বিয়ের জন্যে আমি এসেছি। এখন কি বলছেন বলুন।

রাম মেতে উঠল, বললে—সে তো আমার ভাগ্যি! আপনি যখন বলেছেন—

তার কথায় বাধা দিয়ে কিশোরী পণ্ডিত বললেন—রামের আপত্তি হবে না। তবে কুষ্ঠি তো একবার দেখা দরকার, আর কন্যাটিকেও চাক্ষুস করতে হবে। তা ছাড়া দেনাপাওনার কথা আছে।

দাস মশাই বললেন—সে তো নিশ্চয়! সে তো করতেই হবে। তবে—

রাম অত্যুৎসাহে কথার মাঝখানেই বললে—অন্য তবে টবে নাই। চন্দ'র বিয়ে আপনার কন্যের সঙ্গেই হবে আমি কথা দিতাম। আমার কেবল একটি বাধা আছে।

দাস মশাই বুদ্ধিমান লোক, রাম মুখ খুলতেই তিনি বুঝে নিয়েছেন, বুঝে নিয়ে আগের কথার জের টেনে বললেন—সে তো নিশ্চয় দেনা-পাওনার কথাটা আগেই হওয়া দরকার। আমি অবিশ্যি আমার কন্যার জন্যে পনরো বিঘে জমি আর নগদ দু হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছি। সে আমি দেনা-পাওনার মধ্যে ধরি না। তা ছাড়া আর কি লাগবে আপনারা বলুন! তবে গা-সাজানো গয়না তিরিশ ভরি আমি দেব, আর ভদ্র ঘরে করণ কারণ করতে যা লাগে তা আমাকে দিতে হবে বৈকি!

রামের চোখ দুটো লোভে চকচক করে উঠল। সে স্বচ্ছল অবস্থার চাষী। এ জাতীয় পাওনা তার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত। সে একবার নড়ে চড়ে বসে বললে—সে সম্বন্ধে আর কথা কি! আপনি যখন বলছেন তখন আমি রাজী। লগ্নপত্র—

বাধা দিয়ে কিশোরী পণ্ডিত বললে—হ্যাঁ, একটা ভাল দিন দেখে, কন্যা-চাক্ষুস করে লগ্নপত্র করে ফেলা যাবে। এখন তো ভাল দিন পেতে বাধা হবে না, দেবী পক্ষ আসছে।

রাম বাধা পেয়ে বিরক্ত হল, সে বললে—আমার আপনাকে কথা দেওয়া থাকল। চন্দ'র বিয়ে আপনার কন্যের সঙ্গেই হবে। দেনা-পাওনার কথাও তাই থাকল। দেবী পক্ষে এক দিন গিয়ে আপনার ওখানে একবেলা থেকে সব ঠিক করে আসব।

তারপর প্রচুর হাস্য পরিহাস, খাওয়া দাওয়া করে দাস মশাই রামকে বেয়াই বলে সম্বোধন করে গরুর গাড়ীতে উঠলেন। সন্ধ্যার সময় হয়ে এসেছে। কিশোরী পণ্ডিত গেলেন সন্ধ্যা করতে।

চন্দ্র দোকানে একা চুপ করে বসে আছে। সে আড়াল থেকে সব শুনেছে। রাম এসে দোকানে ঢুকল। ছেলেকে দেখে পরম সমারোহ করে সে বললে—তোর বিয়ের ঠিক করে ফেললাম। দাসমশাইয়ের ছোট কন্যের সঙ্গে। বুঝলি

পনর বিঘে জমি দু হাজার টাকা, তিরেশ ভরি সোনা, আর তা ছাড়া পাত্রাভরণ—সব মিলে সে তোর অনেক, বুঝলি!

চন্দ চুপ করেই রইল।

রাম সে দিকে দৃকপাত না করে বললে—এ একটা বলবার মত সম্বন্ধ হল। আর তা ছাড়া এই তেজারতী আর ব্যবসা বেশ খানিকটা বাড়িয়ে ফেল কেনে? বেশ ফলাও করে কারবার কর।

চন্দ এইবার আস্তে আস্তে বললে—তুমি কেনে কথা দিলে? আমি তো ওখানে বিয়ে করব না! তুমি তো টাকার কথা শুনেই কথা দিয়ে দিলে। তুমি তো মেয়ে দেখ নাই! মেয়ে একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনীর মত দেখতে!

রাম ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—ডাকিনীর মত মেয়ে? রূপ নিয়ে কি হবে? ধুয়ে ধুয়ে জল খাবি? আমি কেমন দেখতে? তু', তু নিজে কেমন? গালাগালি করে সমস্ত জায়গাটাকে সে কুৎসিৎ করে তুললে। তখনও তার বলা শেষ হয় নাই। সে হিংস্র হয়ে বলে উঠল—তু' বুঝি মনে করিস তোর বিষ্যে আমি কিছু জানি না! তোর বজ্জাতি আমি সব জানি!

পিতার কুৎসিৎ তিরস্কারে সে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তারপর শেষের কঠিন এবং মর্ম্মান্তিক ইঙ্গিতময় সত্যভাষণের যন্ত্রণায় অসহায় হয়ে কেঁদে ফেললে।

রাম কি চন্দ কেউ লক্ষ্য করেনি কখন কিশোরী এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে পড়তেই চন্দ চোখের জল মুছে ফেললে। কিশোরী এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে পিতাপুত্র দুজনের দিকে চেয়ে বললে—কি রে রাম? এত রাগারাগি কিসের? অমনি করে কি ছেলেকে বকে? ছেলে বড় হয়েছে!

তারপর চন্দর দিকে ফিরে সে শান্ত কণ্ঠে বললে—তুমি কাল আমার কাছে সকালে আর যেও না। একটু বেলায় স্নান করে উপবাসী থেকে আমার কাছে এসো! আমার কিছু কথা বলার আছে তোমাকে। আর কাল দুপুরে আমার ওখানেই খাবে।

তারপর রামায়ণ পেড়ে মাথায় ঠেকিয়ে বললে—পড়ি, কি বলিসরে রাম?

পরদিন সকালে বাড়ীর কাজগুলো সেরে স্নান করে এল সে। অন্যদিন

বাড়ীর কাছে পুকুরে স্নান করে, আজ স্নান করে এল চাঁদা দিঘীতে। কাল সারা রাত্রি তার ঘুম হয় নাই। বারান্দায় বসেছিল ঘর থেকে বেরিয়ে এসে। পাশের ঘরে বাবার নিরুদ্বেগ নিদ্রার নাসিকাধ্বনি শুনেছে সে সারা রাত্রি। আজ সে শুধু স্নানই করলে না, সাঁতার কাটলে প্রাণভরে। সাঁতার কাটতে কাটতেই নজরে পড়ল পাড়ের উপর দিতে নিভু চলে যাচ্ছে গরু নিয়ে। যেতে যেতে তার দিকে চেয়ে গেল বার বার। ইঙ্গিতে তাকে আহ্বান করে গেল। সে তো যাবেই! তবে এখন নয়! মেয়েটা আবেগে যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে!

সে স্নান সেরে ভবসুন্দরীর মন্দিরে প্রণাম করে বাড়ী ফিরল। কাপড় ছেড়ে সে গিয়ে উঠল কিশোরী পণ্ডিতের বাড়াতে। কিশোরী তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল যেন। সে যেতেই তাকে অন্যদিনের থেকে পৃথক ও বিশিষ্ট সমাদর করে বললেন—এস বাবা এস। তোমার জন্যে কোন সকালে পূজো সেরে বসে আছি।

সে যেতেই কিশোরী উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বললে—বস! তারপর নিজে আসন গ্রহণ করে একখানা পুঁথি সামনে রেখে বললে—তুমি সিন্ধুকের সব পুঁথি দেখেছ, উল্টে পাল্টে পড়েছ। কিছু পুঁথি আমি সরিয়ে রেখেছি। সে কেবল আমাদের বংশের জন্যে। এখানা আলাদা জিনিস। ভবসুন্দরীর কথা তুমি খালি শুনেছ, জান না বিশেষ কিছু! আজ তোমার জানার সময় হয়েছে। তোমাকে বলব। এখানকার কেউ-ই বিশেষ কিছু জানে না এ সম্পর্কে। আমিও জেনেছি অনেক পরে। পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে আজ তোমাকে সব বলব। তারপর পড়তে দেব পুঁথিখানা।

—শোন, ভবসুন্দরী দেবীর কথা শোন আগে। বহু বহু বহু দিন আগের কথা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তখন রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর এক সামন্ত, নাম চন্দ্র রায়, তিনি ধর্ম্মরাজকে যুদ্ধে বহু সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ অন্তে গুরুর আদেশে ধর্ম্মরাজের অনুমতি নিয়ে নিজের দেশ কোশল পরিত্যাগ করে পূর্ব্ব মুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন গুরু, সঙ্গে চলেছে চারশো শবর সৈন্য। সঙ্গে এক কপর্দ্দক অর্থ নাই। তবে বিশটি অশ্বের পিঠে সুবর্ণ পেটিকায় সুরস্বতীর আশীর্ব্বাদী পুষ্প আর মালা। সে পেটিকাগুলি বন্ধ করেছেন গুরু নিজে। নিয়ে চলেছেন শিষ্যের জন্য। মহারাজা চন্দ্র রায় ক্ষত্রিয়, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা সকলেই শবর।

কিশোরী পণ্ডিত ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনীটি ভবকে ভবকে শিল্পের কাছে বিবৃত করলে। বিবৃত করে বললে—কাহিনীর ঐ খানেই শেষ নয়। প্রথম পর্বের শেষ বলতে পার। তারপর এখানে ঐ বিশ্বাস ও কাহিনী মত ভবসুন্দরী হয়তো ঐ শবর কুলে গৌরী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য কি জান? যখনই কেউ তাদের দেখে মুগ্ধ হয়েছে, এগিয়ে গিয়েছে তখনই কোন না কোন বিপদ হয়েছে। বিপদ না হলেও অনন্ত দুর্গতি হয়েছে। কিন্তু যে সব গৌরী কন্যা ওদের বংশে বিয়ে করে ঘর সংসার করেছে তারা দিব্যি সুখে দুঃখে কাল কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বাইরের কারো তাদের কাছে, খুব কাছে যাবার উপায় নাই।

—এ তো গেল এক দিক। আরও একটা দিক আছে। ভবসুন্দরীর নামে বহু সম্পদ সঞ্চিত হয়ে ঐ চাঁদরাজার ভিটেতে চাপা পড়ে আছে বলে প্রবাদ। ও সম্পদের দিকে হাত বাড়াবার জন্যে যে এগিয়েছে সে আর ফিরে আসেনি। শেষ ঘটনাটা তুমি খানিকটা দেখেছ। তোমার বয়স তখন বছর পাঁচেক। সেই সময় এক সন্ন্যাসী এল কোন দেশ থেকে। ভবসুন্দরীর সম্পদের সন্ধানে ওই জায়গায় আমার আর তোমার বাবার নিষেধ সত্ত্বেও গেল কিন্তু আর ফিরল না। তুমি জান না, চরণ অথচ নিয়মিত ঐ ভিটের ভেতর গিয়েছে, এমনি বেড়াতে; তার কিছুই হয়নি। অথচ যে দিন তোমার বাবার কথায় চাপে সে ঐ টাকার আর সোনা-রূপার সন্ধানে গেল, সেদিন আর ফিরল না। তোমার বাবার অবস্থা দেখ। ও যে কি সদানন্দ পুরুষ ছিল তা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু দেখ ও আজ কি হয়ে গিয়েছে। আমি নিজে দেখেছি, তখন আজকের মত ভাল অবস্থা ছিল না রামের, তখন লোক এসে ধরেছে—টাকা দিতে পারছি না; রাম সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে মাপ করেছে। সেদিন রামের কত হাসি, কত কথা, কত ফুর্ত্তি! আর আজ দেখ মানুষটার টাকা আর জমি ছাড়া কোন চিন্তা নাই, সেই চিন্তার ভারে মানুষটা বোবা হয়ে গিয়েছিল।

—তাই বলছি বাবা, তুমি ভবসুন্দরীর প্রত্যক্ষ সংস্রবে যেও না। ভবসুন্দরীর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিধারিণীর কাছেও না, ভবসুন্দরীর সম্পদের কাছেও না। ভবসুন্দরী নিজেও তা চান না। অথচ তিনি বলেন—আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে কাছে আছি। আমাকে খুঁজতে হলে নিজের ভেতরে খোঁজ, বাইরে আমাকে খুঁজো না!

—তুমি বড় হয়েছ, অনেক জ্ঞান লাভ করেছ। নিজের জীবনে কোন

দুর্গতি ডেকে আনবার আগে আমার কথা ভেবো। তারপর পা বাড়িয়ো বাবা।

কিশোরী পণ্ডিতের কথা শেষ হয়ে গেল। কিশোরী চুপ করলে। চন্দ মন্ত্রমুগ্ধের মত চুপ করে বসে রইল। বসেই রইল। কথা বললে না একটিও, মুখ থেকে যেন কথা বের হল না। মনটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর পণ্ডিত-গৃহিনী খাবার জন্যে ডাকতে এলেন। চন্দ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আজকে আর কিছু খাব না মা। শরীরটা বড খারাপ লাগছে!

পণ্ডিত-গৃহিনী উৎকন্ঠিত হয়ে উঠলেন—কি হল বাবা? তা হলে এইখানে বিছানা করে দি, শোও বরং।

সে সবিনয়ে বললে—আজ্ঞে না, আমি বাড়ী যাই। কাল যদি ভাল থাকি তবে এইখানে প্রসাদ পাব।

পণ্ডিত-গৃহিনী বললেন—এ তো তোমারই বাড়ী বাবা। যেদিন তোমার খুশী খাবে।

সে পণ্ডিত-গৃহিনীকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল। কিশোরীর সঙ্গে দেখা হল না আসবার সময়। দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। রৌদ্র ঝিম ঝিম করছে! রাস্তায় পা দিয়েই মনে পড়ল নিভু তার জন্যে আমবাগানে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেখানে আর যাবার কোন উৎসাহ হল না। একে উপবাসী তায় পরিশ্রান্ত তার উপর ভবসুন্দরীর বিচিত্র ভয়াল কাহিনী মনটাকে অবসন্ন করে দিয়েছে। এখন দরকার বিশ্রামের।

সে আস্তে আস্তে বাড়ী গিয়ে ঢুকল। রাম খেতে বসেছে সামান্য শব্দ শুনে সে মুখ তুলে তাকাল, তাকে দেখে আবার ঘাড় গুঁজে খেতে লাগল। রাম তার উপর ভীষণ চটে আছে। তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

সে অবসন্নের মত আপনার ঘরে গিয়ে তেমন একটা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। প্রবল অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ঘুম ভাঙতেই জানলা দিয়ে নজর পড়ল বেলা ঢলে পড়েছে। ওঃ বেলা আর নাই! সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা বোধহয় এতক্ষণ অপেক্ষা করে করে নিরাশ হয়ে চলে গিয়েছে।

সে ছুটে গিয়ে বাগানে ঢুকল।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলেছে সে উপবাসী অবসন্ন দেহের মধ্যে যেন বিপুল তীব্রতায় আগুন জ্বলে উঠেছে।

ঐ তো, ঐ তো পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে সে। কিন্তু ওর গরুটা কোথায়? থাকবে কোথাও কাছে।

বেলা পড়ে এসেছে, আমবাগানটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। তবু চক্রবালের রক্তিম আলোর আভায় বাগানটায় খানিকটা আলোর আভাষ এখনও আছে।

সে ছুটে এগিয়ে চলেছে উন্মাদের মত দুই হাত মেলে।

তার পায়ের শব্দে নিভু পিছন ফিরে তাকাল। হ্যাঁ, কাঁদছে নিভু, ঐ তো হাত দিয়ে চোখের জল মুছছে। কান্নার আড়াল থেকে হাসি উঁকি মারছে।

—লক্ষ্মী সোনা, রাগ করিস না। আজ সারাদিন কিছু খাই নাই। এই দেখ্, না খেয়ে এসেছি তোর জন্যে!

সে এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলে নিভুকে। কিন্তু কৈ, নিভু তো তার বাহুবন্ধনে ধরা পড়ল না! তা হলে সারাদিন না খেয়ে তার মাথা ঘুরছে? ঐ তো তেমনি সমান দূরে নিভু দাঁড়িয়ে রয়েছে হাসি মুখে!

—কৈ, ধরতে পারলে না তো? নিভু বললে হাসি মুখে।

কিন্তু এ তো নিভুর গলা নয়। তবে কে? চমকে তাকাল চন্দ!

—কে?

হাসি মুখে সেইখান থেকেই মেয়েটি বললে—চিনতে পারলে না আমাকে? সঙ্গে সঙ্গে হাসি। মৃদু নিম্নকণ্ঠে খিল খিল হাসি।

সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখতে দেখতে ভূমিকম্পে উদ্ভিন্ন মৃত্তিকার ভিতর থেকে দেবমূর্ত্তির আবির্ভাবের মত বহুদিন আগে-দেখা একখানা মুখ, বড় সুন্দর, বড় কমনীয়, মনের উপরে এসে ভেসে উঠল। হ্যাঁ সেই মুখ, বড় সুন্দর, বড় মোহন, বড় শোভন! সেই হাসি!

এইবার ঐ মুখখানির চারুতার সঙ্গে সুর মিলিয়ে অপরূপ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সে ঘাড় নেড়ে জানালে—চিনেছি।

হাসি মুখেই মেয়েটি বললে—বিয়ে করছ না কেন? ছি! বাবার অবাধ্য হয় না। বিয়ে কর। যাকে বিয়ে করবে তার মধ্যেই আমাকে খুঁজো, আমাকে পাবে। মনে থাকবে কথা?

হেসে ঘাড় দুলিয়ে চন্দ জানালে—হ্যাঁ!

আঃ, কি ফুটল যেন পায়ে! সে ঘাড় হেঁট করলে। পায়ে একটা কাঁটা;

ফুটেছে। কাঁটাটা বের করে মুখ তুললে। কিন্তু সে কই? কেউ নেই! কোথায় গেল? সে কোথায় গেল? এদিক ওদিক খানিকটা খোঁজাখুঁজি করে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। সে বুঝতে পেরেছে আর তাকে দেখতে পাবে না।

সে ছুটে বাড়ী ফিরে এল। দোকান ঘরে ঢুকে দেখলে বাবা বসে কিশোরী পণ্ডিতের সঙ্গে গল্প করছে। সে সোজা বাপের কাছে গিয়ে সস্মিত মুখে বললে—তুমি সম্বন্ধ কর বাবা। আমি দাস মশাইয়ের ওখানেই বিয়ে করব।

বাপ ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। আদর করে বললে—যাক, ছেলের আমার সুবুদ্ধি হয়েছে তা হলে! এত জমি, এত গয়না দেবে, সুবুদ্ধি হবারই কথা।

কেবল কিশোরী পণ্ডিত নিরপেক্ষ দ্রষ্টার মত পিতা পুত্র দুজনকেই ভ্রূ কুঁচকে দেখতে লাগল।

॥ তিন ॥

বিবাহ হয়ে গেল মহাসমারোহে।

বিবাহে দাস মশায় যেমন খরচ করেছে তেমনি খরচ করেছে রাম নিজে। নিজে থেকেই খরচ করেছে সে। মহা সমারোহে বিবাহ উৎসব সম্পন্ন করে কিশোরীকে বলেছে—কি রে, কিশোরী, আমাকে তো মনে মনে খুব কৃপণ ভাবিস! কিন্তু দেখলি তো, কেমন দিল খুলে খরচ করলাম!

কিশোরী হেসেছে, বলেছে—তা করেছিস! খুব করেছিস! তবে খরচ করে আবার তোর পশ্চাৎতাপ কি অনুশোচনা না হয়! দেখিস যেন মনে না হয় যে এতগুলো টাকা মিছামিছি খরচ করে ফেললাম।

তার কথা শুনে হা হা করে হেসেছে রাম, সংগোপনে বলেছে—তা হবে না বুঝলি! বউমা যে পনরো বিঘে জমি পেয়েছে সেটা যাকে বলে অতি উৎকৃষ্ট জমি! জমির দানপত্র দলিল বেয়াই আমাকে দিয়ে দিয়েছে। আমি, বুঝলি, বিয়ের পরই ফাঁকে গিয়ে জমি দেখে এসেছি! ঐ জমির ঠিকেদারকে ডেকে জমি দেখলাম। ভাল জমি! খাসা জমি! বুঝলি!

—বুঝলাম। হেসে বলেছিল কিশোরী।

রাম বুঝেছিল কিশোরী তাকে ঠাট্টা করছে। তাই কিশোরীকে আর কিছু বলে নি সে। কিন্তু তার মনোভাবের মানুষ সে পেয়ে গেল ভাগ্যগুণে। পেলে নিজের পুত্রবধূকেই।

সেদিন সকাল বেলা পুত্রবধূ, ভাল নাম হরিদাসী, সংক্ষেপে দাসী, জল খেতে বসেছে। মাথায় এক হাত ঘোমটা, হাতে এক হাত চুড়ি। রামের বড় ভাল লাগল। সে এসে একখানা পিঁড়ি নিয়ে বসল পুত্রবধূর কাছে। পুত্রবধূ তখন ঘোমটাটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। রাম হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে সসব্যস্ত হয়ে বললে—খাও মা, খাও। আমি তোমার ছেলে, তবে বুড়ো ছেলে, আমার কাছে লজ্জা কিসের? কেবল একটা কথা বলব বলে

বসেছিলাম। তা না হয় পরেই বলব। বলে সে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

ঘোমটার ভিতর থেকেই মৃদুস্বরে দাসী বললে—বসুন আপনি! বলুন!

—মারে আমার! পরম আপ্যায়িত হয়ে বসল রাম। হুঁকো টানতে লাগল।—বলছিলাম কি মা! এই বলছিলাম যে ধান ওঠার তো সময় হয়ে আসছে! তা তোমার জমির ধান কোথা উঠবে? অবিশ্যি তুমি যেখানে বলবে সেইখানে উঠবে। বল যদি তো তোমার বাপের বাড়ীতে উঠতেও আপত্তি নাই।

দাসী মৃদু কণ্ঠে বললে—আমার ধান এখানেই উঠবে। আপনি আমার জন্যে একটা গোলা করিয়ে দেন। তাতেই আমার ধান আলাদা করা থাকবে।

রাম এক মুহূর্ত্তে বুঝে নিলে এ বড সহজ নয়। এ নিজের জিনিসকে নিজের বলে দাবী করতে জানে সব অবস্থাতেই। এ যেমন নিজের জিনিস বাপের সঙ্গেও মেশাতে চায় না, তেমনি শ্বশুরের সঙ্গেও মিশিয়ে দেবার কোনও ইচ্ছা নাই তার। তবু সে বুঝলে এ মেয়ের সম্পদের উপর প্রবলও সক্রিয় আগ্রহ আছে। বুঝে উল্লসিতই হল। সোৎসাহে সে বললে—খুব ভাল বলেছ, লক্ষ্মী মা আমার! কালই আমি লোক লাগিয়ে দোব। কেবল একবার দেখা কাল ভাল দিন কি না!

ঘোমটার আড়াল থেকে দাসীর কথা তখনও শেষ হয় নাই। সে মৃদুস্বরে বললে—আমার ধান এখন গোলাতে রেখে দেন জমিয়ে। তারপরে আষাঢ় মাসে টানের সময় আমার ধান ভাল লোক দেখে 'বারি' (সুদে ধার) দিয়ে দেবেন। দেড়ার কমে দেবেন না।

—বাহবা, বাহবা! এই না হলে দাস মশাইয়ের মেয়ে। বড় ব্যবসাদারের মেয়ে! আচ্ছা বুদ্ধি! আমাকে দেখছি এবার থেকে চন্দ'র বদলে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। কিছুদিন যাক, আমার জমি-জমা সব তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি দেখবে। কালই তা হলে কিশোরীর সঙ্গে পরামর্শ করে লোক লাগিয়ে দি গোলা তৈরী করতে।

পরদিনই গোলা তৈরীর কাজে লোক লেগে গেল। সেই থেকে পুত্রবধূ ও শ্বশুরের মধ্যে হৃদ্যতার আরম্ভ।

দেখে শুনে কিশোরী বলেছিল—বউমা তো তা হলে তোর মনের মত হয়েছে দেখছি! কিন্তু ছেলের মনের মত হয়েছে তো?

জোর দিয়ে রাম বললে—নিশ্চয় ! তাতে কথা আছে ! বেয়াই এত দিলে-থুলে, আর বউ ছেলের মনের মত হবে না একি একটা কথা হ'ল ?

কিশোরী আর কোনও কথা বললে না, কেবল ক্ষুণ্ণ হয়ে একটু হাসলে। গ্রামটা দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে !

চন্দরের মুখের দিকে কেউ তাকায় নি।

শুভদৃষ্টির সময় অনেক প্রত্যাশা নিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল চন্দ। প্রত্যাশা ছিল এই স্থূল মুখখানার আড়ালে একখানি অতি কমনীয়, সুকুমার, একখানি সস্মিত সকৌতুক মুখের আভাষ পাবে। কিন্তু চোখ তুলে দেখলে সেই মুখ, খালি সেই মুখ, যে মুখ দেখে কিছুদিন আগে মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল ! তবু যদি ঐ স্থূল মুখখানায় দুই চোখে শুধু সেই সস্মিত, লাজনম্র দৃষ্টি থাকত ! তার বদলে দুই চোখে কি অকুণ্ঠ, অলজ্জ, সকৌতুক দৃষ্টি ! সে কি দৃষ্টি ! সে দৃষ্টি দেখে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ চোখ নামিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি হাসি ! আশপাশের সকলেই তার লজ্জা অনুমান করে হেসে উঠেছিল। সে হাসিতে, চন্দর ধারণা, নববধূও নীরবে যোগ দিয়েছিল। সে আর মাথা তুলতে পারে নি।

তারপর বাসর।

বাসরেও সে মুখ নামিয়ে বসেছিল। দিদিশাশুড়ী-স্থানীয়া অনেকের অনুরোধে হাসতে হয়েছিল, রসিকতা করতে ও রসিকতার জবাব দিতে হয়েছিল। আরও অনেক কিছু করতে হয়েছিল। কিন্তু সে আর বধূর মুখের দিকে চায় নাই। মুখও ভার করে নাই কেবল সেই এক মুহূর্ত্তের দেখা একজনের সস্মিত অনুরোধ স্মরণ করে। শুধু চুপ করে থেকেছে আর সেই মুখখানিকে স্মরণ করতে চেয়েছে মাঝে মাঝে। সেই মুখখানি মাঝে মাঝে একবার করে স্মরণে এসেছে ; এক আধবার মুখ খানিকটা ফিরিয়ে আড় চোখে এই মুখের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেয়েছে, কিন্তু মেলে নি।

তার অনন্ত প্রত্যাশা ছিল ফুলশয্যার রাত্রির উপর।

অন্ততঃ সেদিন সে তার দেখা পাবে।

সেদিন সন্ধ্যায় তাকে একটা অনুষ্ঠান পালন করতে হল। এটি নব বর-বধূর পক্ষে সন্ধ্যাজলে একটি অবশ্য-পালনীয় আচার। সন্ধ্যাজলে কন্যার বিবাহ হলে বাসর শেষের পর উষা মুহূর্ত্তে জোড়ে গিয়ে কন্যা-জামাতাকে ভবসুন্দরীর মন্দিরে প্রণাম করতে হয়। আর বর সন্ধ্যাজলের ছেলে হলে ফুলশয্যার দিন

গোধূলি লগ্নে জোড়ে গিয়ে ভবসুন্দরীকে প্রণাম করতে হয় বর-বধূকে। জোড়ে গিয়ে প্রণামের মুহূর্ত্ত থেকে মনটা উতলা হয়ে উঠেছিল চন্দর।

এই কিছু দিন আগে যেদিন সে আবার ঐ মুখখানা দেখেছিল, তার সকাল থেকে মনে পড়েছিল সে কার্য্যকারণে উপবাসী ছিল। ফুলশয্যার দিন। উপবাসী থাকা কঠিন। খেতে তাকে বসতেই হয়েছিল। কিন্তু সে খায়নি কিছুই। কার্য্যতঃ সে উপবাস করেই আছে।

ঘরে যখন নববধূর সঙ্গে সে একা হল তখন মনে মনে আবার প্রণাম করলে ভবসুন্দরীকে। বধূর মুখখানা ঘোমটায় ঢাকা। সে কামনা করলে যেন ঐ মুখেই সেই বহুবাঞ্ছিত মুখখানিকে সে দেখতে পায়!

ঘরে নববধূর বড় বড় ছুটো বাক্সের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। গোটা কয়েক লণ্ঠন নূতন কেনা হয়েছে বিয়ের সময়। সন্ধ্যাজলে এ জিনিস ছিল না। চন্দ উঠে আস্তে আস্তে লণ্ঠনটি কমিয়ে দিলে। তারপর বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বললে—ঘোমটা খোল। ঘরে তো আর কেউ নাই।

বধূ ঘোমটাটা আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। তার হাতের সোনার গয়না ঝিন্ ঝিন্, টুংটাং করে উঠল।

চন্দ বিছানায় বধূর পাশে বসে সন্তর্পণে তার ঘোমটাটি খুলে দিলে। বধূ আপত্তি করলে না।

চন্দ মৃদু স্বরে বললে—শোও। অনেক রাত হয়েছে।

বধূ এইবার মুখ খুললে, বললে--বাবা, শোব কি, শুতে ভয় লাগছে!

চন্দ হাসল, বললে—ভয় কিসের? আমি আছি, তোমার ভয় কিসের?

বধূ বিরক্ত হয়ে বললে—তুমি ভারী বাহাদুর। তুমি যেন এই বুক-চাপা দেওয়ালকে সরিয়ে দিতে পারবে! বাবাঃ, যা ছোট ঘর! মনে হচ্ছে যেন চার দিকের দেওয়াল বুকের ওপর চেপে বসবে শুলেই। আর বাবা, তেমনি কি জানলা! শূয়োরের ঘরের মত।

বধূর কথা শুনে চন্দর বুকের ভিতর রাগ ফুঁপিয়ে উঠল। তবু নিজেকে সংযত করে সে বধূকে খুসী করবার জন্যে বললে—তুমি এসেছ, এইবার নতুন ঘর করব বড় করে। তুমি থাকবে।

বধূ বোধহয় সন্তুষ্ট হল এ আবেদনে। বললে—হ্যাঁ, তাই ক'রো। আমি শুলাম। বলে আপাদমস্তক লেপ চাপা দিয়ে তার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে পড়ল।

চন্দ ব্যথাহত হয়ে বসে থাকল চুপ করে অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। এ কাকে

নিয়ে এল সে নিজের বাড়ীতে এত সমাদর করে? কি নিষ্ঠুর, নিজের কথা ছাড়া এ আর কিছু ভাবতে পারে না। আজ এই অতি স্মরণীয় দিনে একবার মনে করলে না যে কোন্ কথায় পাশের মানুষটির মনে আঘাত লাগতে পারে!

ঐ তো নাক ডাকছে! বাঃ, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ল। চমৎকার!

চন্দ উঠল, উঠে সারাদিন উপবাসের পর এক গ্লাস জল খেলে ঢক ঢক করে, তারপর বিছানার অবশিষ্ট অংশে সঙ্কুচিত হয়ে শুয়ে পড়ল। একবার সেই হাসি হাসি সুন্দর মুখখানা মনে পড়ল। পড়তেই নিদারুণ অভিমানে চোখে জল এল। চোখে জল এসে আর লাভ কি! চোখের জল মুছে নিঃশ্বাস ফেলে সে চোখ বন্ধ করলে। নিদারুণ হতাশায় সমস্ত মনটা, তার সঙ্গে শরীরটাও যেন অবসন্ন হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কত রাত্রি তখন কে জানে। স্থান কাল সম্পর্কে অনুভবটা যেন এক মুহূর্ত্ত অবলুপ্ত ছিল। হঠাৎ পাশে বধূর গায়ে হাত পড়তেই সমস্ত অনুভব আবার ফিরে এল। সে উঠে বসল ধড়ফড় করে। তারপর অতি সন্তর্পণে বধূর মুখের দিকে তাকাল ভাল করে।

নাঃ যত খারাপ ভেবেছিল তা তো নয়! পুরন্ত ভরাট শ্যাম মুখখানিতে এক ধরণের লাবণ্য আছে! আছে বৈ কি! ভুরু দুটি টানা, নাকটি টিকালো, চিবুকটি সুন্দর। কিন্তু সে? সেই সুকুমার কমনীয় মুখের ছায়া মাত্র নাই এ মুখে!

কিন্তু আর আক্ষেপ করে লাভ কি? কিন্তু আক্ষেপই বা যাবে কি করে? সে আক্ষেপ কি যায়?

এ বাড়ীতে কিন্তু বধূ আপনার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে।

তার গোলা তৈরী হল। তার এবং রামের যুগ্ম পরিচালনায় ও পরামর্শে! সেই গোলায় ধান এসে উঠল। এবার ধানও হয়েছে খুব ভাল। গোটা খামার বাড়ীটা এবার ধানে থৈ থৈ করছে। দু জায়গায় মাটিতে গোবর লেপে পরিষ্কার করে ধান পেটানো চলল মহা সমারোহে। রাম হুঁকো হাতে ছোট ছেলের মত খুসী হয়ে ধানের স্তুপের মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়াল আর মাঝে মাঝে পুত্রবধূকে ডেকে দেখালে। আবার মাঝে মাঝে পুত্রবধূকে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—এ সব তোমার প'য়ে মা! বুঝলে, সব তোমার প'য়ে।

পুত্রবধূ সেটুকু বুঝলই শুধু নয় আত্মসাৎ করতেও সঙ্কোচ করলে না।

দুচার দিন যেতে না যেতে সে শ্বশুরকে বললে—বাবা, আপনি নতুন করব বলেছিলেন, এইবার আরম্ভ করুন। পারেন যদি পাকা কোঠা করুন।

রাম হুঁকোতে একটা লম্বা টান দিয়ে বললে—তা কি আর পারি না মা, পারি। তোমার মা-বাবার আশীর্ব্বাদে তা পারি! তবে কথা কি মা, আমাদের এই সন্ধ্যাজলে ইঁট পুড়িয়ে পাকা বাড়ী করার নিয়ম নাই! ঠাকুরুণের বারণ। ঐ চাঁদ রাজার রাজবাড়ী অত বড় বাড়ী, অত বড় বংশ, তাও ভিটে-পুরী হয়ে গিয়েছে।

দাসী দমবার মেয়ে নয়। সে বললে—বেশ, তবে বড় করে, ভাল করে মাটির বাড়ী করুন।

রামের উৎসাহ লেগে গেল—বেশ কথা, খুব ভাল কথা। তোমার ইচ্ছে যখন তাই হবে।

কিশোরীর সঙ্গে পরামর্শ করে, শুভ দিন দেখে, গোরট (ভিত্তি) কাটা হল। কাজও আরম্ভ হল। শ্বশুর আর পুত্রবধূ পরামর্শ করে, নির্দ্দেশ দেয়, বাড়ীর কাজ এগিয়ে চলে। মুনিষদের (শ্রমিকদের) এতটুকু ফাঁকি দেবার উপায় নাই। রামের চেয়েও সতর্ক দৃষ্টি দাসীর। সে চীৎকার করে ওঠে—হারে পয়সা লিবি না। এ জেনে রাখিস ফাঁকি দিতে পারবি না এখানে। আর অধর্ম্মের পয়সা হজম করতে পারবি না।

নিজের দোকান ঘরে বসে চন্দ হাসে।

তার তো হাসবারই কথা।

এখানে সে তো নিস্পৃহ দর্শক মাত্র। তার বাবা আর তার স্ত্রী তার যে এবিষয়ে কোন আগ্রহ নাই সেটা তো ধরেই নিয়েছে। তাই ধরে নেওয়া থেকেই যেন মিতালি দু জনের। এই গৃহনির্ম্মাণে, সমস্ত বিস্তারে তার যে কোন ঔৎসুক্য নাই এটাও ধরে নিয়েছে। এ বিষয়ে সে যখন কিছু প্রথম প্রথম গায়ে পড়ে বলতে গিয়েছে তখন তার বাবা তাকে ধমকে থামিয়ে দিয়েছে—তোকে বকতে হবে না। তোকে মাথা গলাতে হবে না এর মধ্যে। তুই তো ছাই বুঝিস।

রাত্রিতে দাসীকে এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সেও বাবার কথারই প্রতিধ্বনি করেছে পাকা গৃহিণীর মত—তোমাকে আর কথা বলতে হবে না এর মধ্যে। আমরা যা বুঝছি তাই করছি। তুমি আপনার দোকান আর তেজারতী নিয়ে যেমন আছ থাক।

এর পর সে সরে এসেছে তাদের কর্মজালের মধ্য থেকে। সে আপনার নিয়ে আছে। তবু তার তৃপ্তি এই যে তার স্ত্রী অন্ততঃ বাবার মনের মত হয়েছে। বাবা পুত্রবধূকে নিয়ে মনের আনন্দে সংসার করছে। সেই ভেঙে-পড়া বিষণ্ণ মানুষটা আবার প্রাণের আনন্দ আবিষ্কার করে নূতন করে গুটি বাঁধছে।

সে পৃথকই হয়ে গেল। সংসারের নানান বস্তুপুঞ্জ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে দাসী। দাসীর যেন তাকে না হলেও চলে। দাসী তাকে বুঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি, তার কাছে আসার জন্যে ব্যগ্র হয়নি। এমন কি সে যদি সাগ্রহে দুই হাত মেলে তার দিকে বাড়িয়েছে অমনি দাসী হয় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে তাকে আহত করেছে না হয় কঠিন বাক্যে তাকে প্রতিহত করেছে। প্রতিদিন রাত্রে কোন না কোন ছুতোয় একটা করে ঝগড়া করে শেষ পর্যন্ত সে মুখ ফিরিয়ে শোবে। কোন কোন দিন পিছন ফিরে শুয়ে কটু কথা বর্ষণ করে যাবে, না হয় কোন দিন অশ্রু বর্ষণ করবে।

তাই সে নিজেকে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিচ্ছে আপনার মধ্যে। তবু রাত্রির কোমল স্নিগ্ধ অন্ধকারে দাসীর গায়ে হাত পড়লে মনটি আপনা-আপনি কেমন হয়ে আসে, দিনের আলোয় অভ্যাস-করা শক্ত খোলের ভিতর থেকে শামুকের নরম শুঁড়টা শুধু বেরিয়ে আসার মত মনের মমতাগুলি সুকুমার ভাষার আকারে প্রকাশ পায়। অস্পষ্ট মৃদু বাক্যে বধূকে আপ্যায়ণ করে। কখনও অস্পষ্ট গদ্‌গদ ভাষায় তার উত্তর আসে, কখনও কঠিন আঘাতে প্রতিহত হয়ে ফিরতে হয়। সে আবার আস্তে আস্তে নিজেকে নিজের শক্ত খোলের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। একটা নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়।

এর জন্য কোন দিন সে অভিযোগ করে নাই কারও কাছে। এমন কি দাসীর কাছেও সে কথা তোলে নাই কোন দিন। এবং দাসীরই অভিযোগের অন্ত নাই। তার অভিযোগ যে কোন্ দিন কোন্ চেহারা নিয়ে হাজির হবে তা অনুমান করা অসম্ভব চন্দর পক্ষে।

সেদিন সে অভিযোগ করলে বিচিত্রভাবে। সে নাকি নূতন যে বাড়ী হচ্ছে সে দিকে একেবারে দৃষ্টি দেয় না। এক পয়সা সাহায্য পর্য্যন্ত করছে না সে দিকে।

—সে কি, টাকার যে তোমাদের দরকার তা বলবে তো? অবাক হয়ে বললে চন্দ।

—সেই তো কথা! টাকার যে দরকার তা বাবাই বা বলবে কেনে, আমিই

বা বলব কেনে? তুমি নিজে থেকে বুঝে দেবে না কেনে? কথা তো সেইখানে।

—আমাকে কি তোমরা বুঝতে ডেকেছ না ডাক? আমাকে বাদ দিয়েই তো তোমরা দিব্যি কাজ করে যাচ্ছ!

—মিথ্যে কথা! তুমি খোঁজও নাও না, খবরও নাও না। ধানের টাকা দিয়ে আর কত হবে? বাবার ধান বিক্রীর টাকা সব খরচ হয়ে গিয়েছে, আমার জমানো টাকায় হাত পড়েছে, তবু তোমার কাছে হাত পাতি নাই। হাত পাতবও না-তা জেন! অথচ এদিকে বাবার যা নগদ টাকাকড়ি সব তো আগলে বসে আছ।

—তোমাদের কত দরকার আমাকে বল। কালই দোব। তার জন্মে অত রাগারাগি কিসের?

ক্ষিপ্ত হয়ে গেল দাসী। চীৎকার করে বললে—রাগ? রাগ কিসের? রাগ কার ওপর? নিজের বাপ-ভাই হত কথা ছিল। তোমার ওপর রাগ কিসের? আর টাকা? ঝাড়ু মারি তোমার টাকায়। আমার যা আছে মা-বাপের আশীর্ব্বাদে, তাতেই আমার বাড়ী হয়ে যাবে। যদি না হয়, আমার হাতে গয়না আছে, বিক্রী করে বাড়ী শেষ করব। তুমি ভেবেছ আমি ভিক্ষে করবার জন্মে হাত পাতব তোমার কাছে। তেমন মা-বাপের আমি মেয়ে নই! তা জেন তুমি!

কোথা থেকে চিন্তা কোথায় যায়! ক্রোধ কেমন করে সপ্তমে চড়ে ওঠে! গভীর বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বন্ধ করলে। অস্ফুট তন্দ্রার মধ্যেই অনুভব করলে দাসী কটুকাটব্য ছেড়ে এবার অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করেছে।

তবে হ্যাঁ, শ্বশুর-পুত্রবধূর প্রচণ্ড কীর্ত্তি এই যে কোঠা বাড়ী শোভায় ও সৌষ্ঠবে একটা দেখবার মত জিনিস হল। ভিতরের দেওয়ালে ও মেঝে চুণ দিয়ে মাজা হল, বাড়ীর বাইরের দেওয়াল মোলায়েম করে পলেস্তারা করে চুণ দেওয়া হল। খড়ের চাল-কাঠামো উৎকৃষ্ট কারিগরকে দিয়ে অনেক যত্নে তৈরী হল। পাকা ঘর-ছাইয়ে মজুর দিয়ে শক্ত ও সুন্দর করে ঘর ছাওয়ানো হল। রাম বলেছিল ঘরে টিন দিতে। কিন্তু দাসী রাজী হয়নি। চালে টিন দিলে ঘর গরম হবে। গরমই যদি হবে তবে এত বড় করে ঘর, এত বড় করে জানলা করবার কি দরকার ছিল! পুরানো কোঠাবাড়ী দোষ করেছিল কি?

কোঠার উপরে ঘরের সামনে মস্ত চওড়া বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে বারুণী নদীর নীল জল নজরে পড়ে।

একদিন দাস মশাই সস্ত্রীক কন্যার বাড়ী দেখে গেলেন। দেখে অকুণ্ঠ তারিফ করতে হল কন্যাকে ও বেয়াইকে। তিনি ফিরে গিয়ে দরজা জানলার পাল্লার জন্যে কিছু পাকা কাঁঠাল কাঠ পাঠিয়ে দিলেন।

শুধু দাস মশাই নয়, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক এসে দেখে যেতে লাগল রাম রায়ের কোঠা বাড়ী। এই বাড়ী দেখা উপলক্ষ্য করেই একটা নূতন গোলমালের সূত্রপাত হল।

তখন বাড়ীর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। টুকি টাকি কাঠের কাজ হচ্ছে। কাঠ বেঁচেছে, তাই থেকে একখানা বড় চৌকা তৈরী হচ্ছে। দাসী ঘোমটার আড়াল থেকে কাজ দেখিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় এসে দাঁড়াল একটি মেয়ে। সুন্দরী, বিগাঢ়-যৌবনা, মুখে এক মুখ সপ্রতিভ হাসি।

শেওড়া পাড়ার হারার মেয়ে নিভু।

দাসীর কাছে এসে সপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে—তুমিই বুঝি নতুন বৌ?

দাসী ভ্রূক্ষেপ করলে না, একবার মাত্র ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যা! তারপর আবার ঘোমটার আড়াল থেকে কাজের নির্দ্দেশ দিতে লাগল।

নিভু এক মুহূর্ত্ত এই সীমাহীন অবজ্ঞার সামনে অপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর জোর করে হেসে উঠল রঙ্গভরে।

ঘোমটার আড়াল থেকে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে কঠিন বিরক্তির ভঙ্গিতে দাসী তাকালে রঙ্গময়ীর দিকে। তার মুখে কটু কথা উদ্যত হয়ে উঠেছে।

সে দৃষ্টির সামনে হাসি কমাতে বাধ্য হল নিভু। মুখ মচকে বললে—আমি বিয়ের সময় এখানে ছিলাম না। মাসীর বাড়ী গিয়েছিলাম। কতদিন বাদে এলাম। ভাবলাম নতুন-বউকে তো দেখি নাই, একবার দেখে আসি। তা তুমি অমন মুখ ভার করছ কেনে ভাই?

তার কথার মধ্যে কোথাও হয়তো কোন করুণ অথবা মিষ্ট আবেদন ছিল। যার জন্যে দাসী অকস্মাৎ নরম হয়ে গিয়ে তাকে বললে—তুমি আমাকে দেখতে এসেছ? তা এখানে এই পুরুষ মানুষের ভীড়ে কি করে কথা বলবে? এস, রান্নাশালায় এস। সেইখানে কথা বলব।

রান্নাশালায় এল নিভু দাসীর পিছন পিছন।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নিভুর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। চারিদিকে অপরিমেয় সমৃদ্ধির চিহ্ন। গোলা তৈরী হয়েছে আরও দুটো।

নতুন কোঠা বাড়ী প্রায় তৈরী হয়ে এসেছে। এ বাড়ীর গল্প তো সে মাসীর বাড়ীতে থাকতেই শুনেছিল! হ্যাঁ, গল্প করবার মত বাড়িই হয়েছে বটে! তার বুকের ভিতরটা নিদারুণ জ্বালায় জ্বলতে লাগল। সে হেসে বললে—লোকে যা বলছে তা সত্যি বটে বাপু!

তার কথার মধ্যে সপ্রশংস শ্রদ্ধার আভাষ পেয়ে দাসী বললে—কি বলছে লোকে!

হেসে নিভু বললে—বলব, রাগ করবে না?

হেসে দাসী বললে—না, না, রাগ করব না, বল।

—বলছে কি! বলছে বউ সোন্দর না হলে কি হয়, বউ খুব লক্ষ্মীমন্ত! রায় কত্তার সংসার একবারে উথলে উঠছে।

কথা শুনে দাসী রাগ করতে পারলে না। তবু নিজের কুরূপের কথাটায় মনে খোঁচা লাগল বৈকি! একটু বেদনাবিদ্ধ হাসি হাসলে সে!

নিভুর সেটুকু দৃষ্টি এড়াল না। সে সেটুকু একান্ত আনন্দে উপভোগ করে বললে—ঐ দেখ, বলেছিলাম তোমার রাগ হবে! রাগ করলে না তো ভাই?

হেসে দাসী বললে—না, না, রাগ করিনি! আমি তো সত্যিই সুন্দর নই! তাতে রাগ করব কেন?

দাসীর এ দুঃখটুকুও সে উপভোগ করলে। তার সাহস বেড়ে গেল যেন। সে হাসতে হাসতে বললে—তুমি তো এত লক্ষ্মীমন্ত বউ, এত সব করছ! কিন্তু আসল জিনিসের ওপর ভাল করে চোখ রেখ ভাই! তোমার কত্তার আবার ভীষণ 'সোন্দর'-'সোন্দর' বাতিক। কত্তাকে বেঁধে রেখ আঁচলে ভাল করে। দেখ যেন 'সোনা বাইরে আঁচলে গিরে' না হয়।

দাসী নিভুর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারলে না। তবু এই অশোভন অন্তরঙ্গতার মধ্যে কোথায় যেন একটা অতি সূক্ষ্ম আঘাতের আভাষ অনুভব করে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল। নিদারুণ ক্রোধে অতি কঠিন কিছু বলবার সে উদ্যোগ করছে এমন সময় শ্বশুর হুঁকো হাতে করে এসে উপস্থিত হল সেখানে। সে ঘোমটাটা একটু বড় করে টেনে নিলে।

নিভুকে সামনে দেখে এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল রাম, তারপর সহজভাবে হেসে বললে—তুই আমাদের হারার কন্যে নিভু নস?

রামকে দেখে মেয়েটা সঙ্কুচিত হয়ে গুটিয়ে গেল। তার মুখের হাসি অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছে। সে শুকনো মুখে মৃদু স্বরে বললে—হ্যাঁ গো, কত্তা!

রাম হেসে বললে—চোখে চালসে লেগেছে। আজকাল আর সব বেশ

ভাল দেখতে পাই না! তা তোকে অনেকদিন দেখি নাই মনে হচ্ছে। এত দিন ছিলি কোথা? এলি কবে?

রাম অত্যন্ত সহজভাবে হাসতে হাসতেই বললে কথাগুলো। কিন্তু রামের চেয়ে কে বেশী জানে মেয়েটা এতদিন কোথায় ছিল, কেন ছিল না, কবে এল!

মেয়েটা আস্তে আস্তে বললে—মাসীর বাড়ী গিয়েছিলাম মশায়। কাল রেতে এসেছি!

রাম হেসে বললে—তা বেশ। তা কাল রেতে এসেই বুঝি আজ সকালে আমাদের লতুন বাড়ী দেখতে এসেছিলি! তা বেশ! তা দেখা তো হল! এইবার আমরা কাজকম্ম করি, তু বাড়ী যা!

নিভু নির্ব্বিবাদে উঠে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। রামও সঙ্গে সঙ্গে চলে গেল তাড়াতাড়ি। দাসীর সমস্তটা কেমন যেন মনে হল। সেও অতি সন্তর্পণে শ্বশুরের পিছন পিছন উঠে গেল। গিয়ে দাঁড়াল পাঁচীলের একটা ভাঙ্গা খাঁজে মুখ রেখে। দেখলে শ্বশুর মেয়েটাকে অতি সন্তর্পণে মৃদু স্বরে ডাকলে —এই, শোন!

মেয়েটা রাস্তায় নেমেছিল, সে ডাক শুনে চমকে ফিরে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল শ্বশুরের কাছে।

তার শ্বশুর, মেয়েটা কাছে আসতেই, অত্যন্ত ভয়াল নিম্নকণ্ঠে বললে—তুই কি ভেবেছিস? কেন এসেছিলি তুই আমার বাড়ী? তুই ভাবছিস তোর কথা আমি শুনি নাই? কি বলছিলি তুই আমার বউ-মাকে? খবরদার এই বলে দিলাম, আর এদিক মাড়াবি না। মাড়ালে ভাল হবে না! ঐ চাঁদা-দিঘীতে ডুবিয়ে মারব, কিম্বা ঐ চাঁদরাজার ভিটেতে ছেড়ে দিয়ে আসব! যাঃ!

শ্বশুরের মুখ খানা কি ভয়াল হয়ে উঠেছে! তারও ভয় লাগছে মুখখানা দেখে। এদিকে স্বামী দাঁড়িয়ে আছে পাথরের মূর্ত্তির মত।

কেন? কেন এসব? সে কিছুই বুঝতে পারলে না। তার জীবনে অতি সূক্ষ্ম বোধ গুলো যেন পরিপক্ক নয়। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেই রৌদ্রের মধ্যে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা অবিশ্বাস্য সম্ভাবনা তার মাথায় খেলে গেল। ঐ মেয়েটির সম্পর্কে তার স্বামীর দুর্ব্বলতা ও আসক্তির কথাটা মনে হল তার! যাঃ, তাই কি হয়?

তা হতে পারে না! সে বাল্যকাল থেকে চন্দর গল্প শুনে আসছে তার বাবার কাছে, তার ছোটদাদার কাছে। বড় ভাল ছেলে, বড় শান্ত ছেলে! তারপর ব্যবসা সূত্রে সে তাকে তাদের বাড়ীতে দেখেছে। মিতবাক, সংযত,

মৃদুকণ্ঠ শান্ত স্বভাবের মানুষ। দেখে কেমন যেন মায়া হত। দেখে কেমন যেন তার তখন থেকেই ধারণা হয়ে গিয়েছিল—এ তাদের বড় আপনার মানুষ! এর উপরে সব আবদার, সব জুলুম নির্ব্বিবাদে করা যায়! অনবুঝের মত অভিযোগ করা চলে এ মানুষটার উপর।

মানুষটা তো তার সব অভিযোগই সহ্য করেছে এবং করে। কিন্তু তাকে যেন কাছে পাওয়া যায় না!

তার কারণ তা হলে এই? এই মেয়েটা?

মেয়েটা তার মত কালো নয়, ফর্সা; মুখখানাও বেশ কাঁচা কাঁচা, নরম নরম! এই মেয়েটাই তা হলে আজও তার স্বামীর মন জুড়ে বসে রয়েছে! আর সে? বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ঝিয়ের মত?

থাকবে না, সে আর থাকবে না এখানে। চলে যাবে! তার টাকা আছে, জমি আছে, তার ভাবনা কি!

কিন্তু যাবার আগে সে সব অবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে যাবে!

ঐ তো, ঐ তো, এখনও লোকটা পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এতদিন সে রাগে কেঁদেছে। আজ অসহায় অভিমানে দুই চোখ থেকে সকলের অজ্ঞাতে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল!

রাত্রিতে শোবার সময় স্বামীর সঙ্গে দেখা হতেই সে জলে উঠল।

অন্যদিন রাগটা আগে প্রকাশ পায়, রাগের পিছন পিছন যুক্তি এসে রাগকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। আজ সারা দিন মনটা তার বিষণ্ণ, আহত হয়ে রইল। তারপর রাগে রূপান্তরিত হল সমস্ত বেদনা! সমস্ত দিন ধরে সে চিন্তা করে গেল, ভেবে রাখলে কেমন করে সে জব্দ করবে চন্দকে। একের পর এক কথা শুদ্ধ সে সাজিয়ে রাখলে।

রাত্রিতে স্বামী যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল তখন লণ্ঠনটা কমাতে কমাতে সে বললে, একটু হাসির সঙ্গেই সে বললে—জান আজ সকাল বেলায় একটা মেয়ে এসেছিল!

চন্দ বিছানায় শুয়েই তার দিকে মুখ ফেরালে। তার দিকে চেয়েই রইল, কোন কথা বললে না।

দামী চন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললে—তুমি দেখেছিলে মেয়েটাকে?

চন্দ যেন একটু চমকে গেল, বললে—কে এসেছিল, কৈ দেখিনি তো?

—ফর্সা অল্প বয়সী, বোধহয় আমার চেয়ে একটু বড়ই হবে! চেন না মেয়েটাকে?

চন্দ হেসে বললে—কে, নাম না বললে বলব কি করে চিনি কি না!

দাসী হাসল। বিছানায় নিজের শোবার জায়গায় বসে বললে—জান, মেয়েটা বেশ দেখতে! ফর্সা রঙ, পাতলা ছিপছিপে, বেশ দীঘল দীঘল গড়ন, অথচ রোগা নয়। মুখখানাও বেশ! শ্বশুর কি বলে ডাকলেন যেন? আহা, ভুলে যাচ্ছি, কি যেন নামটি? নিভু, নিভু, বোধহয় নিভাননী! চেন না কি মেয়েটাকে?

দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ বললে—চিনি বৈ কি! গাঁয়ের মেয়ে!

দাসী আবার হাসল—চেন তা হলে? মেয়েটা আজ আমাকে দেখতে এসেছিল। বলে গেল আমি নাকি দেখতে খারাপ।

চন্দ বিছানায় উঠে বসল সোজা হয়ে, জিজ্ঞাসা করলে—তোমাকে বলে গেয়েছে এই কথা?

দাসী এইবার চটে উঠল—আমি কি তোমাকে মিথ্যে বলছি না কি?

—কাল দেখছি তাকে, দাঁড়াও! রেগে উঠল চন্দ।—তার সাহস তো বড় বেড়েছে দেখছি!

হাসতে লাগল দাসী। তারপর বললে—সে আরও কি বললে জান? তাকে বকাতে সে আমাকে বললে—ওহে তোমার বরই তো আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে অপমান করতে! আমি আর কি বলব, আমি চুপ করে গেলাম।

স্তম্ভিত হয়ে গেল চন্দ! এটা দাসীর সত্যভাষণ না রসিকতা সে বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

এইবার জ্বলে উঠল দাসী। নিজের ক্রুদ্ধ দুই চোখ স্বামীর চোখের ওপর রেখে সে চাপা তীব্র গলায় বললে—তাই যদি না হবে, তোমার কাছে যদি সাহস না পাবে, তবে আমাকে অপমান করবার শক্তি কোথায় পেলে সে?

স্তম্ভিত হয়ে চন্দ বললে—আমি তাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাকে অপমান করতে? 'তুমি কুৎসিৎ' এই কথা শিখিয়ে তাকে পাঠিয়ে ছিলাম এই তোমার ধারণা?

ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে দাসী বললে—হ্যাঁ। তা না হলে, ঐ শেওড়াদের একটা মেয়ে আমাকে অপমান করতে সাহস করে? এ সাহস তুমি না দিলে ও পায় কোথা থেকে?

হতাশ হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ বললে—তুমি বিশ্বাস না করলে কি বলব আমি! আর তা ছাড়া আজ আমি দেখিইনি মেয়েটাকে!

রাগে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নামল দাসী। ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করে বললে —মিথ্যাবাদী কোথাকার! মিথ্যা কথা বলতে, অকারণে মিথ্যা কথা বলতে বাধল না তোমার? তুমি দেখনি আজ মেয়েটাকে?

একটা প্রবল ক্রোধ আগুনের শিখার মত তার শরীরের ভিতর থেকে মাথা পর্য্যন্ত তাকে জ্বলিয়ে দিয়ে প্রতিপক্ষকে পোড়াবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠল যেন। বজ্রগর্ভ-স্বরে সে উত্তর দিলে—না। দেখিনি।

ভয় না পেয়ে ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মত সে দংশন করলে। মুখ বাঁকিয়ে নিষ্ঠুরভাবে বললে—দেখনি না? কিন্তু মেয়েটা যখন বেরিয়ে যায় তখন শ্বশুর তাকে বকছিলেন, আর তুমি কত কষ্ট পেয়ে পাথরের ঠাকুরের মত দোকান ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনছিলে! আমি যে সব দেখলাম নিজের চোখে! আমাকে তুমি ফাঁকি দেবে কি করে?

ঘুরে দাঁড়িয়ে চন্দ বললে—তোমাকে ফাঁকি দেব না। তুমি শুনবে? সব বলব তোমাকে, বস।

ক্রোধে বিভ্রান্ত হয়ে সে আবার তেতে বলে উঠল—কি বলবে কি? বলবার আবার আছে কি তোমার? মিথ্যাবাদী, লম্পট, চরিত্রহীন কোথাকার!

কানে হাত চাপা দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল চন্দ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললে—ছি, ছি, ছি। পাপ, মূর্ত্তিমান পাপ!

দাসীর বলা তখনও শেষ হয় নাই। সে মনে মনে জ্বলতে জ্বলতে বললে— বারান্দায় থমকে দাঁড়ালে চলবে কেন? দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেই তো হয়? আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না!

বলেই দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় মুখ গুঁজে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এমন করে তো সে বলতে চায় নাই। মানুষটাকে এমন করে তো আঘাত করতে চায় নাই সে!

তাদের দুজনের কথা বন্ধ হয়ে গেল। শুধু কথাই বন্ধ হয়ে গেল না শয্যাও পৃথক হয়ে গেল। চন্দ দুপুর বেলা একবার বাড়ীর ভিতর আসে, খায়, নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে দোকানে গিয়ে বসে। দোকানে বসে খদ্দের বিদায় করে, তেজারতির খাতা ও খত নিয়ে হিসেব করে, দেনদার এসে দেনা-পাওনার কথা

বলে, শোনে, খতে উশুল নেয়। আবার লোকজন না থাকলে চুপ করে বসে থাকে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত যা হোক কিছু নিয়ে পড়ে। পড়তে ভাল না লাগলে চুপ করে বসে ভাবে।

একটা ভাবনাই তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। এমন করে চলবে কি করে? কতদিনই বা চলবে? এক যদি দাসীকে তার বাপের বাড়ীতে রেখে আসা সম্ভব হত তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, তা হলেও সমস্যার একটা মীমাংসা হত। আর তা না হলে এই রূপহীন গুণহীন, অগ্নিগত মানুষকে নিয়ে এক সঙ্গে প্রতি মুহূর্ত্তে পদক্ষেপ সে করবে কি করে?

এদিকে বাড়ীর কাজ এগিয়ে চলেছে। বাড়ীর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। কিশোরী পণ্ডিত মশায় গৃহ প্রবেশের দিন করে দিয়েছেন। তারই আয়োজন করছে শ্বশুর পুত্রবধূতে অত্যন্ত সমারোহ করে।

দূর থেকে দাসীর দিকে চেয়ে তার এক এক সময় অবাক লাগে। জীবনের সব চেয়ে গোপন মর্ম্মকোষে এই বেদনা নিয়ে এমন সমারোহের কেন্দ্রবর্ত্তিনী হয়ে সে আছে কি করে? না, এই কলহ, এই বিচ্ছেদ তার কাছে কোন ব্যথাই নয় যেন। তার সমস্ত কাজের উৎসাহ দেখে তার মনে হয়, সে যেন দাসীর জীবনে অপ্রয়োজনীয়, অতিরিক্ত।

কিন্তু সে? সেই কমনীয় মুখ, সেই সুকুমার লাবণ্যময় হাসি? সে কি মিথ্যা বলেছিল তাকে? সে বলেছিল—খুঁজে দেখো, পাবে, আমাকে পাবে। কিন্তু খুঁজে দেখার সুযোগ মিলল কই?

সুযোগ মিলল না, তাই সে সুযোগের চেষ্টাও করবে না? আজ হঠাৎ একটা কথা তার মনে হল—এটা অবশ্য ঠিক যে রাত্রির পর রাত্রি যে ঝগড়া হয়েছে তা একান্ত একতরফাই, দাসীই রাগ করে বকেছে, সে অধিকাংশ সময় উত্তর করেনি। ঝগড়ায় সে নির্ব্বাক শ্রোতার মতই থেকেছে। রাগ করেনি বটে, কিন্তু কোন দিন অনুরাগে তার দিকে এগিয়েও যায়নি! কোন দিন তার রাগ ভাঙাবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেনি। ভাল করে তাকে দু'টো আদরের কথা বলতে পায়নি। সে পায়নি কিছু, কিন্তু সে দেয়ও নি কিছু। ভাবতেই দাসীর জন্যে অনুকম্পায় মনটা কেমন করে উঠল।

আহা বেচারী! চিরকালের জানা বাড়ী থেকে পরের বাড়ীতে এসে পরের সংসারকে নিজের করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিয়ের আগে হয়তো ভেবেছিল তার সম্পর্কে—এ চেনা মানুষ, ঠাণ্ডা মানুষ, একান্ত ভাবে এই যে মানুষটা আমার তার উপর সে রাগ করবে, নিশ্চয় করবে। সে তো তারই

জিনিস। ভিন্ন পরিবেশে এসে সে হয়তো আপনার মত আপ্রাণ চেষ্টা করছে এখানে মিশে যাবার। কিন্তু যাকে অবলম্বন করে তাদের সংসার মিশবে সেই মানুষকেই তো কাছে পায়নি সে!

এ সে চলতে দেবে না। দেখবে, একবার চেষ্টা করে দেখবে। একবার কেন, একবারে না হলে অনেকবার চেষ্টা করে সে দেখবে। দোকান ঘরে বসে, রান্নাঘরে যে মেয়েটি কাজ করছে এই মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধানে তারই মুখখানা স্মরণ করবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

রাত্রি যখন গভীর হল তখন আপনার বিছানা থেকে চুপি চুপি উঠল সে। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দাসীর বিছানায় তার মাথার কাছে গিয়ে সে বসল। আস্তে আস্তে সে দাসীর মাথায় হাত দিলে। তারপর সযত্নে তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এক সময় নিজের মুখখানা তার মুখের একান্ত কাছে নিয়ে ডাকলে অতি মৃদু স্বরে—দাসী! দাসী! শুনছ!

দাসী ঘুমোয়নি। সে জেগেই ছিল। বার কয়েক ডাকতেই তার হাতখানা সজোরে আঁকড়ে ধরে তার কোলের উপর মুখ গুঁজে কান্নায় ভেঙে পড়ল!

তারপর কত কাঁদলে সে!

এক সময় কান্নার মধ্যেই সে বললে—যদি তোমার মনে এই ছিল তবে তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?

আস্তে চন্দ বললে—সব শুনবে তুমি? যদি শোন সব বলব তোমাকে।

চোখের জল মুছে দাসী বললে—বল! শুনব!

চন্দ একে একে সব বলে গেল তাকে। দুটি কথা বাদে সব বলে গেল। কেবল বললে না—দাসী দেখতে ভাল নয় বলে বিয়েতে আপত্তি করেছিল। বিয়েতে সে আপত্তি করেছিল ঐ নিভুর জন্যেই। সে ঠিক করেছিল নগদ টাকাকড়ি আর নিভুকে নিয়ে সে দেশান্তরে পালিয়ে যাবে।

—তবে গেলে না কেন? তবে আমাকে বিয়ে করলে কি করে?

—ভবসুন্দরী আমাকে স্বপ্ন দিলেন।

উঠে বসল দাসী—ভবসুন্দরী কে?

—তুমি জান না, ঠাকরুণ? আমাদের এখানকার দেবতা। তার কথা কেউ জানে না এখানে। কিশোরী পণ্ডিত মশায় আর আমি জানি।

—বল না, বল তার গল্প।

নিজের কথা থেকে ভবসুন্দরীর গল্পে চলে গেল দুজনে। তার সমস্ত কাহিনীটা বলে গেল চন্দ। তারপর আবার ফিরে এল নিজের কথায়। বললে—সেই ভবসুন্দরী! তিনিই আমাকে স্বপ্ন দিলেন। বললেন—তুমি বিয়ে কর, সুখী হবে।

নিজের মুখখানা স্বামীর মুখের দিকে তুলে বলল—কিন্তু তুমি তো সুখী হওনি!

তার হাসি হাসি মুখখানায় আর একখানা মুখ খুঁজবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললে—কে বললে! এই তো সুখী হয়েছি।

এই সামান্য মিথ্যে কথাটাতেই একান্ত খুসী হয়ে তার কোলে মুখ লুকোল দাসী। সে পরম যত্নে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ক'দিন পরেই। গৃহ-প্রবেশের দিন।

আর কেউ দেখতে না পাক চন্দর চোখে তফাৎটা ধরা পড়েছে। সব কথায় যে ঝাঁজ থাকত দাসীর সেটা গিয়েছে, তার জায়গায় হাসি এসে যোগ দিয়েছে। একটা সহজ প্রসন্নতা এসেছে তার জীবনে।

গৃহ-প্রবেশের দিন কোন্ ভোরে স্নান করে পাটের কাপড় পড়ে ঘুরছে দাসী। তাগাদা দিয়ে স্বামীকে শ্বশুরকে কোন্ সকালে স্নান করিয়েছে। পাটের কাপড় পরিয়ে ছেড়েছে দুজনকেই। বাড়ীতে পাটের ধুতি কাপড় মাত্র একখানা, যেটা চন্দ বিয়েতে পেয়েছিল। সেখানা শ্বশুরকে পরতে দিয়ে নিজের একখানা শাড়ী পরতে দিলে চন্দকে। শাড়ী পরতে আপত্তি করে পার পায়নি চন্দ। বরং খানিকটা তিরস্কার পেয়ে শাড়ীখানা পরতে হয়েছে তাকে।

বেলা এক প্রহরের পর কিশোরী পণ্ডিত পূজা শেষ করলেন। শাঁখ বাজল, সবৎসা গরুর লেজ ধরে মঙ্গলপাত্র মাথায় করে, গোটা গায়ে সোনার গহনা পরে, শ্বশুর আর স্বামীকে নিয়ে সে গৃহ-প্রবেশ করলে।

অনুষ্ঠানের পর শ্বশুরকে জল খেতে দিয়ে সে স্বামীকে ডাকলে—এস জল খাবে। বেলা অনেক হয়েছে।

চন্দ হাত জোড় করে বললে—লক্ষ্মী, সোনা, আজ আর জল কেন, আমি কিছু খাব না।

অবাক হয়ে দাসী বললে—কেন? খাবে না কেন?

—তুমি তো জান আমি সুযোগ পেলে ভাল দিনে উপবাস করি। আজও উপবাস করব।

দাসী চটে গেল—আমি কিছুই জানি না। বলে চলে গেল সে।

রাত্রিতে নতুন ঘরে পরিপাটী করে বিছানা করে পান খেয়ে, ভাল কাপড় পরে আলোটা কমিয়ে, চৌকীর উপর বসে পা দোলাচ্ছিল সে। চন্দ ঘরে ঢুকতেই সে বিছানা থেকে ছুটে উঠে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার হাত দুখানা জড়িয়ে ধরলে, তারপর সেই হাত দু'খানা আপনার গলায় জড়িয়ে নিলে।

স্বামীর চোখে সকৌতুক চোখ রেখে বললে—এত কষ্ট করে এই যে ঘর করলাম, কার জন্যে? বোকা কোথাকার! তোমাকে নিয়ে থাকব বলেই তো!

চন্দর উপবাস ক্লান্ত দেহ যেন দুলে উঠল, এই অপ্রত্যাশিত উত্তপ্ত সমাদরে তার চোখে জল এল। এই মুহূর্ত্তে তার মনে হল তার সেই আশ্চর্য্য মুখে কাজ নাই, প্রেমের উত্তাপে ফোটা নীল পদ্মের মত এই মুখখানাই তার যথেষ্ট। জলে—ঝাপসা চোখে সে সেই কৌতুকোজ্জল মুখখানা দুই হাতের মধ্যে নিয়ে পরম সমাদরের জন্য তুলে ধরলে। কিন্তু সে মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েই থমকে গেল সে! একি, একি, এই মুখখানা কেমন করে পাল্টে সেই মুখ হয়ে গেছে! দুই হাতে মুখখানা ধরে দুই চোখ ভরে সে দেখতে লাগল! দেখতে দেখতে তার দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল দাসীর মুখের উপর!

সে কান্না দেখে দাসীর মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে উঠে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার দুই হাতের উপর।

সে মুখ খানিতে সে শুধু দূর থেকে হাসিই দেখছিল। আজ তার দুই হাতের মধ্যে ধরা সেই হাসি মুখখানি তার প্রেমে বিগলিত হয়ে কাঁদছে। কি আশ্চর্য্য শোভা কান্নায় আপ্লুত সেই অপরূপ মুখখানির।

॥ চার ॥

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

যেন কোন্ আশ্চর্য মায়া সরোবরে এক অপরূপ পদ্মফুল জলতল থেকে মাথা তুলে অকস্মাৎ ফুটে উঠল, পর মুহূর্তেই আবার মিলিয়ে গেল জলের মধ্যে। মায়া সরোবর যেমনকার তেমনি পড়ে রইল।

সেই আশ্চর্য মুহূর্ত ক'টি আর ফিরে এল না। তাকে ফিরে পাবার জন্যে কত সাধ্য সাধনা করেছে কিন্তু সে আর তার ভাগ্যে মেলে নাই! কিন্তু সেই দিন থেকে দাসী তার কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠেছে। সে একান্ত রকম অনুগত হয়ে উঠেছে স্ত্রীর।

সেই সৌভাগ্যটুকুই বাকী ছিল দাসীর। দাসী যেন দিন দিন ফুলের মত ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু চন্দ যেমনটি চেয়েছিল তেমনটি হল না। সে চেয়েছিল সে ফুলের মধুগন্ধ ও শুভ্রতায় তার সংসার সুন্দর ও শুভ্র হোক। কিন্তু ফুল ফুটল যখন তখন চন্দ দিনে দিনে অনুভব করলে এ ফুলের রঙ আলাদা। এ রঙ অনেক বর্ণাঢ্য, এর গন্ধে মিষ্টতার সঙ্গে কোথায় একটা তীব্র কটু আস্বাদ ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

অতি সহজেই আপনার সংসারে দাসী কর্ত্রী হয়ে সংসারের হাল ধরেছে। তার হাঁকে ডাকে সংসার সন্ত্রস্ত, শ্বশুর স্বামী দুজনেই প্রসন্নভাবে তার বশ্যতা মেনে নিয়েছে। আদর আপ্যায়নে কোথাও তার ত্রুটি নাই। সেখানে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কর্ম ত্রুটিহীন। কিন্তু সেই জাগ্রত দৃষ্টির মধ্যে শুধু সমাদরই নাই, কোথায় যেন শাসনও আছে। ভাষায়ও মিষ্ট আদরের সঙ্গে কটুকথায় তিরস্কার পরতে পরতে মেশানো।

সব চেয়ে বড় কথা তার কর্তৃত্বাভিমান। রাম অবশ্য সংসারে তার যে দুটি তিনটি কাজ ছিল, তার একটি ছাড়া সবই সানন্দে পুত্রবধূর হাতে তুলে দিয়েছে। সংসার বাড়ী-ঘর গরু-বাছুর এসব দেখার দায়িত্ব আগে থেকেই আপনা আপনি

নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিল দাসী। তারপর চাষের কাজেও হিসেবের দিকে শ্বশুরকে সে সাহায্য করত। এতদিন পর্য্যন্ত রামের সব হিসেব ছিল স্মৃতিতে ও মুখের কথায়। দাসী তার বদলে খাতা-কলমের পত্তন করলে। জমির উৎপন্ন, সার ও চাষ বাবদ খরচ, ঋণ হিসেবে ধান দাদন সব রামের মগজ থেকে বেরিয়ে দাসীর খাতায় কালির অক্ষরে আবদ্ধ হল।

রাম আন্তরিক খুসী হল। শুধু তাই কেন, সে প্রায় বেঁচে গেল। খাতা-কলম করার শক্তি বা অভ্যাস কোনটাই তার নাই। আজ যখন সব বিধিবদ্ধ হয়ে দাসীর খাতায় আবদ্ধ হল তখন সে সত্যিই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। তার উদ্দেশ্য একটাই। দিনে দিনে তার সম্পদ বেড়ে উঠুক, অনেকতর টাকা হোক, অনেকতর জমি হোক, অনেকতর ধান হোক। তাতেই সে খুসী। তার ওপর নির্ভরযোগ্য স্নেহের পাত্রের হাত দিয়ে যখন সেটা ঘটেছে তখন সে আরও খুসী।

সারাদিন দাসী কাজের ছকে বাঁধা। সকালে উঠে কাপড় ছেড়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরে জল দিয়ে এসে, লক্ষ্মী পূজো করে। তারপর গরু বাছুর, ধান পান, খামার গোয়াল, দোকান, বাড়ী-বৈঠকখানা বাড়ীর সব কিছু তদারক করে এসে রান্নার জিনিসপত্র বের করে দেয় রান্নার লোককে। নিজে কুটনো নিয়ে বসে। আজকাল বাড়ীতে খাবার লোক বেড়েছে। দোকানে দু'টো লোক কাজ করে, একজন খদ্দেরকে জিনিস দেখায়, অন্যজন খাতা লেখে। চাষের জন্যেও একজন লোক রাখতে হয়েছে যদিও রাম নিজেই ঘুরে ঘুরে জমিজমা তদারক করে।

মধ্যে মধ্যে চন্দ তাই নিয়ে ঠাট্টা করে স্ত্রীকে। দাসীর সাক্ষাৎ এক রাত্রি ছাড়া সে পায়ই বা কখন। প্রথম কথা বাড়ীতে শ্বশুর আছেন, তিনি বর্ত্তমানে দিনমানে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দ্বিতীয় কথা, দাসীর সময় নাই। সে নানান কাজে ব্যস্ত অহরহই।

রাত্রিতে এক একদিন চন্দ ঘুরিয়ে কথাটা বলে—আচ্ছা, একটা কথা বলব, রাগ করবে না?

মেজাজ ভাল থাকলে দাসী হেসে বলে, মাঝে মাঝে প্রায় আব্দার করেই বলে—বল না, বল না, বল! আমি রাগ করব না! কথা দিচ্ছি রাগ করব না।

চন্দ হেসে বলে—কেন আর বাবাকে কষ্ট দিচ্ছ?

অবাক হয়ে দাসী বলে, কৌতুকের আভাষটা যায় না একেবারে,—কিসের কষ্ট দিলাম তোমার বাবাকে?

চন্দ হেসে বলে—সবই তো নিজে করছ! বাবাকে এই বুড়ো বয়সে, এই শরীরে রোদে রোদে আর কেন জমির আলের মাথায় মাথায় ঘোরাচ্ছ? তার জন্য ব্যবস্থা করলেই তো পার!

এক গাল হেসে গালে হাত দিয়ে দাসী বলে—ওমা আমি ঘোরাই বুঝি? তোমার বাবাই তো জমির মায়া ছাড়তে পারেন না। দুপুরে রোদে হুঁকো হাতে জমির মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়ান। আমি তো কত বারণ করি। বলি —বাবা, যাবেন না, যাবেন না, শরীর খারাপ হবে। আমি জমি দেখার ব্যবস্থা করছি! তা কি মানেন? তবে বাপু, একটা কথা বলি। নিজে এত কষ্ট করে জমি-জমা করেছেন। একবার করে নিজে না দেখলে কি মন মানে? তুমি তো নিজে এক ছটাক জমি কর নাই, তুমি কি করে বুঝবে ওর মনের কথা!

কিন্তু মেজাজ খারাপ থাকলে অন্য কথা। চন্দ ভনিতা করলেই সে চটে ওঠে—রাগ করব না? নিশ্চয় রাগ করব! রাগের কথা হলে রাগ করব না এ কি আব্দার?

তারপর ওই ধরনের প্রশ্ন যত নরম করেই করা হোক সে ক্ষেপে ওঠে, বলে —আমি ছিলাম তাই বেঁচে গেলে। নইলে তোমাদের বাপ-বেটার দুর্গতিতে শেয়াল-কুকুর কাঁদত! আমি ছিলাম তাই বাড়ী হল। থাকতে তো ঐ শেওড়াদের মত ঘুঁপচি শুয়োর-খুঁপরি ঘরে, মরার চাটাইয়ে শুয়ে। আমি এসে রাজার প্রাসাদ করে দিয়েছি, বাপ-বেটাকে রাজশয্যায় শোয়াচ্ছি! তবু মন ওঠে না। মনে হচ্ছে বুঝি বাপের কাছ থেকে সব হিসেব-পত্র ধান-পান কেড়ে নিয়ে আমি চার হাতে খাচ্ছি, আমার বাপ-ভাইকে দিচ্ছি, সোনা-দানা করে মাটির তলায় পুঁতে রাখছি। আমি আছি তাই হিসেব আছে, কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। আর কি, এইবার থেকে তোমরা দুই দুধো পুরুষ মানুষ ঘরে বসে খাও আর ঘুমোও; আমি পুরুষ মানুষের মত কোঁচা দিয়ে কাপড় পরে মাঠের মাথায় মাথায় ঘুরে বেড়াই দেখে—কোন্ জমিতে জল নাই, কোথায় জমিতে বালি পড়েছে, 'গোড়াল' হয়েছে, 'ভুলুক' হয়েছে, কোথায় কে জমির জল চুরি করছে, কোথায় ফসল কম হল, কোথায় কে গরুতে ধান খাইয়ে দিলে! তা না হলে তোমাদের মান-ইজ্জৎ বাড়বে কেন? তোমাদের সুখ-শান্তি আসবে কেন?

এবার কিছুদিন থেকে দাসী দোকান আর তেজারতীর দিকে অতি অলক্ষ্যে অতি সূক্ষ্মভাবে হাত বাড়িয়েছে। প্রথমটা বুঝতে পারে নাই চন্দ!

সেদিন রাত্রিতে কেমন সুন্দর করে কথাটা পাড়লে দাসী। চন্দ বুঝতেই পারে নাই তার আক্রমণের কৌশল। সেদিন রাত্রিতে ঘরে ঢুকে আলোটা কমাতে কমাতে স্বামীর দিকে পিছন থেকে আড়চোখে চেয়ে বললে—জান, আমাদের গদীতে এখন সালতামামীর সময়। এ সময় সারা বছরের লাভ-লোকসান হিসেব হয়।

পাশ ফিরে শুয়েছিল চন্দ। স্ত্রীর কথা শুনে তার দিকে ফিরে বললে—জানি বৈকি! আমরাও করি!

—কি কর তোমরা?

—কার কাছে কি পাওনা আছে, কি দেনা আছে দেখতে হয়।

—তারপর?

—তারপর মহাজনকে ধার শোধ করি, দেনদারকে দেনা শোধ দিতে বলি। সে আমাদের রথের সময়, আষাঢ় মাসে।

—কিন্তু সারা বছর ব্যবসা করে কি লাভ-লোকসান হল তা তো হিসেব কর না?

—না, তা করি না!

—তবে? আসল কাজটাই তো কর না তা হ'লে! আমার বাবার গদীতে কিন্তু করে। তারপর সকৌতুকে স্বামীর দিকে চেয়ে দাসী বললে—জান, আমিও এ বছর আমার ধানের দেনা-পাওনার হিসেব করে আমার কত মজুদ্ আছে বের করেছি।

স্ত্রীর শক্তিমত্তায় সত্যই উৎসাহিত হল চন্দ। সাগ্রহে সে বললে—সত্যি!

—সত্যি না তো কি তোমায় মিথ্যা বলছি? আমার কত মন ধান গোলায় মজুদ্ আছে জান? আটশো ছাপান্ন মণ। তাতে অবশ্য কিছু শুক্তি বাদ যাবে!

—বাহাদুর তো তুমি! খুব বাহাদুর! অকপট প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল চন্দ!

—বাহাদুর নিশ্চয়! তোমাদের তো কিছুরই কোন হিসেব থাকত না। আচ্ছা তোমার কত টাকার তেজারতি আছে বলতো? সঠিক বলবে কিন্তু! তোমাদের দোকানের হিসেবও দিতে হবে!

হিসেব দিতে হবে? কথাটা হঠাৎ যেন কানে একবার কেমন লাগল! পরক্ষণেই তার মনে হল যে নিজের কাজে এমন সুন্দর হিসেব রাখে সে অপরকে হিসেবের কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারে বৈ কি! সে বললে—আমার সে রকম কোন হিসেব থাকে না!

—ওমা সে কি কথা ? কত টাকার কারবার তোমার, বছরে কি লাভ-লোকসান হল কোন্ খতে কত উশুল পড়ল, কোন খত তামাদি হল কি না এসব দেখ না তুমি ?

একটু অপ্রস্তুত হল চন্দ—দেখি বৈ কি ! না দেখলে কি এমনি চলছে ? তবে ঐরকম ভাবে, তুমি যে রকম বলছ সে রকম থাকে না। তবে রাখব এবার থেকে !

খুসী হলেও সম্পূর্ণ খুসী হল না দাসী, বললে—তাই রাখ। কাল থেকেই আরম্ভ করে দাও।

ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুভব করে চন্দ বললে—হ্যাঁ, কালই আরম্ভ করে দেব। প্রথম খতগুলো নিয়েই কাজ আরম্ভ করব।

স্ত্রীর কথাটা খুবই ভাল লেগেছে তার। পরদিনই সে বসে গেল খতগুলো নিয়ে। একদিক থেকে ফর্দ্দবন্দী করা আরম্ভ করলে সে। কাজটা করতে করতে তার নেশা লেগে গেল। যখন খতের হিসেব মেলে না, তখন পুরানো হিসেবের খাতা বের করতে হয়। পুরানো হিসাবের খাতায় অনেক উশুল জমা নাই। যখন হিসেব মেলাতে পারলে না, তখন তাকে আর একটা হিসেব-না-মেলা খতের ফর্দ্দও তৈরী করতে হল। জটিল কাজ। প্রায় পঁচিশ বছরের ব্যাপার !

দাসী দু বার এসে উঁকি মেরে দেখে গিয়েছে। দোকানে লোক ছিল, তাই সে ঢুকতে পারেনি। শেষ যখন দুপুর গড়িয়ে এল, দোকান খালি হয়ে গেল, তখন দাসী এসে ঢুকল ঘরে। মুখে তার এক-মুখ হাসি। চন্দকে বললে—খুব হিসেব করছ দেখছি ! তা হিসেব মিলছে ?

—অধিকাংশ মিলছে। আগের, মানে প্রথম দিকের হিসেবে অনেক গরমিল।

—কেন ?

—বাবা বোধ হয় ভাল করে হিসেব রাখত না। অনেক খত পেলাম প্রথম দিকের, যা আমাদের কাছে রয়ে গেছে, কিছু করে টাকা বাকী আছে বলেই খতগুলো রয়ে গেছে। সব তামাদি হয়ে গিয়েছে।

—কতগুলো খতে এ রকম হয়েছে ?

—তা তেত্রিশ চৌত্রিশ খানা হবে। সব কুড়ি বছর আগের ব্যাপার। তখনকার হিসেবেই একুশ শো, বাইশো টাকা হবে।

—ওঃ, আজ পর্য্যন্ত সুদ ধরলে তা হলে কত টাকা হত !

—তা হত, কিন্তু সেগুলো সব তামাদি হয়ে গিয়েছে। তাতে আর কিছু হবে না।

—কে বলেছে হবে না? তুমি আমাকে একবার দিও তো। হয় কি না হয় আমি দেখব!

অবাক হয়ে গেল চন্দ। এ বলে কি? বিশ বছর আগের ভুলে-যাওয়া, আইনতঃ তামাদি-হওয়া খতে ঋণ আদায় করার কথা চিন্তা করছে দাসী। সে বললে—তা কি করে হবে? ওগুলো আমি ছিঁড়ে ফেলে দেব। ওতে আর কোন কাজ হবে না।

—বাঃ, দিলেই হল! তা বেশ, ওগুলো তুমি আমাকে একবার দাও দেখি! দাসী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তার একখানা হাত প্রসারিত করে দিলে। তার মুখে কি ছিল কে জানে, চন্দ ফর্দ্দ সমেত বাণ্ডিল-বাঁধা পুরানো খতগুলো স্ত্রীর হাতে তুলে দিলে।

ফর্দ্দসমেত বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে দাসী বললে—ও ফর্দ্দটাতো তোমার এখনও হয় নাই। হলে আমাকে ফর্দ্দটা দিও, আমি একটা নকল করে নেব।

এ ব্যাপারে তার এই আগ্রহ দেখে চন্দ বললে—তুমিই সব কাগজপত্রগুলো নাও না! এর পর থেকে তুমিই চালিও সব।

দাসী স্বামীর প্রচ্ছন্ন বিরক্তিটা গায়েই মাখলে না। সে একটা কপট ধমক দিয়ে বললে—আমি কি পুরুষ মানুষ, না তোমার মত লেখাপড়া জানি? লোকে যখন উশুল দিতে আসবে, কিম্বা যখন তামাদির আগে তাগাদা দিতে হবে, কিম্বা মামলা করতে হবে—

তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে চন্দ বললে—মামলা কিসের? মামলা হবে কেন?

—বাঃ, তামাদি হয়ে যাবে যেখানে উশুল না দিলে, সেখানে উশুল না দিলে মামলা করতে হবে না?

—এ সব তুমি কি বলছ দাসী? বাবা আমার সামান্য মানুষ ছিল, তার থেকে বাবা এত জমি টাকা করেছে, কিন্তু কোনদিন বাবাকে মামলা-মোকর্দ্দমা করতে হয়নি!

দাসী মানলে না সে কথা—ভাল কথা মামলা করতে হয়নি। কিন্তু মামলা না করে তো এই হয়েছে। এত টাকা লোকসান হয়েছে! কোনদিন করি নাই বলে কোনদিন করতে হবে না এটা তো কথা হল না। আর সে সব তো পরের কথা!

দাসী আর কথা বাড়ালে না। স্বামীর সমস্ত কাজকর্ম্ম এবং চিন্তা বিশৃঙ্খল করে দিয়ে পুরানো তামাদি খতের ফর্দ্দ ও বাণ্ডিলটা নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল—অনেক বেলা হয়েছে, এখন আর হিসেব করতে হবে না। উঠে এস, স্নান করে খাবে।

চন্দ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেললে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে সে ধীরে সুস্থে অবসন্নের মত একটি একটি করে কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ক্যাস বাক্সে তুলে, ক্যাস বাক্সটা সিন্ধুকে উঠিয়ে চাবি বন্ধ করে আসন ছেড়ে দাঁড়াল।

তার সমস্ত মনটা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে। এ কি! এ কেমন কথা? পুরানো খত, কতকালের খত থেকে টাকা আদায়! এ কি অন্যায় কথা! সে জানে সেই পুরানো কালের রাম, যে দৈত্যের মত আপনার জমিতে খেটে শস্য উৎপাদন করত, যে 'আমুতির' সময় গ্রামের সমস্ত জোয়ানদের কুস্তী লড়ে হারিয়ে দিত, যে হা-হা করে হাসত, যার বিষয় ছিল অথচ যে বিষয়-চিন্তা করত না এ তারই কাজ। গ্রামের মানুষের দুঃখের সময় টাকা ধার দিয়েছে, জোর করে তারা নিজেরাই খত লিখে দিয়েছে, তার যতটা পেরেছে খাতক আপ্রাণ শোধ করেছে, যখন পারেনি তখন রাম বলেছে—যাঃ, আর দিতে হবে না! খাতক তার মুখের কথাই আদালতের রায় বলে মেনে নিয়ে হাসি মুখে চলে গিয়েছে, খত ফেরৎ নেবার কথা একবারও তার মনে হয়নি! আজ সেই খতের জের টেনে দাসী টাকা আদায়ের চেষ্টা করবে এ কেমন কথা! এ হয় না, হতে পারে না! এ সে কিছুতেই হতে দেবে না।

সমাধান হল, তবু মনের ভার গেল না। তার কেবল মনে হতে লাগল দাসীর তো অনেক রয়েছে, তবু এ বুক-ফাটা তৃষ্ণা কেন? জমি-জমি, ধান-ধান, টাকা-টাকা! সব সময়ে তারই জন্যে যেন বুক-ফাটা তৃষ্ণায় ও মরে যাচ্ছে! এ থেকে ওকে প্রতিনিবৃত্ত করবার উপায় নাই! ওকে বোঝালে ও বুঝবে না। যেন কোন্ নেশায় পেয়েছে ওকে! আর এই নেশায় এমন আচ্ছন্ন বলেই ও কোন দিন তার মুখের দিকে ভাল করে চাইল না, তাকে বুঝবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত জাগল না ওর মনে।

মনে সেই ভার নিয়েই সে নিঃশব্দে স্নান করলে, খেলে, তারপর স্ত্রীর হাত থেকে পান নিয়ে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে দোকান ঘরে চলে গেল। দুপুরটাও সে সেখানেই কাটায়।

দাসীর মুখখানা পরিশ্রমে, ক্লান্তিতে ঘামে ভেজা, মুখের উপর মাথায় চুল

গায়ের সঙ্গে লেপ্টে লেগে আছে, মুখখানা এখনও পর্য্যন্ত অনাহারে শুকিয়ে গিয়েছে। তবু মুখে হাসিটি লেগে আছে। আহা, ক্লিষ্ট ক্লান্ত মুখের এই ক্লান্ত প্রসন্ন হাসিটুকুই যদি ওর সম্পর্কে একমাত্র সত্য হত! এর আড়ালে ওর মনের সেই নেশার মত তৃষ্ণা না থাকত! তা হলে কত কত সুন্দর হত দাসী!

আক্ষেপ করে লাভ নাই। যা হবার নয় তা হবে না। সে চেষ্টা করে নিজে একটা কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে না, কিন্তু তার চেয়েও বহুগুণ চেষ্টা করে ওর স্বভাবে এক তিল পরিবর্ত্তন আনতে পারবে না! ওকে ওর এই স্বভাব-সমেত মেনে নিতে হবে। উপায় নাই!

বিকেল হল। খরিদ্দারের ভীড় আরম্ভ হল আবার শেষ হল সন্ধ্যার মুখেই। সারা দিনের হিসেবপত্র করে কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে রাখতেই বারান্দায় এসে উঠলেন কিশোরী পণ্ডিত, বারান্দা থেকে তিনি ডাকলেন—কি হে চন্দ, আছ না কি?

সসম্ভ্রমে সে নিজের গদি ছেড়ে উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালে—আসুন, আসুন পণ্ডিত মশায়! বাবার কাছে এসেছেন দেখলাম। আমারও একটু দরকার ছিল আপনার কাছে! আপনাকে যাবার সময় ধরতাম।

কিশোরী হাসল, বললে—কি, এখন হাতে কাজ নাই?

—না। সব শেষ করেছি। আসুন, বসুন!

আর কিছু না বলে কিশোরী পণ্ডিত বসল। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেই রইল অনেকক্ষণ। চন্দ কাপড়ের থাক থেকে কাপড় বের করতে করতে আড় চোখে দেখলে পণ্ডিত মাথা হেঁট করে বসে আছে। কাপড বের করে সে বললে—কি হল পণ্ডিত মশাই?

পণ্ডিত আপনার ভাবনা থেকে চমক ভেঙ্গে মুখ তুললে, বললে—না, কিছু নয়!

চন্দ হাসল, হেসে বললে—আপনি কি ভাবছিলেন! এই সাড়ীখানা দেখে আমার নিজেরই খুব পছন্দ হল। তাই মা-ঠাকরুণের নাম করে সরিয়ে রেখেছি।

কিশোরী চমকে উঠল, তার যেন ভাবনার রেশ কাটেনি, সে বললে—কার জন্মে? ভবসুন্দরীর পূজোর জন্যে?

চন্দ একবার মনে মনে চমকে উঠল। পরক্ষণেই তার খেয়াল হল 'ঠাকরুণ'

কথাটাই শুধু পণ্ডিত মশায়ের কানে গিয়েছে। ঠাকরুণ বলতে সন্ধ্যাজলে ভবসুন্দরীকেই বোঝায়! হেসে বললে—আজ্ঞে না, আমার মা-ঠাকরুণের জন্যে!

কিশোরীও হাসল—আচ্ছা, দেবে, দাও বশ কাপড়খানা হে!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম হে!

—বলুন।

—কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে আমার আর বেশী দিন নেই। তোমার কাছে বলার এইটুকু যে আমার ঘর-সংসার থাকল। ছেলেটা ছোট, আমার স্ত্রী সাদা-মাটা মানুষ, কিছুই বোঝে না। তুমি ওদের দেখ।

কিছুক্ষণ চুপ করে পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথাটা ধ্রুব বলে যেন ধরে নিয়ে চন্দ বললে--আপনি আজ্ঞা করলেন, নিশ্চয় দেখব! আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন। আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে পণ্ডিত মশায়, আপনি আমাকে মন্ত্র দিয়ে যান।

কিশোরী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল স্থিরদৃষ্টিতে, তারপর বললে—তুমি মন্ত্র নেবে? মন্ত্র নেবার ইচ্ছা হয়েছে, প্রবৃত্তি হয়েছে? না এমনি মনে হল তাই আমাকে অনুরোধ করলে?

চন্দ বললে—আপনার কাছে লেখাপড়া শিখেছি, আপনি পিতৃবন্ধু, আপনার কাছে গোপন করব না। চারিদিক থেকে নানান ধরনের অশান্তি ভোগ করছি। তার থেকে পার পাবার রাস্তা তো জানি না! আজ এই মুহূর্তে মনে হল হয়তো ইষ্টমন্ত্র পেলে এ থেকে উদ্ধারের একটা রাস্তা পাব। তাই বললাম আপনাকে!

কিশোরী সব শুনে একটু চুপ করে থেকে বললেন—আচ্ছা মন্ত্র দোব তোমাকে! কিন্তু তার আগে পার যদি একটা কাজ কর! পারবে?

—বলুন।

--পার যদি রামকে রাজী করে বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা কর।

—কিন্তু আমরা তো ব্রাহ্মণ নই! আমাদের প্রতিষ্ঠা করা চলবে?

—খুব চলবে। না হলে আমার নামে, মানে গুরুর নামে প্রতিষ্ঠা কর। আগে মন্ত্র নাও, তারপর করবে।

—বাবাকে বলে দেখি!

কিশোরী সখেদে মাথা নেড়ে বললে—দেখ সে কি বলে! রামের আর

কিছুই ঠিক নাই হে! কি যে বলে, কি যে করে বলতেও পারি না, বুঝতেও পারি না!

চন্দ উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন? কি হল পণ্ডিত মশায়?

—তোমাকে বলব বলেই তো তোমার এখানে এলাম। এখন ভাবছি বাবা, কি তোমাকে! ·একটু। ম কিশোরী বললে—বলি শোন। তোমার শোনা দরকার।

চন্দ উৎকণ্ঠিত হয়ে কিশোরীর মুখের দিকে তাকাল।

কিশোরী কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে—বাবা, রামের মাথায় আবার ভূত চেপেছে, চাঁদ রায়ের ভিটে থেকে আবার সেই সোনা-রুপো বের করার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছে। ওকে যেমন হোক প্রতিনিবৃত্ত করা দরকার।

কথাটা শুনে চন্দের গলা শুকিয়ে গেল। কেমন ভয় ভয় করতে লাগল তার। সে একটা ঢোঁক গিলে অসহায়ের মত বললে—আমি কি করে বাবার মাথা থেকে ও দুর্ব্বুদ্ধি তাড়াব পণ্ডিত মশায়?

—কিন্তু বাবা, যেমন করে হোক পারা দরকার, পারতে হবে। তুমি জান না, তুমি তখন ছোট ছিলে। একবার রাম ঐ চেষ্টা করেছিল. করতে গিয়ে একটা মারাত্মক বিপদ ঘটিয়ে ফেললে। চরণ বলে একটা সাহী জোয়ান, ঐ নিধের বাবা, তাকে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে পাঠিয়েছিল ঐ জঙ্গলে। সে ছোঁড়া জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে পড়ে মরে গেল। তারপর সে অনেক থানা-পুলিশ, গোলমাল।

কিশোরী পণ্ডিতের কথা শুনতে শুনতে সেদিনের সেই ভয়াল স্মৃতি তার মনে পড়ল। মনে পড়ল এক সদ্য বিধবার নিদারুণ অভিশাপ. সে শিশু বলে সেদিন ক্ষমা পায় নাই। সে সেদিন ছোট ছিল, কিন্তু তার মনে আছে সব।

—শুধু তাই নয় বাবা। একটা নিরীহ লোক মারা গেল, তার সমস্ত অন্যায়টা তো অর্শাল রামকেই: তার পর থেকে রাম কেমন হয়ে গিয়েছে। যে রাম হা হা করে হাসত, সেই রামের হাসি চলে গিয়েছে। যে রাম টাকা পয়সার হিসেব করত না, সেই রাম কৌশল করে লোকের সম্পত্তি কেড়ে নেবার কথা ভাবে। এ ঠাকরুণের অভিশাপ ছাড়া আর কি বলব! আজকে আবার আমাকে হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা কিশোরী, চাঁদ রায়ের ভিটেতে সেই সোনা-রুপো সব বোধহয় ঠিক তেমনিই আছে? আমি বললাম—তা কি ক'রে জানব? কিন্তু কেন বল দেখি। তা রাম হাসতে লাগল, বললে—সব ঠিকই আছে নিশ্চয়! শুনি নাকি, চাঁদরাজার সম্পত্তি যখে পাহারা দেয়। তা

আমিই তো জ্যান্ত যখ হয়ে পাহারা দিচ্ছি। যাবে কোথা! আমি কি ভাবছি জানিস, আর একবার চেষ্টা করে দেখি। আমি তাকে বললাম—তুই কি পাগল হলি না কি? দেবতার সম্পত্তির ওপর লোভ করিস না! তা রাম হাসতে হাসতে বললে—দেবতা না কচু। অপদেবতা। ভূতের, যখের, পিশাচের সম্পত্তি কেড়ে নেব তাতে দোষ কি? বলে হা হা করে হাসতে লাগল। বললে—তোকে মিথ্যে মিথ্যে চটাচ্ছিলাম। তুই এখনো বোকা আছিস। আমি বললাম—তোর বুদ্ধি খুব বেড়েছে তা বুঝতে পারছি। বলে উঠে চলে এলাম।

কিশোরী চুপ করল! চন্দও চুপ করে মাথা হেঁট করে বসে থাকল।

কিশোরী আবার বললে—ওর কথার ধরণ দেখে আমার খুব শঙ্কা হল বাবা। কথাটা ওর মাথায় ঘুরছে। কথাটাকে কাজে চেহারা দিতে গিয়ে আবার কোন্ সর্ব্বনাশ হবে তা তো বলা যায় না। যাই হোক, তুমি একটু নজর রেখ ওর ওপর! তুমি বরং এখনি মন্ত্র নিয়ে শালগ্রাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর। তাতে ওর মনটা এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় যাবে।

—দেখি! আপনি ভালই বলেছেন। বলে কিশোরীর পায়ের ধুলো মাথায় নিলে চন্দ। কিশোরী বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে চন্দ ডেকে বললে—কাপড়খানা যে ফেলে গেলেন পণ্ডিত মশায়!

—ঐ দেখ, কথা বলতে বলতে ভুলে গিয়েছি। দাও।

রাত্রিতে শোবার সময় সে স্ত্রীকে বললে—দুটো কথা ভেবেছি, বুঝলে! তোমার সম্মতি চাই!

দাসীর মেজাজ ভালই ছিল। চন্দ হেসে বললে—মন্ত্র নেব কিশোরী পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে। ওঁরাই তো আমাদের কুল-গুরু!

কে জানে কেন দাসী খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল—খুব ভাল। আমিও নেব তো?

চন্দর দাসীর ছেলেমানুষের মত কথাটা খুব ভাল লাগল, সে বললে—নিশ্চয়! তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্র না নিলে আমার মন্ত্র নেওয়া তো সম্পূর্ণ হবে না, আধখানা নেওয়া হবে। শাস্ত্রে আছে—সস্ত্রীক ধর্ম্মমাচরেৎ।

সংস্কৃত দাসীর কাছে হেঁয়ালীর কথা, যেন কোন্ অর্থময়, ইঙ্গিতপূর্ণ, না-বোঝা গালাগালের মত। সে ভুরু কুঁচকে বললে—সে আবার কি?

চন্দ হেসে বললে—তার মানে হল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সব ধর্ম্ম পালন করতে হয়।

অহঙ্কারের দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে দাসী বললে—তুমি ঐ যে কি বললে ঐ খুব ভাল জান নয়? অনেক পড়েছ?

—কি? সংস্কৃত? হ্যাঁ, তা কিছু কিছু জানি পণ্ডিত মশায়ের দয়ায়। তুমি তা হলে রাজী? আরও একটা কথা আছে কিন্তু!

—বল। স্বামীর গলা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দাসী বললে।

—কথাটা হল, আমার বড় ইচ্ছে হয়েছে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করি। একটি ছোট পাকা মন্দির তৈরী করে তাতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করি!

কথাটা শুনে প্রায় নেচে উঠল দাসী—কর, নিশ্চয়, খুব ভাল হবে। আমার বাবা শিব-প্রতিষ্ঠা করব বলেও পারে নাই। খুব ভাল হবে।

দাসী সমস্ত জিনিসটাকে কোন দিক থেকে দেখছে এতক্ষণে বুঝতে পারলে চন্দ! ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করলে সম্পদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিষ্ঠাও বাড়বে! আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে সম্পদের এত তৃষ্ণা তার কেন? সে বাপের বাড়ীকে তার সম্পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে পরাস্ত করবার গোপন প্রতিযোগিতায় অহরহ ব্যস্ত। তবু সে রাজী হয়েছে সানন্দে এইটাই তার পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা। সে স্ত্রীকে পাশে বসিয়ে আদর করে বললে—খুব খুসী হলাম, নিশ্চিন্ত হলাম। তবে আবার বাবার মত নিতে হবে।

দাসী হাত নেড়ে বললে—তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। তার ব্যবস্থা আমি করব। কাল আমি বলব বাবাকে। আমি বললেই বাবা মত দিয়ে দেবেন।

—খুসী হলাম। কিন্তু একটা কথা। মন্ত্র নিলে দুবেলা মন্ত্র জপ করতে হবে। আর কোনও অন্যায় কাজ করতে পাবে না।

তার কথা শুনেই ফোঁস করে উঠল দাসী—আমি কি অন্যায় করি না কি?

সান্ত্বনা দিয়ে চন্দকে বলতে হল—না, অন্যায় কর বলছি না! অন্যায় করতে পাবে না। আর গুরুর কথা ভগবানের কথা বলে মনে করতে হবে, মানতে হবে।

—অমন করে শাসাচ্ছ কেন? আমি কি মানব না বলেছি? তুমি মানলে আমিও মানব।

—ব্যস, ব্যস। আর কিছু চাই না। এতেই হবে।

আবার উৎসাহিত হয়ে দাসী বললে—কখন হবে সব? কত খরচ পড়বে?

—তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তো আর এগুতে পারি না। কাল হিসেবপত্র, কথাবার্তা আরম্ভ করব।

হিসেবপত্রের কথায় দাসীর যেন আজকের সকালের কথা মনে পড়ে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, তোমার খতের সব হিসেব হয়ে গিয়েছে ?

—না। তুমি আর করতে দিলে কই ? কাল সকালে শেষ করব।

—কত টাকার তেজারতি আছে তোমার ?

—ঠিক তো বলতে পারি না। তবে পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার টাকার মত হবে!

দাসী চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে চন্দর মনে হল যেন সে বেশ খুসীই হয়েছে। চন্দ আস্তে আস্তে বললে—সকালে যে পুরানো খতগুলো নিয়ে এলে সে গুলো কই আমাকে দাও তো একবার!

—কেন ? কি করবে ?

—দাও না একবার! তার বলার মধ্যে এমন একটা সূক্ষ্ম দৃঢ়তা ছিল যাকে অস্বীকার করতে না পেরে পুরানো খতের বাণ্ডিলটা সে এনে স্বামীর হাতে তুলে দিলে।

—ফর্দ্দখানা ?

—ফর্দ্দখানা তো আমাকে দাওনি তুমি। তোমার বাক্সতেই আছে বোধহয়।

চন্দ এক এক করে সমস্ত পুরানো খতগুলো যত্ন করে দেখলে। বহুকাল আগের খত। চরণেরও খত রয়েছে একখানা। পঞ্চাশ টাকার খত। একবার মাত্র পাঁচটাকা 'উশুল' দেওয়া আছে। সে খতগুলো দেখে স্ত্রীকে ফেরৎ দিলে। বললে—রেখে দেবে ? রেখে দাও। কিন্তু খবরদার, এ-খতে যেন টাকা আদায় করতে যেও না। যদি কোনদিন সে চেষ্টা কর তবে ভাল হবে না। আমি যদি তাই করছ জানতে পারি তা হলে আমার কাছে যে সব চলতি খত আছে সব ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলে দেব। বলে রাখলাম।

তার কণ্ঠস্বরে এবং বক্তব্যে এমন কিছু ছিল যার আঘাতে দাসীর মত শক্ত মেয়েও ভয়ে পাণ্ডুর মুখে বাক্যহীন হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। শান্ত, মিতবাক, কোমল মানুষটির মধ্যে সংগোপনবাসী অন্য এক কঠিন মানুষকে যেন অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করলে দাসী।

আবার সেই শান্ত নম্র মানুষটি হাসিমুখে আপনার কাজ করে ফিরছে। দাসীর কাছে ধমক খাচ্ছে, হজম করছে, হাসছে, কখনও ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, না পেরে ধমক খেয়ে আবার চুপ করে যাচ্ছে।

তবু একটা তফাৎ কোথায় ঘটে গিয়েছে সংগোপনে। দাসী পরিষ্কার স্পষ্ট বুঝে নিয়েছে যে এই মানুষটার মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানটায় বাধা পার হয়ে আর এগিয়ে যাওয়া যাবে না। যেতে হলে সে বাধাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে হবে।

সে উপলব্ধিটা সে অবশ্য মনের অতি সংগোপনে চেপে রেখেছে। স্বামীকেও জানতে দেয়নি। সে পরমোৎসাহে মন্ত্র নেওয়া ও দেব-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মেতে উঠেছে।

তার বাবা প্রথমটায় রাজী হয় নাই। এমন কি পুত্রবধূ তার সমস্ত জোর দিয়ে বললেও রাজী হয় নাই। কিন্তু স্ত্রীর তার বাপের ওপর আধিপত্য দেখে ও স্ত্রীর যুক্তিজাল-বিস্তারের শক্তি দেখে সে অভিভূত হয়েছিল। দোকানঘরে বসে থাকতে থাকতে ওদের দুজনের আলোচনা তার কানে এসেছিল। দোকানের পিছন দিকে বাড়ীর ভিতর একটা বেশ বড় ঝাঁকড়া আম গাছ আছে। বাড়ী তৈরীর সময় দাসী তার গোড়াটা বাঁধিয়ে চুন-সুরকি দিয়ে মাজিয়ে নিয়েছিল। গরমের সময় বা রৌদ্রের সময় চমৎকার বসবার জায়গা সেটি। সেইখানে বসে দুজনে কথা হচ্ছিল।

রাম বোধহয় দ্বিপ্রহরে আহারান্তে গাছতলায় মাদুর পেতে তামাক টানছিল। দাসী জিজ্ঞাসা করলে—বাবা, আপনার ছেলে বলছিল মন্ত্র নেবে।

রাম বোধহয় অবাক হয়ে গিয়েছিল, অন্তত তার হুঁকোর ডাক বন্ধ হওয়া এবং তার কথার আচমকা ভঙ্গি থেকে তার তাই মনে হয়েছিল। রাম বললে —এ্যাঁঃ! মন্তর নেবে কেনে গো? হঠাৎ মন্তর নেবে কেনে? কি হল কি ওর?

দাসী বলেছিল—তাই তো বলছিল। আপনাকে শুধোতে বলেছে। আপনি মহাগুরু, আপনার অনুমতি না হলে তো নিতে পারবে না!

ঘরের ভিতর থেকে দাসীর যুদ্ধকৌশল দেখে মনে মনে হেসেও ছিল, তারিফও করেছিল। দাসীর বাক্য অভ্রান্ত। রাম ঘায়েল হয়ে গিয়েছে—হুঁঃ! তা নিক, মন্তর নিক! তবে অল্প বয়সে! এই বয়েসে না নিলেই পারত! কিছু দিন পরে নিলেই হত! তা তুমি কি বল?

—আপনি যেমন বলবেন। আমিও আপনার ছেলেকে তাই বলেছি!

—কি বলেছ?

—আপনি যা বলবেন তাই হবে। তবে আপনার যা বলবার তা তো বলেই দিলেন। তাই বলব আপনার ছেলেকে।

—কি বললাম ? কি বলবে তুমি ?

—বলব বাবার এখন মন্তর নেওয়া মত নয়। কিছু দিন পরে নেবে।

—আরে না, না। তা ওর যখন মন হয়েছে তখন নিক মন্তর নিক! তা তুমিও নেবে তো ?

—আপনি যদি মত দেন—

—দিলাম দিলাম। ও দুজনে এক সঙ্গে নেওয়াই ভাল, বুঝলে? তা নেবে কার কাছে ? কিশোরীর কাছে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—তা ভাল হবে। বেশ হবে।

—আরও একটা কথা ছিল।

—বল।

—আপনি ঐ সঙ্গে বাড়ীতে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করুন।

—ওরে বাবা, না, না। সে হয় না। আর তার অনেক খরচ, অনেক হাঙ্গামা!

দাসী হাসল, বললে—আপনি খালি মত দিন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি কিছু ভাববেন না।

—ঐ, বলছ কি গো, ভাবব না! এত খরচ, এত হাঙ্গামার ব্যাপার! আর না ভাবলে চলে? এখুনি তো প্রথমেই ঠাকুরের পাকা বাড়ী চাই। অত টাকা কোথা পাব ?

—আপনার ছেলে দেবে। আপনি হুকুম করলেই দেবে।

—তা তো দেবে। কিন্তু, কিন্তু—

চন্দ ঘরের ভিতর থেকেই বুঝতে পারছে বাবা তার নিমরাজী হয়ে গিয়েছে। আর একটু বললেই হয়।

দাসী এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে নিশ্চয়।

দাসী শ্বশুরকে বলতে আরম্ভ করেছে—দেখুন বাবা, আপনি কত কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমি করেছেন, জেরাত করেছেন! অনেক মেহনত করে, অনেক বুদ্ধি খরচ করে টাকা জমিয়েছেন। এ চাকলার লোকে আপনাকে মানে, খাতির করে। এখন যদি ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন নিজের বাড়ীতে তবে আপনার সে মান-সম্মান কত বেড়ে যাবে বলুন তো? আমার বাবা তো অনেক টাকা জমিয়েছে, কিন্তু আমার বাবার মত মানুষও কি

পেরেছে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে? পারে নাই। তার জন্যে মনের জোর চাই, দেবতার আশীর্ব্বাদ চাই।

রামের হুঁকো ঘন ঘন ডেকে চলেছে, সে বললে—তা ঠিক কথাই বলেছ। তা বেশ, কর তাহলে! কি খরচ খরচা হবে একবার একটা হিসেব কর!

পর দিন বেলা এক প্রহরের সময় রামের বার বার তাগাদায় অতিষ্ঠ হয়ে চন্দকে উঠতে হল। চন্দ উঠে এল হাসি মুখেই আপনার কাজ ছেড়ে। সে বাবার মনোভাবটা বুঝতে পেরেছে। বাবা বোধহয় কাল সারারাত এই দেব-প্রতিষ্ঠার মারফতে তার সামাজিক মর্য্যাদা বৃদ্ধির কথাটা কল্পনা করে উতলা হয়ে উঠেছে শিশুর মত। বাবার ঐ স্বভাব; যখন যেটা মাথায় আসবে তখনই সেটা করা চাই। চন্দ উঠে আসতেই রাম বললে—তা তোর মন্তর নেবার, ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করবার মন হয়েছে, সে বেশ কথা, ভাল কম্মের দিন দেখতে হবে, কি কি লাগবে তার ফর্দ্দ করতে হবে।

চন্দ হেসে বললে—আমিই যাই, গিয়ে ডেকে আনি পণ্ডিত-মশায়কে।

রাম অবাক হয়ে গেল, বললে—কেন, তোকে যেতে হবে কেনে? দোকানের দুটো তিনটে লোক রয়েছে, মান্দের, কৃষাণ রয়েছে, তার কাউকে পাঠা। তুই যাবি কেনে?

চন্দ হেসে বললে—পণ্ডিত মশায় গুরু হবেন, তাকে কি অন্যলোক দিয়ে ডাকা যায়? আমাকেই যেতে হবে।

যা এত দিনের মধ্যে কোনও দিন ঘটেনি সেই অতি সামান্য অথচ আশ্চর্য্য ঘটনাটা আজ ঘটল ওদের জীবনে। রাম, চন্দ ও দাসী কখনও এক সঙ্গে বসে কাজ করে নাই, পরামর্শ পর্য্যন্ত করে নাই। আজ সতরঞ্চির উপর কিশোরী পণ্ডিতকে মাঝখানে বসিয়ে দুইপাশে বসল রাম আর চন্দ। একটু দূরে আধ-ঘোমটা টেনে বসল দাসী।

রাম হাসতে হাসতে বললে—তা আমাকেও একটা মন্তর দিয়ে দিবি না কি কিশোরী?

কিশোরী হাসতে হাসতেই বললে—তোকে দিয়ে কি করব বল? তোকে আমি মন্তর দিলে কোন কাজ হবে না। মন্তর দিলে আমি তো তোর গুরু হব। মন্তর দেওয়ার পরেই তুই তো আমাকে বলবি—এই কিশোরী, দেখ তো ঠিক জপ হচ্ছে কি না? গুরুকে কি কিশোরী বলে ডাকতে হয়, না তুই আমাকে গুরু বলে মানবি? তামাক খেয়ে কলকে আমার হাতে দিয়ে বলবি—খারে কিশোরী!

সকলেই হাসতে লাগল। রাম হাসতে লাগল সবচেয়ে জোরে, হা হা করে। সমৃদ্ধ, স্বচ্ছল, নিরুদ্বেগ চিন্তাবিবর্জিত মানুষের হাসি।

কিশোরী বললে—দেরী যা হবে মন্দির তৈরী করার জন্যে। ছোট করে পাকা বাড়ী তৈরী কর

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাম বললে—সে [illegible]নেক খরচ, অনেক ফৈজৎ [illegible] খরচের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু ইঁট পাড়া, ইঁট পোড়ানো, এই সব কাজের জন্যে লোক জোগাড় করা—সে তো অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে আমি বলি কি—ঐ চাঁদ রাজার ভিটেতে অনেক ইঁট আছে, মজুর লাগিয়ে যদি ওখান থেকে ইঁট আনানো যায় তা হলে খরচও অনেক কম পড়ে, হাঙ্গামাও বাঁচে।

তার কথার মধ্যে কিশোরী অর্থপূর্ণভাবে একবার চন্দর মুখের দিকে তাকাল। চন্দ মাথা হেঁট করলে। কিশোরী কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্যে বললে—তুই পাগল না কি রে রাম? ঐ খানে ইঁট কোথায় আছে খুঁজে বের করতে গিয়ে এক আধটা লোক মরুক, তখন পুলিশ এসে সবাইকে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাবে। আর তা ছাড়া ও কি তোর সম্পত্তি যে তুই ওখান থেকে ইঁট নিবি? জমিদারের সম্পত্তি। শামলাবাদের রাজারা জমিদার হিসেবে যত গরীবই হয়ে যাক তোর সঙ্গে লড়াই করার মত শক্তি আর বুদ্ধি দুই-ই তাদের আছে। ও সব ভাবনা ছাড়, ছেড়ে সোজা রাস্তায় আয়!

ওপাশ থেকে ঘোমটার মধ্য থেকে ফিস ফিস করে সমস্যাটার সমাধান করে দিলে দাসী। দাসী শ্বশুরকে সম্বোধন করে বললে—আপনি কিছু ভাববেন না। গত বছর আমার বাবা পাকা বাড়ী করিয়েছেন। আমি, আপনি বললে, কালই জংশনে গিয়ে তৈরী ইঁট কিনে আনার ব্যবস্থা করতে পারি। কিম্বা লোকজন নিয়ে এসে এখানে ইঁট পাড়ার ব্যবস্থা করতে পারি!

কিশোরী বললে—এই তো বউমা কাজের কথা বলেছেন চমৎকার!

রাম বললে—সেই ভাল! তুমি বরং লোকজন নিয়েই এস। ইঁট এখানে পাড়িয়ে পোড়াব। তাতে খরচ অনেক কম হবে কেনার চেয়ে। বারুণীর ধারে মাটিও খুব ভাল হবে।

কিশোরী ফর্দ্দ করে ফেললে। ফর্দ্দ শেষ করে বললে—শালগ্রাম আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

এর পর মহাসমারোহে কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। রাম সকাল বেলা হুঁকো হাতে বারুণীর ধারে গিয়ে হাজির হয়, ইঁট পাড়ায়। তার কাছে ফাঁকি

দেবার উপায় নাই। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের সঙ্গে দাসী গিয়েও দেখে এসেছে। ইট পোড়ানোর পর যখন বাড়ী তৈরী আরম্ভ হল তখন দাসী সমস্তক্ষণ কাজের তদারক করে চলল।

তারপর দেব-প্রতিষ্ঠা আর মন্ত্রগ্রহণের দিন এসে গেল। দিন হল আশ্বিন-মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশীর দিন, ভবসুন্দরীর পূজার দিন!

প্রথমেই আরম্ভ হল দেব-প্রতিষ্ঠা। রাম স্নান করে পাটের কাপড় পড়ে আসনে বসেছে। এ পাশে একজন পণ্ডিত পড়ছেন গীতা, একজন চণ্ডী, একজন পড়ছেন বিরাট। তারই মাঝখানে রামের দেব-প্রতিষ্ঠা করছে কিশোরী।

এই উপলক্ষ্যে চন্দর শ্বশুর বাড়ী থেকে সকলে এসেছেন। নিমন্ত্রণ করেছে রাম সমস্ত গ্রামের মানুষকে, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে। চন্দ এ সমারোহ করতে রাজী হয়নি প্রথমটায়। পরে বাবার আর দাসীর আগ্রহাতিশয্যে তাকে রাজী হতে হয়েছে। মন্দিরের সামনে সমস্ত উঠোনটা নিমন্ত্রিত লোকজনে ভরে গিয়েছে।

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হয়ে গেলে দেব-প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হল। তারপর আরম্ভ হল মন্ত্রগ্রহণ। রেশমের কাপড়-পড়া যৌবনবতী পত্নীর পাশে গরদের কাপড় পড়ে বসল চন্দ। তার রেশমের উত্তরীয়ের সঙ্গে বধূর অঞ্চল আজ গ্রন্থীবদ্ধ। শালগ্রাম শিলার সামনে সে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে।

নানান প্রক্রিয়া, নানান জটিল মন্ত্র। অনুষ্ঠান শেষ হতে অপরাহ্ন গড়িয়ে এল। ওদিকে তখন খাওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাম চন্দের শালাদের নিয়ে খাওয়ার তদারক করছে।

অনুষ্ঠান শেষ করে প্রথমে শালগ্রাম শিলাকে, পরে গুরুকে প্রণাম করে স্ত্রীর অঞ্চলের সঙ্গে গ্রন্থীবদ্ধ উত্তরীয় কাঁধে ফেলে সে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে গুরুর নির্দ্দেশে সর্ব্বাগ্রে প্রায়-অস্তাচলশায়ী সূর্যকে প্রণাম করলে।

চোখ নামাতেই সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়ল সিঁড়ির কাছে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বয়স কত হবে সে ঠিক অনুমান করতে পারলে না তার উপবাসী ক্লান্ত, অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে। তবু মনে হল বয়স তার পঁয়ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে একটা কিছু হবে। দুই কানের পাশে রগ থেকে থেকে এক গোছা রুক্ষ পাকাচুল গালের উপর ঝুলে পড়ে দুলছে। চোখে দীন, অসহায় দৃষ্টি! মুখখানা তুবড়ে গিয়েছে। শীর্ণ চেহারা, পিঠটা যেন ঝুঁকে পড়েছে দুঃখ-ক্লেশের ভারে।

কে? চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক সে চিনতে পারছে না।

অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল। চরণের স্ত্রী, যে একদিন তাকে তার একান্ত অসহায় অবস্থায় মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা দিয়ে অভিসম্পাত দিয়েছিল।

আহা, সেই স্বাস্থ্যবতী, গৌরী, ক্রোধী মেয়েটা এমনি হয়ে গিয়েছে? আহা-হা! মমতায় তার চোখে জল এসে গেল। তার চোখের দৃষ্টি তার উপর পড়তেই সে দেখলে মেয়েটি সভয়ে সসঙ্কোচে সরে যাচ্ছে।

তার অকারণ ভয় দেখে একটা কান্নার পিণ্ড যেন তার বুকের ভিতর থেকে তার গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠে এল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলে—শোন, শোন তুমি, যেও না, দাঁড়াও।

মেয়েটি তার কথা শুনে থমকে দাঁড়াল।

সে জিজ্ঞাসা করলে—খেয়েছ তুমি? খাওনি? তুমি যাও গিয়ে ও দিকে দাঁড়াও, আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি গিয়ে।

সে স্ত্রীকে কি বলবার জন্যে মুখ ফেরালে। ঘোমটায় ঢাকা মুখখানার দিকে জলে-ঝাপসা চোখে তাকাতেই সে দেখতে পেলে বহুদিন আগে সেই এক রাত্রির আধ-অন্ধকারে শেষবার দেখা সেই অতি কমনীয়, সুকুমার, সুন্দর মুখখানি অতি কোমল সস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে, এবং তারই উত্তরীয়ের গ্রন্থীতে অঞ্চলবদ্ধ হয়ে তারই সঙ্গে সপ্তপদী করে এগিয়ে আসছে!

কাজ কর্ম্ম চুকে যাবার পরেই একদিন সে চরণের স্ত্রীকে ডেকে আনিয়ে বাড়ীতে বাসনবাজা, কাপড় কাচা, গোয়াল পরিষ্কারের কাজে বহাল করে দিলে।

সে ডেকে পাঠানোতে মেয়েটি এসে তাদের বাড়ীর বাইরের দরজায় সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তখন দোকানে। বাড়ীর দরজার কাছে অমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাসী স্বভাবতই তাকে প্রশ্ন করেছিল—কি চাই গো বাছা? অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

মেয়েটি বলেছিল—ছোট রায় মশায় ডেকে পাঠিয়েছে। তাই এসেছি।

কথাগুলো কানে যেতেই সে দোকান থেকে ভিতরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এসে দাঁড়িয়েছিল দাসীর কাছে। দাসীকে বলেছিল—ওকে আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

—কেন?

স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে সে মেয়েটিকে বলেছিল—তুমি কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে পাটকাম করবে বুঝলে?

দাসী তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আবার খাবার লোক বাড়িয়ে কি হবে? লোক আমার লাগবে না।

স্ত্রীর কথার এবার জবাব দিলে চন্দ—লোক আমার লাগবে। সেই জন্যেই আমি ওকে ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার খাটুনী কত বেড়েছে আমি তো দেখতে পাই! কানা তো নই আমি!

দাসী স্বাভাবিক ভাবেই খুসী হল। তবু মুখে বললে—ওঃ, আমার জন্যে তো ভেবে একেবারে মরে গেলে? তার পর মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললে —ছোট কর্তার যখন ইচ্ছে তখন এসো কাল সকাল থেকে।

মেয়েটা যখন চলে যাচ্ছে তখন হুঁকো টানতে টানতে রাম বাইরে থেকে ভিতরে এল। একবার মেয়েটিকে একবার পুত্র-পুত্রবধূকে দেখে নিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। সে দাঁড়াতেই দাসী ঘোমটটা আরও লম্বা করে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

—চরণার বৌ এসেছিল কেনে? হুঁকোয় একটা টান দিয়ে প্রশ্ন করলে রাম।

—মেয়েটা বড় দুঃখী। তাছাড়া আমাদের বাড়ীতে লোকজন বেড়েছে, পাটকাম করবার জন্যে ওকে বহাল করলাম।

—তা বেশ। তা ভালই! বলে হুঁকো টানতে টানতে রাম চলে গেল।

দাসীর অনিচ্ছাসত্বেও যাকে বহাল করা হল ক'দিনের মধ্যে সে-ই দাসীর অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। চন্দ অবাক হয়ে গেল দেখে। খুসী এবং নিশ্চিন্তও হল সে। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পরেই দাসী তার ছেলে নিধুর জন্যে চাকরীর সুপারিশ নিয়ে এল তার কাছে।

—আহা বড় গরীব বেচারা! দাও না ওর একটা কাজ করে! তোমার তো অনেক কাজ!

চন্দ হেসে বললে—অবাক ব্যাপার! তুমিই ওর মাকে তখন রাখতে চাওনি! তা তুমি যখন এমন করে বলছ তখন নিশ্চয় চাকরী করে দোব ওকে। আমার ডাক-হাঁকের জন্যেও লোকের দরকার। অমনি একটা অল্প-বয়সী ছেলে পেলে ভালই হবে।

—বাঃ, তা হলে আমি রবিমানীকে তাই বলে দি?

—দাও। কাল থেকে ছেলেটাকে, নিধু নাম বোধ হয় ছেলেটার, আসতে বলে দাও।

দাসী খুসী হয়ে চলে গেল।

চন্দর বড় ভাল লাগল।

পরদিন ছেলেটা বহাল হতেই রাম হুঁকো টানতে টানতে জিজ্ঞাসা করলে—ওর ছেলেটাকে শুদ্ধ রাখলি বুঝি? তা বেশ ভাল।

চন্দ তার বাবার মনোভাবটা ঠিক বুঝতে পারলে না। বুঝবার জন্যেই প্রশ্ন করলে—কেন, তুমি রাগ করলে নাকি?

রাম যেন চমকে উঠল, অদ্ভুতভাবে হেসে বললে—রাগ করবো কেনে? কি পাগল বল দেখি? বলে রাগ করেছি! এই! কি যে বলে! ভালই তো করেছিস! গরীব দু'টো খেতে পাবে! বলতে বলতে হুকো হাতে সেখান থেকে চলে গেল সে। তার কথার জবাব শুনবার জন্যেও দাঁড়াল না।

কয়েকদিন যেতেই চন্দ একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করলে। চরণের বৌ দাসীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে। সমস্তক্ষণ সে দাসীর সঙ্গে সঙ্গেই আছে। অন্যদিকে খাতকদের ডাকবার জন্যে সে ডাকাডাকি করেও নিধুকে পায় না। অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলে চটপটে পনর ষোল বছরের ছেলেটা ছুটতে ছুটতে আসে। কোথায় ছিলি জিজ্ঞাসা করলে বলে বড় কর্ত্তার গা-হাত-পা টিপছিলাম। না হয় ছেলেটার পাত্তাই পাওয়া যায় না। দাসীর কাছে খোঁজ নিলে দাসী বলে—বোধ হয় বাবার সঙ্গে মাঠে গিয়েছে। বাবা তো আজকাল একা আর মাঠে যান না। ঐ ছোঁড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

একদিন প্রয়োজনের সময় নিধুকে না পেয়ে সে খুব রাগারাগি করলে। সেদিনও নিধি রামের সঙ্গে মাঠে গিয়েছিল। মাঠ থেকে ফিরে সব শুনে রাম গিয়ে চন্দকে বললে—ওরে চন্দ, তুই বরং অন্য একটা লোক রাখ। এটাকে আমি নিলাম।

তাই হল। চন্দ খুসীই হল তাতে। তার ভয় ছিল দাসী আপত্তি করবে বলে। আবার অন্য একটা লোক রাখতে হল তাকে।

মন্ত্র দেওয়ার পর থেকে তার মনটা কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছে। সব কাজ করে, করতে হয় বলে করে। ইষ্টনাম স্মরণ করতে ভাল লাগে। সকাল বেলা একবার কিশোরী পণ্ডিতের বাড়ী যায়। কিশোরী কিছুদিন থেকে শয্যাগত নানান অসুখে। জংশন থেকে কবিরাজ এসে দেখে যাবার ও তাঁর

কাছ থেকে ঔষধের ব্যবস্থা করে দিয়েছে চন্দ। কিন্তু কিশোরীর ব্যাধির উপশম হচ্ছে না।

সেদিন দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা গড়িয়েছে সে এমন সময় চরণের স্ত্রী এসে বাইরের দরজায় দাঁড়াল সসঙ্কোচে।

ঘরে সে একা। কর্মচারী দুজন খেয়ে তাদের ঘরে বিশ্রাম করছে। সে চরণের স্ত্রীকে অমনি ভাবে দাঁড়াতে দেখে হাসি মুখে ডাকলে—কিছু বলছ না কি মা?

তবু সে কিছু বললে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে দরজার কাঠ খুঁটতে লাগল নখ দিয়ে।

অভয় দিয়ে সে বললে—বল ভয় কি?

—আচ্ছা মশায়, আপনারা আমাদের কাছে সেই পুরোনো খতের দরুন এখনও টাকা পাবে?

সে চকিত হয়ে ধড়ফড় করে বিছানার উপর উঠে বসল—কিসের টাকা পাব?

—সেই পুরোনো খতের দরুন! বৌ ঠাকরুণ বলছে সেই টাকা শোধ করতে, না হয়—বলে থেমে গেল সে।

সে শঙ্কিত হয়ে বললে—না হয়—?

সে ধমক দিয়ে উঠল—না হয় তো কি ঠিক করে বল।

ধমক খেয়ে রবিমানী বিভ্রান্ত হয়ে বললে—না হয় চাঁদ রাজার ভিটের রাস্তা বলে দিতে!

বিদ্যুত চমকের মত তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সমস্ত শরীর, বুকের ভিতরটা একটা অজানিত ভয়ে কেঁপে উঠল। এক মুহূর্ত্ত। সে নিজেকে সম্বৃত করে নিয়ে কঠোরস্বরে বললে—শোন, তোমার কাছে আমরা এক পয়সা পাব না। আমাদের কোনও পাওনা নাই। আর তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে আজকেই বাড়ী চলে যাবে। আমার বাড়ীতে আর কাজ করতে হবে না তোমাদের মা-ব্যাটার। তোমাদের যা করবার আমি করব। যাও।

এ একেবারে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা! তিলে তিলে, ধীরে ধীরে তার বাবা আর তার স্ত্রী দুজনে গড়ে তুলেছে। বুনেছে একেবারে মাকড়সার জালের মত। এরা মাতা-পুত্র ছাড়াও নিশ্চয় আরও পুরুষ আছে। তা না হলে কার্য্যোদ্ধার করবে কে? কিন্তু এ সে ঘটতে দেবে না। এ জাল সে ছিঁড়ে

দেবে। না হলে ধর্মের কাছে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হবে তার বাবা আর ঔর স্বর্গভূষাও যাবে না তা না হলে।

রাত্রিতে শোবার পূর্বে দাসী ঘরে আসতেই সে বললে—সেই পুরোনো খতগুলো আর ফর্দটা একবার দাও তো।

—কি হবে?

—যাই হোক না। দাও।

দাসী বুঝলে সেই বহুদিন-আগে-দেখা অতি কঠিন মানুষটা এই মুহূর্তে কথা বলছে। একে অস্বীকার করার উপায় নাই। সে আস্তে আস্তে সব বের করে এনে দিলে।

লণ্ঠনের আলোটা ভাল করে বাড়িয়ে দিয়ে খতগুলো ও ফর্দটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে, তারপর সবগুলি ছিঁড়ে ফেললে কুচি কুচি করে।

দাসী বিহ্বল হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে দেখলে। একটিও কথা বললে না।

সেগুলি ছিঁড়ে, কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়ে বললে—আমি চরণের বৌ আর নিধিকে আজ থেকে জবাব দিয়ে দিয়েছি। ওদের যেন বাড়ীতে জায়গা দেবার চেষ্টা ক'রো না। আর একটা কথা, যদি তোমরা শ্বশুর-পুত্রবধূতে ঐ জঙ্গলে আর লোক পাঠাবার চেষ্টা কর তবে আমি আগে ঐ বনে ঢুকে মরব এই জেনে রেখ।

সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ। বারান্দায় পায়ের শব্দ উঠছিল, পাশের ঘরে খিল বন্ধ করার শব্দ উঠল। তা হলে বাবাও সব শুনেছে! ভালই হয়েছে! তা না হলে তাকে তো আরও একবার বলতে হত।

দাসী পাশ ফিরে শুয়েছে। কাঁদছেও বোধ হয়! কাঁদুক, ওর কাঁদা প্রয়োজন! চারিদিক নিশুতি, নিস্তব্ধ। সে দাঁড়িয়েই রইল চুপ করে।

এমন সময় নীচে থেকে কম্পিত কণ্ঠে ডাক উঠল—চন্দ দাদা।

সে জানালা খুলে সাড়া দিলে সকচিত হয়ে—কে?

—আমি মুরারী। একবার এখুনি এস। বাবা কেমন করছে!

—কে, পণ্ডিত মশায়? যাই। তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি।

তা হলে পণ্ডিত মহাশয়ের মহাযাত্রার মুহূর্ত সমাগত। সে আলোটা তুলে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে—দরজা বন্ধ করে শোও।

বারান্দায় গিয়ে বাবার ঘরে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—বাবা, বাবা!

কোনও সাড়া নাই। বাবা তো এই মাত্র জেগেছিল! এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল?

সে আবার ডাকলে—বাবা, বাবা! শুনছ! পণ্ডিত মহাশয়ের যাবার সময় হয়েছে। উঠে এস!

ঘরের ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় সাড়া এল—আমি যাব না, আমাকে বিরক্ত ক'রো না।

সে মিনতি করে বললে—বাবা, তুমি কি বলছ? এই সময়ে না গেলে চলে?

আর কোন সাড়া নাই। সে আর দেরী করতে পারলে না। পথে বেরিয়ে জনহীন অন্ধকার পল্লীপথের মধ্য দিয়ে মধ্য রাত্রিতে একা যেতে যেতে তার মনে হল—সে বড একা। তার সবাই আছে অথচ কেউ নাই!

পণ্ডিত মহাশয় গত হলেন। তাঁর শেষ সময় বাইরের মানুষের মধ্যে একমাত্র সে-ই ছিল। মরবার মুহূর্ত্তে তিনি তাঁর ছেলেটির হাত নিঃশব্দে তার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন।

যখন সবাই কান্নায় ব্যস্ত তখন এসে পৌছুল রাম দাসীকে সঙ্গে নিয়ে। দাসীর গুরু, রামের আজন্ম বন্ধু, সুহৃদ। কিশোরীর মৃত্যুশয্যার পাশে কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই রাম কাঁপতে লাগল। চন্দ দেখতে পেয়ে আস্তে আস্তে তাকে ধরে বসিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পর লোক সঙ্গে দিয়ে তাদের দু'জনকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলে।

শ্মশান থেকে চন্দ যখন ফিরল তখন দুটো জিনিস তার নজরে পড়ল। রাম স্তম্ভিতের মত বারান্দায় বসে আছে। আর দাসী শুয়ে আছে ঘরের মেঝেতে পাটির উপর।

বাবাকে অমন ভাবে বসে থাকতে দেখে সে শঙ্কিত হয়ে বাবার কাছে এসে ডাকলে—বাবা, বাবা!

রাম যেন আচ্ছন্নতার মধ্য থেকে চমকে জেগে উঠে সাড়া দিলে—এঁ্যা! সাড়া দিয়ে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে আস্তে আস্তে।

—কি হল বাবা? এমন করে বসে আছ কেন?

এইবার যেন তার সাড়া ফিরে এল, সে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। বললে—কিছু হয় নাই। একবার তামাক দিতে বল।

সে কাপড়-চোপড ছেড়ে নিজে তামাক সেজে নিয়ে এসে বাবার হাতে হুঁকো ধরিয়ে দিলে। দাসী শুয়েছিল, দাসী তার সঙ্গে একটাও কথা বললে না। সেও তার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আপনার কাজে চলে গেল।

সারা দিন সে সমস্ত কাজের মধ্যে সমস্ত অবস্থাটা পাতি পাতি করে ভাববার চেষ্টা করলে। সে বুঝতে পেরেছে রাম অত্যন্ত ভয় পেয়েছে পণ্ডিত মশায়ের মৃত্যুতে। এখানে থাকলে এ ভয় ওর কাটবে না! রাত্রিতে শোবার সময় ঘরে এসে দেখলে দাসী পিছন ফিরে শুয়ে আছে। সে আস্তে আস্তে ডাকলে —দাসী! ঘুমিয়ে গেলে না কি?

কোন সাড়া নাই।

গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে সে আবার ডাকলে—দাসী! শুনছ?

তার হাতখানা আপনার হাত দিয়ে সজোরে সরিয়ে দিয়ে দাসী বললে—কালা তো হই নাই। দিব্যি শুনতে পাচ্ছি! কি বলবে বল না!

চন্দ সব বুঝলে। বুঝেও তার রাগ ভাঙাবার কোন চেষ্টা না করে বললে—বাবা কি রকম ভয় পেয়েছে দেখেছ? আমি ভাবছিলাম কি চল আমরা সবাই মিলে কিছুদিন তীর্থ ঘুরে আসি!

দাসী ঝেঁঝে জবাব দিলে—তোমার বাবা, তুমি নিয়ে যাও, আমার কি? আমি ক'দিন পরেই বাপের বাড়ী চলে যাব।

চন্দ কোন জবাব দিলে না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে শুয়ে পড়ল। তাকে বুঝবার শক্তি কি ইচ্ছা এদের দু জনের কারো নাই। দু জনেই অনবুঝ শিশুর মত আপনার তৃষ্ণার জ্বালাতেই অস্থির!

সে দমল না। পরদিন সকালে বাবার কাছে সে কথাটা পাড়লে। রাম আম গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর উপর বসে তামাক খাচ্ছিল। সে গিয়ে কাছে বসল, বললে—একটা কথা বলছিলাম তোমাকে!

রাম কোনও জবাব দিলে না, আড় চোখে একবার ছেলের দিকে তাকিয়ে তামাক টানতে লাগল।

চন্দ বললে—তোমার মনটা খারাপ হয়ে আছে। একবার চল কেন, তুমি আর আমি তীর্থ করে আসি। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা! যাবে?

যেন বারুদে আগুন লাগল। হুঁকোটা আছাড় মেরে ফেলে দিয়ে রাম লাফিয়ে উঠল—কেন হে? আমাকে তীর্থে নিয়ে যাবার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? তুমি কি ভাবছ আমার মরবার সময় কাছিয়ে এসেছে? যাও, যাও, নিজে যা করছ তাই কর গিয়ে। আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি বেশ আছি!

আবার নিঃশ্বাস পড়ল, যে নিঃশ্বাসের সংবাদ কেউ রাখল না।

অদ্ভুতভাবে চলছে তার দিনগুলো! বাবা আর স্ত্রী, সংসারে তার দুটি আপনার লোক, তাদের দু জনের সঙ্গেই বাক্যালাপ বন্ধ। এরই মধ্যে একদিন শ্বশুরকে প্রণাম করে, তাকে কিছু না বলে দাসী বাপের বাড়ী চলে গেল। তার মনে হল যেন শ্বশুর-পুত্রবধূতে এ বন্দোবস্ত হয়েই ছিল আগে থেকে।

নিস্তব্ধ বাড়ী। কোথাও কোন সাড়াশব্দ ওঠে না। দাসী নাই, কে তার কথা দিয়ে বাড়ীটা ভরিয়ে রাখবে! রাম বাড়ীতে কখন থাকে, কখন থাকে না তার খোঁজ নিয়েও সে ঠিক ধরতে পারে না। বাড়ীতে থাকলে ওপরে আপনার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। বাড়ীতে আছে কি না তাও জানা যায় না। না থাকলে হুঁকো হাতে করে কোথায় কোথায় যে ঘোরে তাও ধরবার সাধ্য নাই তার। তাকে তাই আপনার কাজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে!

এমনি একদিন সকালে সে দোকানে বসে ছিল। বেলা এক প্রহর পার হয়েছে। এমন সময় একজন মান্দের ছুটে এসে তার কাছে দাঁড়াল—ওগো ছোট কত্তা, সর্ব্বনাশ হয়েছে, ছুটে এসো গো!

সে ছুটে আসতে আসতে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল রে?

—ওগো বড় কত্তা কেমন করছে গো!

—বাবা কোথায় রে?

—বাড়ীতে আমতলায় বসেছে এসে। কোথা থেকে বাপু ছুটতে ছুটতে এল, এসে আমতলায় ধপাস করে বসে পড়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

চন্দ ছুটে গিয়ে হাজির হল রামের কাছে।

রাম যেন খানিকটা সামলে নিয়েছে। সে উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। চন্দ কাছে গিয়ে দাঁড়ানোতেও তার চেতনা হল না।

চন্দ আস্তে আস্তে পিঠে হাত দিয়ে ডাকলে—বাবা, বাবা!

রাম মুখ তুলে তাকাল এবার। লাল টকটকে চোখে উদ্‌ভ্রান্ত অর্থহীন দৃষ্টি।

—বাবা, কি হল কি?

রাম কোন জবাব দিলে না। দুই হাতে ভয়-ব্যাকুল হয়ে ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল।

অনেক চেষ্টা করে আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে গিয়ে উপরের ঘরে বিছানা করে তাকে সে শুইয়ে দিলে। শরৎ কালের দিন। তবু তার গায়ে

দুখানা লেপ চাপিয়ে দিতে হল। সে কি কম্প! খানিকটা গরম জল জোর করে খাইয়ে দিতে তবে তার কাঁপুনি কমল। রাম সুস্থির হল খানিকটা!

তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল বাবা?

রাম তার প্রশ্ন শুনে চারিপাশে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি মেলে চারিপাশটা একবার দেখে নিলে।

চন্দ তাকে নির্ভয় করবার জন্যে বললে—কেউ নাই ঘরে আমি ছাড়া। কি হয়েছিল?

অত্যন্ত শঙ্কিত মৃদু কণ্ঠে চন্দের মুখখানা নিজের মুখের কাছে এনে বললে—প্রেত! কিশোরী আর চরণ ভূত হয়েছে!

—হ্যাঁ, তা কি হল?

—ওই চাঁদ রাজার ভিটের ধারে যেই গিয়েছি অমনি কিশোরী আর চরণ দুজনে দুটো লাঠি হাতে শুকনো খালের ওধারে বড় অর্জ্জুন গাছটার ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। বাবা, সে কি চোখ! বাঘা ভাটার মত জলছে গন গন করে। দাঁত কট কট করছে। হাতের লাঠিতে কত রক্তের ছোপ। তখুনি কাকে মেরে এসেছে। আমি দেখেই ছুটে পালিয়ে এলাম।

বলতে বলতেই আবার কাঁপতে লাগল সে।

বাবার গায়ে হাত দিয়ে সে অনুভব করলে বাবার জ্বর আসছে।

জ্বরটা বিকার দাঁড়িয়ে গেল।

জংশন থেকে নিত্য কবিরাজ এসে দেখে যান। তিনি সাতদিনের দিন নাড়ী দেখে গম্ভীর মুখে বলে গেলেন সংশয়াপন্ন অসুখ। শ্বশুর বাড়ীতে দাসীকে আনবার জন্যে চন্দ লোক পাঠালে। সেখান থেকে সেই লোকের সঙ্গে গাড়ী করে তার শ্বশুর এলেন একা। তিনি বেয়াইয়ের সংবাদ নিতে এসেছেন। দাসীও সেখানে জ্বরে শয্যাগত। ভয়ের কিছু নেই। তবে জ্বর চলছে। তিনি সব দেখে শুনে বললেন— এ সময় জ্বর অবস্থাতেও দাসীর চলে আসা দরকার।

পরের দিনই জ্বর নিয়েই দাসী এল, সঙ্গে এলেন দাসীর মা। তাকে দেখাশোনা করবার জন্যে এবং যতটা সম্ভব বেযাইয়ের অসুখে জামাইকে সাহায্য করবার জন্যে।

চন্দ সমস্ত কাজ কর্ম্ম ছেড়ে বাপের মাথার কাছে বসে আছে অহরহ।

ছোটশিশুকে মা যেমন যত্ন আদর করে তেমনি ভাবে বাপের সেবা করে চলেছে চন্দ্র!

তের দিন থেকে অসুখ একটু কমে এল। বিকারের ঘোরটাও যেন কেটে গেল বলে মনে হল চন্দর। সকাল থেকে বেশ কথা বলতে লাগল রাম। সে মাথার কাছে চন্দকে দেখে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—তুই এখনও বসে আছিস? সারা রাত এমনি করে বসে আছিস? শুস নি?

চন্দ বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে মিথ্যে বললে—আমি তোমার কাছেই শুয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম। এই খানিক আগে উঠেছি।

রাম ক্ষীণ ভাবে একটু হাসল, বললে—মিথ্যে বলছিস। তোর চোখের কোণে কালি পড়েছে, মুখ শুকিয়ে গিয়েছে! সে দুর্ব্বল হাতখানা ছেলের পিঠে রেখে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

চন্দ জবাব দিলে না। রাম আবার বললে—আজ ক'দিন বিছানায় পড়ে আছি?

—আজ চোদ্দ দিন।

—চো-দ্দ দিন? বাবা! রাম চোখ বন্ধ করে মনে মনে কি হিসেব করলে। তারপর ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে বললে—তা হলে তো ঠাকরুণের পূজোর আর দেরী নাই। পূজো কবে?

—কাল।

—কাল? তাহলে তুই একবার গিয়ে ঠাকরুণের পূজোর সব বন্দোবস্ত দেখে শুনে আয়, সব ঠিক আছে কি না!

—যাব একটু পরে! তুমি তো আজ ভাল আছ! একটু পরে গিয়ে সব খোঁজ খবর নিয়ে আসব।

—হ্যাঁ, সব দেখে এসে আমাকে খবর দিস! আর বরং একটা কাজ করিস। একটা পাঁঠা ঠাকরুণের কাছে বলির জন্যে দিস আমাদের বাড়ী থেকে?

—আচ্ছা। বলে বাবার মুখ হাত ধুইয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে, বিছানা পরিষ্কার করে সে ঘর থেকে বেরুল। দাসীও ভাল আছে। আজ অন্নপথ্য করবে। ওর মা আজই চলে যাবেন মেয়েকে পথ্য দিয়ে।

চন্দ ভবসুন্দরীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হল। জমিদারের গোমস্তা উপস্থিত আছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাজ হচ্ছে। গ্রামের প্রধান ও পুণ্যাহপাত্র হিসেবে তার বাবারও একটা কর্ত্তব্য আছে।

সে যেতেই গোমস্তা সমাদর করে তাকে আহ্বান জানালে—এই, আসুন,

আসুন গো ছোটরায়! আমি ভাবলাম এবার আর আপনারা কেউ ঠাকরুণের পূজোতে আসতে পারলেন না! তা দেখছি ঠাকরুণের দয়া আছে। আজ বড় রায় কেমন আছে?

—বাবা ভাল আছে আজ!

—ঐ যে বললাম ঠাকরুণের দয়া! না হলে নিজের কাজ হয় কি করে? এবার জানেন, মহা মুস্কিলে পড়েছিলাম! কোথা নতুন ফর্সা 'অবিয়েল' (অবিবাহিতা) মেয়ে পাই! যে ঘট আনত গত বছর পর্য্যন্ত তার তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। তা ঠাকরুণের দয়া, বুঝলেন! হারার মেয়েটা, নিভা না কি নাম গো, সে মেয়েটা আজ বছর দুয়েক বিধবা হয়েছে। বিধবা হয়ে শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল। কাল হঠাৎ এসে হাজির! তাকে দিয়েই ঘট আনার ব্যবস্থা করলাম। ঠাকরুণের দয়া ছাড়া আর কি বলি! নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেন ঠাকরুণ! কাল পূজোর সময় একবার আসবেন তা হলে! বড় রায় তো ভালই আছে!

—আসব। বলে প্রণাম করে চলে এল চন্দ।

পরদিন। সারাদিন রাম ভালই ছিল। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, ভবসুন্দরীর বাৎসরিক পূজা! অন্য বছর রাম উপবাস করে। এবার রাম অসুস্থ, দাসীরও শরীর খারাপ। তাই চন্দই উপবাস করেছে।

সারাদিন রাম বেশ ভাল মনেই কাটিয়েছে। চন্দ সমস্ত দিন তার কাছেই বসেছিল। সন্ধ্যা হতেই মস্ত বড় কোণ ভাঙা থালার মত চাঁদ উঠল, চাঁদের আলোয় চাঁদা দিঘীর জল ঝলমল করে উঠল, ভবসুন্দরীর মন্দিরে ঢাক, ঢোল, ভুড়ং আর কাঁসীর সঙ্গে উচ্চ রোলে বেজে উঠল। রাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছিল। সে ব্যতিব্যস্তের মত চন্দকে বললে—যা বাবা, তুই একবার ঠাকরুণের পূজোর থানে যা!

চন্দ উঠবার জন্যে উদ্যত হবার আগে একবার রামের পায়ে হাত দিলে। হাত দিয়েই সে চমকে উঠল! একি, আবার জর এসেছে! সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা গুলো পরীক্ষা করে দেখলে, হাত-পায়ের মাথাগুলো ঠাণ্ডা হিম। জর এসেছে, এবং জর আরও বাড়বে। সে রামের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বসে পড়ল।

রাম জিজ্ঞাসা করলে—গেলি না?

চন্দ আস্তে আস্তে বললে—যাব কি, তোমার আবার জর আসছে। কবরেজকে ডাকতে লোক পাঠাই।

রাত্রি বাড়তে লাগল, চাঁদের আলো উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল, পূজার বাজনা গুরু গম্ভীর হয়ে বাজতে লাগল। অন্যদিকে রামের জ্বর বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করলে।

ক্রমে রাত্রি গভীর হল। ভবসুন্দরীর মন্দিরে বলির, তারপর আরতির বাজনা বেজে গিয়ে পূজা শেষ হয়ে গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ। রামের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চন্দ বসে বসে ঢুলতে লাগল। পাশের ঘরে দাসী নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে। সে বাবার সামান্য জ্বর হয়েছে এইটুকু মাত্রই জানে।

সে বসে বসে রামের মাথায় হাত বুলোচ্ছে আর ঢুলছে এমন সময় মনে হল নারীকণ্ঠে কে যেন ডাকছে! সে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

—ও গো কে আছ? ঠাকরুণের পূজোর পেসাদ নিয়ে যাও!

সে আস্তে আস্তে উঠে নীচে নেমে গিয়ে একটা ধোওয়া থালা সংগ্রহ করে উঠান পার হয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। দরজার কাছে প্রসাদের থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে নিভু!

সে এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল, তারপর থালাটা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললে ছোট একটি কথা—দাও।

নিভু ঠিক তারই মত এক মুহূর্ত্ত প্রাসাদের পাত্র হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় তার চোখের দৃষ্টিতে ঠোঁটের ভঙ্গিমায় কোন্ মনোভাব ফুটে উঠেছে তা দেখবার জন্যে চন্দ চোখ তুলে চাইতে পারলে না।

পর মুহূর্ত্তেই মেয়েটি হেঁট হয়ে প্রসাদগুলি থালায় তুলে দিলে মৃদু কণ্ঠে সে বললে—চান জল আছে।

চন্দ একবার মুখ তুলে চাইলে, কিন্তু কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলে না। সে ঘুরে বাড়ীর বারান্দা থেকে একটা ধোওয়া ঘটি তুলে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র প্রত্যাশায় মনটা দুলে উঠল। সে যদি দাঁড়িয়ে থাকে! সেই কমনীয় সুন্দর মুখ! সে ঘটি হাতে ফিরে দরজার দিকে চাইলে। আবছা মূর্ত্তি! সে-ই কি? সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল! জ্যোৎস্নায় মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

না, সে নয়! সে সম্বৃত হয়ে ঘটিটি নামিয়ে দিলে। মেয়েটি স্নানজলটুকু ঘটিতে ঢেলে দিয়ে পুণ্যপাত্রখানি হাতে করে চলে গেল নিঃশব্দে। চন্দ কাঠের পুতুলের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

কিছুদূর গিয়ে মেয়েটি পিছন ফিরে দেখলে সে তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। সেইখান থেকেই মেয়েটির তীব্র চাপা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকলে —এস। তারপর সমস্ত নিস্তব্ধতাকে সচকিত করে তীব্র তীক্ষ্ণ উচ্চ হাসি সুরে সুরে স্তবকে স্তবকে চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ল। কেমন একটা নিদারুণ আশঙ্কায় তার সমস্ত শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল।

এই সময়েই উপর থেকে ভয়ার্ত্ত উচ্চ চীৎকারে রাম তাকে যেন গলা ফাটিয়ে ডাকলে—চন্দ রে!

সে সাড়া দিয়ে ছুটে উপরে উঠে গেল।

সে যেতেই ভয় বিহ্বল হয়ে রাম তার গলাটা জড়িয়ে ধরে একান্ত অসহায়ের মত হয়ে বললে—ঠাকরুণ আমাকে নিতে এসেছিল রে! বলতে বলতেই সে বিছানায় এলিয়ে পড়ল।

॥ পাঁচ ॥

রাম মারা গেল পরদিন। অজ্ঞান অবস্থাতেই। আর তার জ্ঞান ফেরেনি।

কোন্ এক মারাত্মক বিভীষিকার প্রহারে তার প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে গ্রীষ্মের দিনের বালিতে জলের মত নিঃশেষিত হয়ে গেল। অনির্ব্বাণ লোভের মূল্য সে বিভীষিকা দিয়ে শোধ করে দিয়ে গেল।

চন্দের জীবনের সমস্ত উৎসাহ যেন ঐ সঙ্গে মিলিয়ে গেল। জীবনে যেন কোথাও কোন আনন্দ নাই। চাইবার কিছু নাই, চেয়ে পেলেও যেন তৃপ্তি নাই।

দাসীও সদ্য অসুখ থেকে উঠে কেমন নিষ্প্রভ হয়ে আছে। তার জীবনটাও কোথায় যেন মারাত্মক ধাক্কা খেয়ে থমকে গিয়েছে। তার জীবনের বাসনা কল্পনা যে মানুষটার বাসনা-কল্পনার সঙ্গে একসুরে বাঁধা ছিল সেই সুরটা কেটে গিয়ে তার সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

চন্দ সকাল বেলা ওঠে, মুখ হাত ধুয়ে ইষ্টস্মরণ করে দোকানে গিয়ে বসে; কাজ করে, কর্ম্ম করে। খায়, দায়, বিশ্রাম করে। আবার কাজ করে। টাকা এলে নেয়, পাওনা এলে নেয়, পাওনাদার তাগাদা দিলে দেনা মেটায়। সবটাই যেন যন্ত্রের মত। মোটকথা জীবনে সুখ নাই। সুখের তৃষ্ণা শুদ্ধ নাই যেন।

এরই মধ্যে নিধিকে আবার কাজে বহাল করেছে চন্দ। ছেলেটাকে পেয়ে তার সুবিধাই হয়েছে। ছেলেটা নিজেই চেষ্টা চরিত্র করে খাতকদের হাঁক-ডাক করে সোৎসাহে। মনিবের জন্য, মনিবের কাজের জন্য তার অহঙ্কারের সীমা নাই।

কিছুদিন ঘরে চুপচাপ বসে নিস্পৃহভাবে কাজ কর্ম্ম করবার পর সে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে নূতন পথ আবিষ্কার করলে। পথটা ধরিয়ে দিলে নিধিই।

তার এই বিচিত্র নিষ্ক্রিয়তা ও নিঃস্পৃহতা সকলেরই নজরে পড়েছিল। দাসীরও নজর এড়ায়নি। কিন্তু সে মুখে কিছু বলে নি চন্দকে। কথাটা অন্য কেউ তাকে বলতে সাহস করে নি। কথাটা একদিন তাকে বললে নিধি।

সেদিন দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর দোকান ঘরে এসে শুতেই তামাক সেজে নিয়ে নিধি এসে দাঁড়াল। তার হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে হেসে চন্দ বললে—কি রে, খুব ভক্তি দেখছি যে!

তার হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে বোকার মত হাসতে হাসতে মাথা চুলকে নিধি বললে—তা আপনকাকে কি ভক্তি করি না না কি গো?

হুঁকোটায় টান দিয়ে হেসে চন্দ বললে—তা করিস!

—তবে?

—কি তবে?

—না তাই বলছিলাম।

—কি বলছিলি?

—বলছিলাম কি, আপনকার কি হল? আপুনি ঘর থেকে বেরও না কেনে?

—কি আবার হবে? এমনি বের হই না। ভাল লাগে না! কি করব বেরিয়ে?

—তা এই চাষের সময় আসছে। নিজের জমি-টমি তো আপনকার দেখা নাই! একবার নিজের জমি-গুলান সব দেখে টেখে নাও কেনে?

চন্দর এইভাবে কথা শুনতে ভালই লাগছিল। তা ছাড়া ছোঁড়াটাকে তার ভালই লাগে। সে বললে—তুই চিনিয়ে দিবি আমাকে আমার সব জমি? পারবি?

—হাঁ। খুব! আমি মুনিষদের সঙ্গে এই ক'দিন ঘুরে ঘুরে সব চিনে নিয়েছি! আপুনি আমার সঙ্গে চল। আমি সব চিনিয়ে দোব আপনাকে।

—পারবি? সকৌতুকে চন্দ বললে।

—চলেন আমার সঙ্গে!

—আচ্ছা দেখব। কাল যাব তোর সঙ্গে!

পর দিন সকাল বেলা ঘুরে ঘুরে নিধির সঙ্গে সে আপনার জমি দেখে বেড়ালে। দক্ষিণের মাঠ, মানে পূর্ব্ব-পশ্চিম-বাহিনী বাকুনার উত্তরে সন্ধ্যাজলের দক্ষিণে জমি সব চেয়ে ভাল। সেইখানে রামের জমি সব চেয়ে বিস্তৃত। তা ছাড়া তার জমি ছড়ানো গ্রামের চারিপাশে।

দক্ষিণ মাঠের জমি দেখে চন্দ বললে—ওরে নিধে, চল, আজ বাড়ী চল।

—এই ঠাঁয়েই সব চেয়ে ভাল জমি! ই সব দেখা হল। এইবার উত্তুরের মাঠে চলেন!

—আজকে আর পারছি না। পা ধরে গিয়েছে। কাল উত্তুরের মাঠে যাব। বুঝলি!

—হোক। মাথা নাড়লে নিধি তার প্রস্তাব সমর্থন করে।

তারা দু পায়ে ধুলো মেখে বাড়ী এল। চাঁদা দিঘীর জলে হাত-পা ধুয়ে বাড়ী এসে ঢুকল চন্দ। বাড়ীতে ঢুকতে ঢুকতে মনে হল বাড়ীতেই বা কিসের আকর্ষণ আছে! কোন আকর্ষণে বাড়ীর ভিতর আসবে। দাসী কেমন যেন ম্রিয়মান। সারা দিন রাত্রে তারা দু পাঁচটা অতি প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা বলে এই পর্য্যন্ত! তা ছাড়া হাসি নাই, রহস্য নাই, ঘনিষ্টতা নাই, আনন্দ নাই, তার সঙ্গে কোন গভীরতর যোগাযোগ নাই। দু জনে এক বাড়ীতে থাকে এই পর্য্যন্ত।

বাড়ী ঢুকতেই দেখলে বারান্দায় বসে আছে দাসী, তার পাশে বসে আছেন তাদের গুরু-পত্নী, কিশোরী পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রী, তাদের মা-ঠাকরুণ। মা-ঠাকরুণ বড় সাধাসিধে, ভাল, ঠাণ্ডা মানুষ। সে ঢুকতেই দাসী মাথার ঘোমটাটা একটু টেনে দিলে। মা ঠাকরুণ আজ কাল মধ্যে-মাঝে তাদের খোঁজ-খবব করতে আসেন। চন্দও খোঁজ খবর করে তাঁর।

মা-ঠাকরুণ তাকে দেখে বললেন—কোথা গিয়েছিলে বাবা সাত সকালে?

গুরু-পত্নীকে প্রণাম করে সে বললে—আর বলবেন না ঠাকরুণ মা, নিধেবেটা ক দিন থেকে জমি দেখার জন্যে আমাকে টিক টিক করছিল। তাই আজ তার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আজ দক্ষিণ মাঠের জমি দেখে এলাম।

ঘোমটাটা আরও একটু টেনে দিয়ে দাসী একটু হাসল যেন। অন্ততঃ চন্দর তাই মনে হল। মা-ঠাকরুণ একটু হেসে বললেন—খুব ভাল করেছিলে বাবা। দেওর থাকতে তো তোমাকে কিছু দেখতে হত না! এখন দেওর নাই, এখন নিজের বিষয়-সম্পত্তি তোমাকে দেখে নিতে হবে বৈ কি!

—তা তো নিশ্চয়ই। চন্দ ঘাড় নেড়ে মা-ঠাকরুণের কথা সমর্থন করে বললে।

মা-ঠাকরুণ বললেন—বৌমার শরীর বেশ ভাল নাই। তোমার বাবা যাওয়ার পর থেকেই ভাল নাই। তা এক কাজ কর কেনে বাবা? বৌমাকে

কিছুদিন বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও। সেখানে শরীরটাও ভাল হবে, মনটাও একটু খুসী হবে। কিছু দিন থেকে আসুন সেখানে!

—তা ভাল! তা যাক। আমার আপত্তি নাই! বলে সে একটা নিঃশ্বাস ফেললে আস্তে আস্তে। তার মন যে ভাল নাই, তার যে কিছুই ভাল লাগছে না, সমস্ত সংসারটা তার কাছে যে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে এ সংবাদ তো তার অতি কাছের মানুষটিও রাখে না। এ দুঃখ সে জানাবে কার কাছে?

তাই হল। দাসমহাশয়কে লেখা হল। কয়েকদিনের মধ্যেই দাসমশাই গরুর গাড়ী দিয়ে ছোট ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন। সে এসে দাসীকে নিয়ে গেল।

নিয়ে যাবার সময় সে গাড়ির কাছে দাঁড়িযে রইল গম্ভীর ভাবে। দাসীর জিনিসপত্র গাড়ীতে ভাল করে তুলিয়ে দেবার হুকুম দিলে ও তদারক করলে। মস্ত ঘোমটা টেনে তাকে প্রণাম করে দাসী গাড়ীতে গিয়ে উঠল। একবার তার দিকে তাকালেও না, একটা বাক্যও বিনিময় হল না।

গাড়ী চলে গেল। যতক্ষণ দেখা গেল সে তাকিয়ে রইল গাড়ীর দিকে। দাসী একবারও এদিকে পিছন ফিরে চাইলে না। সে সামনের দিকে চেয়েই বোধ হয় বসে ছিল।

দু এক দিনের মধ্যেই চন্দ অনুভব করলে বাড়ীটা সত্যিই খালি হয়ে গিয়েছে। জীবনে আর সামান্য আস্বাদও অবশিষ্ট নাই।

সেদিন দোকানে বসেই সে উঠে দাঁড়াল।

একজন বড় খরিদ্দার বিদায় করেই সে ডেকে পাঠালে নিধুকে। নিধু এসে দাঁড়াতেই সে বললে—কি রে বেটা, একদিন মাঠ দেখিয়েই তোর দেখানো হয়ে গেল? যা, কি করছিলি, শেষ করে আয়। আজ উত্তরের মাঠে যাব।

মাথা চুলকে দাঁড়িয়ে গেল নিধি। একটু থেকে বললে—রোদ যে বেজায় চড়ে উঠেছে গো! এখন যাবেন?

চটে উঠল চন্দ, বললে—যাব বলেই তো তোকে ডেকেছি! এখন তুই পারবি কি না তাই বল। তোর রোদে কষ্ট হবে?

এইবার দাঁত বের করে হাসল নিধি—এ্যাই দেখেন আপুনি রেগে গেলে লাগছে! আমি কি আর নিজের লেগে বলেছি? বলছিলাম আপনকার লেগে! তা চলেন কেনে! আমি তো রোদে কতই ঘুরি!

গ্রামের উত্তরের গভীর বনবেষ্টনী পার হয়ে 'কাঁদর'। তার ওপারে

সন্ধ্যাজলের উত্তরের মাঠ। রৌদ্র চড়ে উঠেছে। মাঠে মাঠে লাঙল পড়ছে। শূন্য মাঠের আলে ঘুরে ঘুরে নিজের জমি দেখে ক্লান্ত হয়ে, নিধিকে ক্লান্ত করে সে বললে—সব তো দেখা হয়েছে, চল এবার!

ছেলেটা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দাঁত মেলে বললে—হঁ্যা আজ সব দেখেছ আপুনি! আজ কিছু বাদ পড়ে নাই। এইবার ঘর চলেন!

রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। উত্তরের মাঠে কোথাও ছায়া দেবার মত বড় গাছ নাই। নিধি বললে—তার চেয়ে এক কাজ করেন কত্তা। বনের ভেতর দিয়ে ছেঁয়ায় ছেঁয়ায় যাই।

—চল।

তারা বনের ভেতরে এসে ঢুকল। বনবেষ্টনীটি যেমন ঘন, তেমনি ছায়া-নিবিড, স্নিগ্ধ। বড় বড় গাছের সঙ্গে নানান ছোট ছোট গাছ আর লতার সমারোহ। তার মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। সেই পথ ধরে চলতে লাগল দু জনে। সে চলেছে তাড়াতাড়ি, নিধিটা পিছিয়ে পড়েছে।

এই ঘন বনের মধ্যে কারা কথা বলছে? সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়েও গেল খানিকটা।

শেওড়া পাড়ার একটি তরুণ চাষী দম্পতি। মাঠে লাঙ্গল রেখে বনের ছায়ায় জল খেতে এসেছে। খাবার নিয়ে এসেছে তরুণী স্ত্রী। একটা বড় অর্জ্জুন গাছের তলায় গাছপালা নাই, কেবল বালি। সেই বালির উপর খাদ্যের শূন্য পাত্র আর জলের ঘটি পড়ে আছে। আর তারই কাছে বসে ছেলেটি তামাক খাচ্ছে আরাম করে, হাসি মুখে। পাশে-বসা তরুণী স্ত্রীর মুখে, কোন্ গূঢ় রসসিক্ত কৌতুকে কে জানে, এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে। সেই সকৌতুক হাসি মুখে নিয়ে সে তাকিয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে। চারিপাশ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অচেতন।

সে কয়েক মুহূর্ত্ত গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের সযত্নে লক্ষ্য করলে। বড় ভাল লাগল তার।

কিন্তু তার ভাল-লাগাটুকু ভেঙে গেল নিধির কথায়—ঐ, কত্তা দাঁড়িয়ে গেলেন কেনে গো?

চমকে পিছন ফিরে চন্দ নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—তোরই জন্যে দাঁড়িয়েছিলাম। তুই যে পিছিয়ে পড়লি!

—পায়ে একটা কাঁটা ফুটে খচ খচ করছে গো! চলতে লাগছে! চলেন

তাড়াতাড়ি। বেলা হয়েছে অনেক। আপনার স্নান করতে, পুজো করতে খেতে অনেক বেলা হয়ে যাবে।

—চল।

সে আর কথা বাড়ালে না। কিন্তু সারাক্ষণ তার মনে ঐ পরিতৃপ্ত দাম্পত্যের ছবিটুকু ঘুরতে লাগল।

পরদিন নিধি এসে সকাল বেলায় আবার দাঁড়াল তার কাছে।

—কি রে? প্রশ্ন করলে চন্দ।

—যাবেন না কি জমি দেখতে? হ্যাখেন আজ কত সকাল সকাল এসেছি!

চন্দ হেসে বললে—তা দেখছি। তুই যা আপনার কাজ কর গিয়ে। আমার যদি ইচ্ছা হয় তবে আমি যাব। একাই।

নিধি চলে গেল। জমি দেখতে বের হবার কথা মনে হতেই গতকাল সেই মধ্যাহ্নে-দেখা ছায়াচ্ছন্ন নিভৃতে আপন মোহে মোহিত দম্পতিটির ছবি মনের প্রান্তে একটি সুখের আস্বাদ বহন করে ফিরে এল। এক সংগোপন প্রত্যাশা নিয়ে সে বসে থাকল। বেলা খানিকটা বাড়লে সে বের হল একা।

জমি দেখার ছলে সে এদিক ওদিক ঘুরল খানিকটা। তারপর সংগোপনে পা টিপে টিপে গিয়ে হাজির হল কালকের সেই জায়গাটিতে। একটা গাছের আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

গাছের তলাটা খালি। তা হলে কি তারা পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করে চলে গিয়েছে? না, না, ঐ তো নিম্নকণ্ঠে হাসির তরঙ্গ তুলে মেয়েটি মুড়ির পাত্রটা কাঁকালে নিয়ে, জলের ঘটি হাতে করে হাসিতে ভেঙে পড়তে পড়তে এগিয়ে আসছে। আর ছেলেটি মধ্যাহ্নের রৌদ্রদগ্ধ জনহীন মাঠের নির্জ্জনতায় এক হাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরে আনন্দ-উদ্বেল হয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসছে।

গাছতলায় এসে মেয়েটি মুড়ি ও জলের পাত্রটি নামিয়ে রেখে বসতেই ছেলেটি তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মেয়েটি তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে—শুস না, গোটা গায়ে বালি লাগবে।

তার উত্তরে ছেলেটি ফিস ফিস করে তার কানে কানে কি বললে। মেয়েটি লজ্জারুণ হয়ে বললে—যাঃ।

চন্দর আর দাঁড়িয়ে থাকতে বা দেখতে সাহস হল না। সে আস্তে আস্তে সরে গেল এবং বনবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে রৌদ্রদগ্ধ মাঠের মধ্যে পড়ল।

হঠাৎ শুনতে পেলে নারীকণ্ঠে কে যেন কাকে উচ্চস্বরে ডাকছে—ওরে ননী, তোর গরু থাকল। আমি বাড়ী চললাম রে! গরু ধর।

সে সচকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে নিভু চলে যাচ্ছে খানিকটা দূর দিয়ে। কাকে ডাকলে নিভু? ননী কে? কোথায়? চারিপাশে কোথায় কে? সে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত যে অনুভব সেই বোধ দিয়ে বুঝলে ও ডেকে তাকেই সচকিত করে দিয়ে গেল! শুধু সচকিত নয়, তাকে নিজের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে দিয়ে গেল।

ঐ তো চলে যাচ্ছে সে। সমস্ত অঙ্গ দুলিয়ে যেন নেচে যাচ্ছে মেয়েটা!

আশ্চর্য্য। মনের প্রান্তে প্রান্তে যেন আগুন লেগে বেড়াজাল হয়ে উঠেছে। মেয়েটা কি তা হলে ছায়ার মত ফিরেছে তার পিছনে পিছনে? না আলেয়ার মত আগে আগে চলছে?

ভাবতেই তার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। সে ফিরল বাড়ীর দিকে।

তার মনের মধ্যে দিনে দিনে রূপান্তর ঘটতে আরম্ভ করেছে।

সে নিঃস্পৃহ উদাসীনতায় সে এতদিন আচ্ছন্ন ছিল সেটা কেটে গিয়ে সে অতি মাত্রায় সতর্ক ও চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কয়েক বছর আগে যখন নিভুর সঙ্গে গাঢ় হৃদ্যতা ছিল তখন সে হৃদ্যতায় অনেক মনোবেদনা, অনেক হাসি, অনেক চোখের জল মেশানো ছিল। আজ এ নিভু দূর দিয়ে চলে যায়, কখনো কখনো একবার তীব্র অথবা তীর্য্যক, অথবা সকৌতুক দৃষ্টি তীরের মত ছুঁড়ে দিয়ে যায়। সে দৃষ্টি নির্ভুলভাবে বুকের ঠিক মাঝখানে বিদ্ধ হয়, বুকের রক্তে আলোড়ন ওঠে। একটা তীব্র আবেগে মস্তিষ্ক হৃদয় স্পন্দিত হয়। তাতে আগুনের মত দাহ আনে, চোখ দিয়ে আগুনের তীরের তীক্ষ্ণতার মত দৃষ্টি ফুটে ওঠে। দূর থেকে নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয়কে উদ্যত করে একীভূত করে সে দূরের চলমানাকে লক্ষ্য করে। এগিয়ে যেতে ভরসা পায় না।

এ যেন কোন্ এক আশ্চর্য্য খেলা হয়েছে।

সেদিন সকালে দোকানে বসে একজন খাতকের সঙ্গে সে কথা বলছে, খতের পিঠে টাকার উশুল দিয়ে টাকাগুলো বাক্সে তুলেছে এমন সময় সে চমকে উঠল।

অন্য কারো জানবার কথা নয় কেন চমকে উঠল সে!

রাস্তায় একটি নারীকণ্ঠ যেন কাকে জিজ্ঞাসা করছে—কি গো, কোথা চললে

এত সকাল সকাল? আমি? আমার কথা আর ব'লো না। আমি চললাম মাছের সন্ধানে! মাছ কিনব দু'পয়সার। মাছ না হলে আমি মা, আবার মুখে ভাতের গেরাস তুলতে পারি না! যা হোক চুনো-চানা দুটো আমার চাই!

তার গলা! নির্ভুলভাবে ঠিক তাকে নাচাবার জন্মেই সে যেন ছিপের সুতোয় বাঁধা অনেক দূরের তাকে একটা সকৌতুক ঘাই মেরে গেল। সে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। খাতক এবং দোকানের কর্ম্মচারী দুজন যে অবাক হল তার এই আকস্মিক ব্যবহারে তা সে ঠিক বুঝলে, বুঝেও বেরিয়ে গেল সে।

রাস্তা দিয়ে হেলতে দুলতে, আপন মনে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল মেয়েটি। তার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। সে বাড়ীর দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকল। নিঃশ্বাস আপনা-আপনি রুদ্ধ হয়ে গেল।

সে চলে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চারিপাশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর গিয়ে ঢুকল। বাড়ীর উঠোন ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে আবার দোকানে এসে নিজের জায়গায় বসল।

ছলনা করে আপন মনেই বকতে বকতে ঢুকল সে—হুঃ, দুটো গোরু ঢুকেছে বাড়ীর ভেতর, অথচ কারো কোন খেয়াল নাই সে দিকে। গোরু দুটো নির্ব্বিবাদে গমের আঁটি টেনে টেনে খাচ্ছিল। কেউ দেখেনা!

কর্ম্মচারী দুজন অবাক হয়ে মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল!

চন্দ অনুভব করলে তার কথায় কোনওখানে যেন একটা ফাঁকির গন্ধ পেয়েছে ওরা। সে সঙ্গে সঙ্গে কাজে তৎপর হয়ে উঠল, বললে—কৈ, যে হিসেবটা তৈরী করে রাখতে বলেছিলাম, করেছেন?

কর্ম্মচারিটি সঙ্গে সঙ্গে সেটা বের করে দিলে তাকে। এই হিসেবটা সে পাঁচদিন তাকে দেখাতে চেয়েছে, অন্য সময় দেখব বলে সে বারে বারে সরিয়ে তারই হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এমনি করে চলবে কত দিন?

এ ছলনার অবসান সে ঘটাবেই।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে, সূর্য্য তখনও অস্ত যায়নি। রাঙা আলো তখনও ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। সে দোকান বন্ধ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। সে আজ সারাদিন এ পথ দিয়ে যায়নি। দিনের সমস্তক্ষণ সে প্রতি মুহূর্ত্তে সতর্ক হয়ে থেকেছে সেই কৌতুকগর্ভ, নৈর্ব্যক্তিক অথচ অতি প্রত্যক্ষ আহ্বানের

জন্ত। প্রভাতে প্রত্যাশা করেছে, শুনতে পায়নি; মধ্যাহ্নে আলস্যের মধ্যে প্রত্যাশা করেছে, সে প্রত্যাশার পূরণ হয়নি। তারপর প্রত্যাশায় ক্লান্ত হয়ে সে কাজ শেষ করে বাড়ীর ভিতর চলেছিল। এখন গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যা করবে, ইষ্টনাম স্মরণ করবে। এমন সময় পথের প্রান্তে তাকিয়ে দেখলে সন্ধ্যার রাঙা আলো সারা গায়ে মেখে সে চলে আসছে। বহুকাল পরে আজ সে তাকে সামনে থেকে দেখলে। বিগাঢ়যৌবনা, গৌরী। নিজের উজ্জ্বল যৌবনের গর্ব্বের মদমত্ততা তার প্রতি পদক্ষেপে। কিন্তু তার দুই চোখের দৃষ্টি যেন অর্থহীন, তাকে যেন দেখছেই না। অথচ সে জানে যদিও ওর দৃষ্টি অর্থহীনভাবে দূরের কোন একটা বস্তুতে নিবদ্ধ তবু ওতো তাকে দেখছে না; ওর মনোযোগ আবদ্ধ তার উপরেই। সে আস্তে আস্তে তার সামনে দিয়ে তাকে তেমনি না দেখার ভান করে মন্থর পদক্ষেপে সর্ব্বাঙ্গ দুলিয়ে চলে গেল। আজ আর কোন উচ্চ শব্দে সে স্থানটাকে চকিত করলে না। সে নিঃশব্দে তাকে পার হয়ে চলে গেল।

সমস্ত জায়গাটার মধ্যে একটি মানুষ নেই। সে দাঁড়িয়ে সমস্তক্ষণ তাকে লক্ষ্য করলে। তারপর সে যখন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে তখন কম্পিত জর্জর দেহে বারান্দা থেকে নেমে তাকে অনুসরণ করলে। ঐ যে মেয়েটা চলে যাচ্ছে অনেকখানি আগে আগে। ও পিছন ফিরে দেখেনি একবার, তবু অভ্রান্তভাবে বুঝেছে সে তাকে অনুসরণ করছে।

মেয়েটা ভবসুন্দরীর মন্দিরের কাছে বাঁক ফিরল। আর দেখা যায় না তাকে। দ্রুত এগিয়ে গেল চন্দ। বাঁকটা ফিরেই দেখলে মেয়েটা থমকে দাঁড়িয়ে আছে। সে বাঁক ফিরতেই তার দিকে না তাকিয়েও সে আবার দ্রুত পায়ে চলতে আরম্ভ করলে। তারপর সোজা গিয়ে ভবসুন্দরীর মন্দিরের পিছনের আমবাগানে ঢুকে পড়ল। তারপর আমবাগানের অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

সে তাকে ধরবার জন্যে ছুটতে আরম্ভ করলে। ছুটতে ছুটতে এসে সে দাঁড়াল আমবাগানের প্রান্তদেশে। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমবাগানের মধ্যে তাকালে, খুঁজতে লাগল কোথায় সে।

অকস্মাৎ শুনতে পেলে আমবাগানের মধ্যে কে যেন কাকে বলছে—বাবা, কি অন্ধকার। বড় খাস আমের গাছের তলাতে দাঁড়িয়েও গাছের নীচু ডালের পাতা দেখতে পাই না।

মনটা তার অত্যন্ত লঘু হয়ে উঠল। সে কোন্ খানে দাঁড়িয়ে আছে তার

হদিস দিয়ে দিলে তাকে। তাকে আহ্বান করছে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে। আর যেতে বাধা কি?

সে ছুটে অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কয়েক পা ছুটেই কিসে ধাক্কা খেলে সে। চমকে থেমে গেল সে। কি? কি ওটা? গাছের শিকড়।

অকস্মাৎ একটা কথা মনে হল। আবার যদি আজ এগিয়ে ছুটে গিয়ে নিভুকে দেখতে না পায়! তার বদলে যদি সেই আকস্মিক কদাচিৎ-দেখা মুখখানা তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলে তাকে? নিদারুণ ভয়ে তার কামনা-জর্জ্জর উত্তপ্ত দেহে একটা ঠাণ্ডা কম্পন বয়ে গেল। একটা অলৌকিক অতি ভয়াল পরিণামের কল্পনা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেললে। সে পিছন ফিরে ছুটতে আরম্ভ করলে। বাগান পার হল, ভবসুন্দরীর মন্দির পার হয়ে নিজের বাড়ীতে এসে ছুটে ঢুকে পড়ল।

গোয়ালে গোরু বেঁধে হাত ধোবার জন্যে বেরিয়ে আসছিল নিধি। মনিবকে অমনিভাবে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে সে ছুটে তার কাছে এগিয়ে গেল। অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল কত্তা? ভয় লেগেছে না কি?

সে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় থেকে বেঁচে গিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ!

ছেলেটা তিরস্কার করে বললে—দেখেন দেখি! যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন! কোথা কখন ঠাকরুণের সামনে পড়ে যাবেন। ঠাকরুণের কোপ লাগবে!

সে ততক্ষণে সহজ হয়েছে। আস্তে আস্তে বললে—এক ঘটি জল আনতে বলতো?

জল এলে খানিকটা খেয়ে, খানিকটা মাথায়-মুখে দিয়ে তবে সুস্থির হল সে।

নিধি চলে গেল। সে শালগ্রামের মন্দিরে গিয়ে ইষ্ট স্মরণ করবার জন্যে উঠল।

পরদিন বেলা এক প্রহর হতে না হতে একখানা ছৈ-বাঁধা গোরুর গাড়ী এসে তার বাড়ীর সামনে খামারে ঢুকল। তার থেকে দুই পাটি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে নেমে এল নিধি। তার পিছনে পিছনে ঘোমটায় মুখ ঢেকে নেমে এল দাসী। সে ঘোমটার আড়াল থেকে একবার সকৌতুক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

মাথা চুলকে নিধি চন্দকে বললে—কাল আপনার অমনি ভয় দেখে আর থাকতে পারলাম না কত্তা। গিয়ে ঠাকরুণকে নিয়ে এলাম।

বাড়ীর ভিতর গিয়ে চন্দ দাসীকে দেখতে পেলে না। রান্নার মেয়েটি বললে—বৌ-ঠাকরুণ ওপরে গিয়েছেন আপনার ঘরে।

সে উপরে শোবার ঘরে ঢুকতেই দাসী হাসি-ভরা মুখে তাকালে তার দিকে। সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছিল তোমার?

এ দাসী যেন আগের দাসী নয়। এ আবেগ তার গলায় এসে আটকে গেল। সে গম্ভীরভাবে বললে—বলব, সব বলব তোমাকে। তবে তুমি এসে খুব ভাল করেছ!

সকৌতুকে হেসে দাসী বললে—খুব ভাল করেছি, না? সে নিজের হাত দুখানা প্রসারিত করে বাড়িয়ে দিলে স্বামীর দিকে। চন্দর মুখখানা দুইহাত দিয়ে আপনার বুকের সঙ্গে চেপে ধরলে, আপনার মুখখানা চন্দর মাথায় গুঁজে দিলে।

দুই হাতের বন্ধনে চন্দকে ধরে ধীরে ধীরে সব শুনলে দাসী একে একে। শুনে সে রাগ করলে না, হাসল কৌতুক করে। বললে—ওমা, তোমাকে দেখে তো এমনি বেশ সাধু-মহান্তর মত লাগে! তোমার ভেতরে ভেতরে এঁত?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ বললে—আমিও তো মানুষ দাসী!

এক মুখ হেসে দাসী বললে—সেই কথাই তো বলছি গো! তুমি যে মানুষ সে কথাটা কি আমাকে এর আগে কোন দিন বুঝতে দিয়েছ! তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে ঘর করে মনে হয়েছে তুমি সাধু-মহাত্মা লোক! তা তুমি তো এর মধ্যে একবার শ্বশুরবাড়ী গেলেই পারতে।

—তা পারতাম। কিন্তু গেলেই তো ঝগড়া হোত। নিজের বাড়ীতে ঝগড়া করি, বেশ করি। আবার পরের বাড়ীতে গিয়ে ঝগড়া করলে সেটা তাদের ভাল লাগত না। তোমার আমারও ভাল লাগত না।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে দাসী—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমাকে আর বকতে হবে না। আর ঝগড়া করতে হবে না। বলে স্বামীকে গাঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরলে।

সেই আরম্ভ।

তারপর কোথা দিয়ে কত কাল সুখ-স্বপ্নের মত কেটে গেল তার হিসাব

আর চন্দ রাখেনি। একখানি সুকুমার, কমনীয় অপরূপ, সুন্দর মুখ তাকে কখনও কখনও অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে, তার সঙ্গে বিচিত্র কৌতুক করে দূরে সরে যেত। সে মুখখানিও ভুলে গিয়েছে সে! সে স্মৃতি পয়সার ছবির মত কালের ঘর্ষণে শুধু বিলুপ্তই হয়নি, সে ঘষা পয়সাটাও যেন হারিয়ে গিয়েছে। তার জন্মে আকুতি দূরের কথা, সে মুখখানিও স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

তবে সে সুখী হয়েছে। দাসীকে নিয়েই সুখী হয়েছে। অন্য এক সুন্দর আশ্চর্য্য মুখের আর প্রয়োজন নাই তার। দাসীর মুখেই যে প্রেমের লাবণ্য সে মাখিয়েছে তাই দেখেই সে মুগ্ধ। দাসীই চালিয়ে নিয়ে চলেছে তাকে।

এরই মধ্যে প্রথম সন্তান উপহার দিলে তাকে দাসী। খানিকটা বয়সে সন্তান সম্ভাবনা। তার মা বার বার করে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। শাশুড়ীর অনুরোধে বিচলিত হয়ে, সমস্ত দিক বিবেচনা করে, সেও বার বার অনুরোধ করেছে দাসীকে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে। কিন্তু দাসী বার বার সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে। হেসে বলেছে—কেন, আমি গেলে তোমার কিছু সুবিধে হবে না কি বল দেখি? না, আমাকে আর সহ্য হচ্ছে না?

বোকার মত অসহায় হাসি হেসে চন্দ বলেছিল—এই, তুমি কি যে বল, তার কোনও ঠিক নাই। তুমি গেলে আমার আবার সুবিধা হয় না কি?

—তবে? তবে আমাকে বার বার যাও যাও করছ কেন? হেসেই বলেছিল দাসী কথাগুলো।

—তোমার ভাল'র জন্যেই বলছিলাম। চন্দ বললে যেটা তার না বললেও চলত।

হাসির সঙ্গেই কথাটা শেষ করে দিয়েছিল দাসী। বলেছিল—আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি না বুঝলে? আমি চলে যাই আর তুমি আবার গোলমাল বাধিয়ে বসে থাক! সেটি হতে দিচ্ছি না। আমার ছেলে এইখানেই হবে। তুমি কিছু ভেবো না। সময় হলে আমি মাকে লিখব। মা এসে থাকবে এক দু'মাস। তা হলেই তো হবে।

ছেলে হল। পুত্র সন্তান। তবে দেখতে ভাল নয়। জ্ঞানেন্দু।

ছেলে যখন বছর পাঁচেকের হল তখন দাসী একদিন চন্দকে বললে—ওকে এইবার আমি জংশনে আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব। আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি। মা-ই আমাকে বার বার বলেছে। গেনু এখন থেকে ওখানে থাকবে, লেখাপড়া করবে।

চন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে এর জন্তে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু দাসীর বাক্য লঙ্ঘন করা তার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। তার উপর দাসীর যুক্তিও অকাট্য। সে আমতা আমতা করে বললে—সে তো ভাল কথা। তবে আর দু এক বছর পরে দেবে। একটু বড় হোক। তা না হলে তোমাকে আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কেন?

—খুব পারবে! আর বড় হয়ে গেলে লেখাপড়া শিখে পাশ করবে কবে? বুড়ো বয়সে? তুমি দিন ঠিক কর, আমি পাঁজি এনে দি।

তাই হল। দিনও ঠিক হল, তারা দুজন ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে জংশনে মামার বাড়ীতে রেখে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দিয়ে এল।

তারপর হল ধ্যানেন্দু।

আজকাল তার জীবনটা দাসী যেন কেমনভাবে নিজের পছন্দমত গড়ে নিয়েছে সে জানতেও পারেনি। হিসাবপত্র সবই দাসী খুটিয়ে দেখে। টাকা কড়িও রাখে সে-ই। সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য করে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে মন্দিরে গিয়ে শালগ্রাম শিলাকে প্রণাম করে এসে বাড়ীঘর ঘুরে দোকানে গিয়ে বসে। কিছুক্ষণ পর ভিতরের দরজায় অল্প ঘোমটা টেনে এসে দাঁড়ায় দাসী। কোন কোন দিন ছোট ছেলে এসে তাকে হাত ধরে টানতে শুরু করে, বলে—এস, খাবে। মা ডাকছে।

এর পর আর কথা নাই। যত জরুরী কাজই তার থাকুক হাতের কাজ ফেলে উঠে যেতে হয় তাকে। দাসী অপেক্ষা করে আছে। উঠে না গেলেই বিপদ। দাসী হয়তো রাগ করে তাকেও খেতে দেবে না, নিজেও খাবে না।

উঠে গিয়ে আসনে বসতে হয়। ঠাকুরের বাল্যভোগের প্রসাদ। একটু সরবত, একটু মুগ ভিজে, একটু ছোলা ভিজে, একটু ছানা, একটু চিনি, সঙ্গে দু এক কুচি সময়ের ফল সযত্নে পাথরের থালায় রাখা। সব খেয়ে ও ছেলেকে একটু একটু খাইয়ে তবে ছুটি।

তারপর একবার জমি দেখতে বেরুনো আছে। নিত্য-নৈমিত্তিক চাষের সংবাদ রাখে দাসী। রামের সময় রবি ফসলের চাষ খুব ছিল না তাদের। এখন সে চেষ্টা করে রবি ফসলের বৃহৎ চাষ আরম্ভ করেছে। এ চাষ থেকে আগে শুধু খাবারই সংস্থান হত। এখন পয়সাও আসে। নতুন আলু, কপি তার সকলের আগে ওঠে, লোক নিয়ে যায় জংশনে, বিক্রী করে নগদ পয়সা থলি ভরে নিয়ে আসে।

চাষের মধ্যে বাইরের তদারকের ভারটা তার। রবি ফসলের পক্ষে

বারুণীর তীরে দক্ষিণ মাঠের জমি সব চেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু সেখানে আর জমি নাই। যা আছে সেটুকু লোকে সম্পদের মত রক্ষা করে রেখেছে। তাই টাকা থাকলেও কিনতে পারা কঠিন। কিন্তু দাসী জেদ ধরে পড়ল ঐখানে জমি তার চাই-ই চাই। কেমন করে চন্দ সংগ্রহ করবে তা সে জানে না। কিন্তু জমি, অন্ততঃ চার পাঁচ বিঘে জমি, ওখানে বারুণীর ধারে তার চাই-ই। যে টাকা তাতে লাগে সে দেবে।

চন্দ ভেবে কূল-কিনারা পেলে না। শেষে বুদ্ধিটা তাকে জুগিয়ে দিলে নিধি। একদিন দাসীর সামনেই সে বললে—বৌ ঠাকরুণ যখন জেদ ধরেছেন তখন জমি করার রাস্তা আমি দেখিয়ে দেব। কত্তাকে করে নিতে হবে।

পরদিন ভোর বেলা নিধি তাকে নিয়ে গেল দক্ষিণের মাঠে। বারুণীর তীর ধরে ধরে তারা এগিয়ে চলতে লাগল। চাষের মাঠ শেষ হয়ে গিয়ে চাঁদ রাজার ভিটে আরম্ভ হল। সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল নিধি।

নিধি দেখাতে লাগল—এই দেখেন কত্তা, এক দিকে আপনার নদী, আর এক দিকে চাঁদরাজার ভিটে। মাঝখানে এই যে পতিত জমিটা পড়ে আছে খালের ধার পর্য্যন্ত, এইটা কাটিয়ে জমি করান কেনে! আগে জমিদারের গোমস্তার কাছে বন্দোবস্ত করে নিয়ে তা বাদে মাটিতে চোট দেন। তবে কেউ যেন জানতে না পারে। জানতে পারলেই লোক ঝুঁকে পড়বে। দাম বেড়ে যাবে, জমিটা হাত ছাড়াও হয়ে যেতে পারে।

চন্দ বললে অবাক হয়ে তোর বুদ্ধি আছে তো? তা তুই যা কাল গোমস্তার কাছে। আমি চিঠি দি, দিলেই আসবে আমার কাছে। আমি অনেকগুলো টাকা পাব ওর কাছে।

সেই ব্যবস্থাই হল। গোমস্তাকে নিয়ে এল নিধি সঙ্গে করে। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

গোমস্তা বললে—তা মাত্র এই ক' বিঘে জমি শুধু কেন কিনবেন। সন্ধ্যাজলের জমিদারী সত্ত্বটাও কেন কিনে ফেলুন না!

লোভে চন্দর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। সে একটু চুপ করে থেকে বললে—কত দাম?

গোমস্তা চতুর ব্যক্তি, সে বললে—আদায় আপনার তের শো' টাকা, কলেকটরী সেস সব নিয়ে সরকারকে দিতে হয় ছ'শো' নব্বই টাকা. আদায়ের খরচা, গোমস্তার মাইনে সরঞ্জামী সবমিলে একশো টাকা। এই আপনার সব

সমেত হল সাতশো নব্বুই মানে আট শো টাকা। পাঁচশো টাকা নীট্ মুনাফা। তা হলে ধরুন দাম হবে দশ হাজার টাকা! আপনার জন্যে বলে কয়ে আমি ন' হাজারে করে দেব। আমাকে দুশো টাকা দেবেন মিষ্টি খেতে।

চন্দ থমকে গেল। অত টাকা সে কোথায় পাবে? তা ছাড়া ব্যবসা এবং মহাজনী থেকে এত টাকা একসঙ্গে তুলে আনলে ব্যবসার ক্ষতি হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিশগুণ পন দিয়ে কেনারও কোন অর্থ হয় না। তার চেয়ে সুদে খাটালে লাভ অনেক বেশী। সে চুপ করে রইল।

গোমস্তা ঠিক বুঝতে পেরেছে তার দ্বিধার কারণ। সে হেসে বললে—আপনার তো টাকার অভাব নাই গো! ভবসুন্দরীর দয়ায় আপনার তো অনেক আছে!

চন্দ কুণ্ঠিত হয়ে হাসল, বললে—না, আমার অত টাকা নাই। এই জায়গাটাই আপনি আমাকে ব্যবস্থা করে বন্দোবস্ত করে দেন। তা হলেই হবে। যদি আমার কখনও টাকা হয় আর এ সম্পত্তি তখনও বিক্রী করার কথা হয় তখন দেখা যাবে।

গোমস্তা চতুর হাসি হেসে বললে—বেশ, আমার আর আপত্তি কি? তবে চাঁদ রাজার ভিটের নীচের মাটি, ওখানে জমি করবেন। তাতে আবার মন খুঁত-খুঁত করবে না তো?

—নাঃ, আমি জায়গাটা ভাল করে দেখে এসেছি। চাঁদ রাজার ভিটের ঠিক নীচেই বটে, তবে ভিটের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

—তা বেশ, আমার আর আপত্তি কি? আপনার মন খুঁত-খুঁত না করলেই হল!

জমি কেনা হয়ে গেল। রেজেষ্ট্রী শুদ্ধ হয়ে গেল দলিল।

দাসীর আর তর সয় না। রেজেষ্ট্রী দলিলখানা বাক্সে বন্ধ করে এসে সত্ত জংশন-ফেরত স্বামীকে জল খেতে দিয়ে সে কেবল একবার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলে—তুমি বাবা-মা-দাদাদের সঙ্গে দেখা করেছিলে?

হেসে চন্দ বললে—তা করেছিলাম বৈ কি! তা ছাড়া সেখানে আমার প্রাণটুকু রাখা আছে।

দাসী হাসল খুসী হয়ে—গেনু কেমন আছে?

চন্দ বললে—গেনু ভাল আছে। বেশ মন পাতিয়ে পড়ছে। এবার যে পরীক্ষা হয়েছে তাতে প্রথম হয়েছে গেনু।

দাসী উঠে চলে গেল। ফিরে এল পাঁজি নিয়ে। চন্দর হাতে দিয়ে বললে

—দেখ দিন দেখ। জমি কাটানো কবে আরম্ভ করবে দেখ! ও জমি থেকে এবার ধানের দামে আমাকে খরচার টাকা তুলে আনতে হবে না?

চন্দ হাসল। তৃপ্তির হাসি। বললে—তুমি আমার লক্ষ্মী! তারপর পাঁজির পাতা ওলটাতে লাগল।

চন্দর কপাল ভাল। তার চেয়ে দাসীর পয় বেশী। জমি কাটবার আগে আবার ভাল করে মাপ করতে গিয়ে সাড়ে চার বিঘের জায়গায় জমির পরিমাণ দাঁড়াল পৌনে ছ' বিঘের মত। মাপ হল একেবারে বারুণীর খালের ধার পর্য্যন্ত। তাতে আর একটা সুবিধা বেশী পাওয়া গেল। খালের থেকে নির্ব্বিবাদে সিচের কাজ চলতে পারবে টানের সময় খুব ভাল ভাবে।

জমির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সবাই খুসী। অবাক কাণ্ড! এমন তো সচরাচর ঘটে না।

জমি যারা মাপছিল তারা চন্দর কপাল এবং তার স্ত্রীর পয়ের কথা উল্লেখ করলে বার বার করে।

বাড়ী ফিরবার সময় নিধি সংগোপনে বললে—ও কর্ত্তা, আমি গোমস্তাকে যে লগিটা দিয়েছিলাম সেটা টুকচা বড় ছিল গো! আর আমিই তো মেপে-ছিলাম! তুমি কি ভাবছ গোমস্তা ও জানত না? বৌ-ঠাকরুণের কাছ থেকে নগদ পঞ্চাশ টাকা তার ট্যাঁকে আমি গুঁজে দিয়েছি, তবে গিয়ে জমির মাপ বেড়ে গিয়েছে! বৌ-ঠাকরুণের বুদ্ধির কাছে কেউ দাঁড়ায় না!

চন্দর একটু খারাপ লাগল, তবু জমির পরিমাণটা বাড়ার জন্যে সে খুসী আন্তরিকভাবেই। সে হেসে নিধির পিঠে একটা সস্নেহে থাপ্পড় দিয়ে বললে—তুমি বেটার বদবুদ্ধিও কম নয়!

জমি কাটানো আরম্ভ হল।

প্রায় জন ত্রিশেক মজুর কাজে লেগেছে। মাটির চেহারা পাল্টে যাচ্ছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে। চন্দরও একটা নেশা লেগে গিয়েছে। সে সকালে একবার, বিকেলে একবার জমির মাথায় গিয়ে বসে। নিধি সর্ব্বক্ষণই লেগে আছে এই কাজে। সেই জন্যে চন্দ তার নাম দিয়েছে—বৌ-ঠাকরুণের চাষবাবু। চাষবাবু বললেই যথেষ্ট হত, কিন্তু স্ত্রীকে খুসী করার সুযোগটুকু ত্যাগ করে নাই সে।

খালের উল্টো দিক থেকে জমি কাটা আরম্ভ হয়ে খালের ধারে এসে গিয়েছে মজুররা। অনেক হিসেব করে এখানটায় কাটিতে হবে। তা না হলে যদি জমি গভীর হয়ে খালের জলের তলের চেয়ে নীচু হয় তবে মুশকিল হবে।

সেই জন্যে এখন বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন; চন্দের তাই জমি কাটার তদারক করতে অনেকক্ষণ থাকতে হচ্ছে।

চৈত্রের প্রথম দিক। গরম আর গুমোট দুই চলছিল ক'দিন ধরে। সেদিন রাত্রিতে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল। বৃষ্টির ছাটে ঘুম ভেঙে গেল স্বামী-স্ত্রীর। ছোট ছেলেকে বিছানা সমেত টেনে সরিয়ে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করতে করতে দাসী বললে—এ বৃষ্টিতে তোমার কাজের সুবিধা হয়ে গেল বুঝলে! মাটি কাটতে সুবিধা হবে।

চন্দ চিন্তিত ভাবে ঘাড নাড়লে, বললে—না, তুমি যা ভাবছ তা হবে না। বৃষ্টিটা বেশ হল তো! মাঠে কাদা হয়ে যাবে, জল জমে থাকবে জমিতে। তা ছাড়া খালের দিকের মাটি গলে যদি খালে পড়ে যায় জমির আল বাঁধতে বিপদ হবে।

দাসী বললে—কি জানি, আমি অত বুঝি না বাপু! তা তুমি নয়তো ভোরে একবার দেখে এসো অবস্থাটা!

ভোরে, সূর্য্যোদয়ের আগেই বেরিয়ে পডল চন্দ। জলে কাদায় ঘুরতে ঘুরতে জল বাঁচিয়ে সে হাজির হল বারুণীর পারে। না, বিশেষ ক্ষতি হয়নি। অবশ্য জমিতে জমিতে জল জমে আছে। সে খালের দিকের অবস্থাটা দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল। নাঃ, আলগুলো সব ঠিকই আছে। খালটা আগে অনেকটাই চওডা ছিল, এখন মজে গিয়েছে। তার থেকেও অনেকখানি কেটে জমির মধ্যে ভুক্তান করা হয়েছে। মাটি তুলে ফেলা হয়েছে অনেকখানি। তার উপর বৃষ্টির জল পেয়ে নরম মাটি গলে গলে কত বিচিত্র লেখায় খালের জলে গিয়ে মিশেছে।

সে ভাল করে চারিপাশটা দেখতে লাগল, আর কাটবে কি না, কাটলে আর কতটা কাটবে সেটা বিবেচনার জন্যে। হঠাৎ পাশে সর সর শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। একটা মস্ত বড় গোখরো সাপ নেমে চলে যাচ্ছে ঢালের উপর দিয়ে। সে চমকে সরে গেল কয়েক পা! পডতে পড়তে সামলে নিলে। পায়ের চাপে অনেকখানি মাটি ছেড়ে পরে গেল।

সে সন্তর্পণে খালের জলের ধারে নেমে গিয়ে পা-টা ধুয়ে ফেললে। তারপর আস্তে আস্তে ঢালু থেকে উঠে আসতে লাগল। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোন লোকজন নাই। সূর্য্য সদ্য উঠেছে।

সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মাটির দিকে তাকালে। ও কি! যেখানটায় তার পায়ের চাপে মাটি সরে গিয়েছে সেখানে সকালের আলো লেগে ওটা কি চিক চিক করছে?

তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করে উঠল। সে কম্পিত হাতে আস্তে আস্তে সেই চিকচিকে বস্তুটা তুলে নিলে। ছোট্ট গোল চকচকে জিনিস। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে খালে নেমে সেটা কম্পিত হাতে সে ভাল করে ধুয়ে ফেললে।

একি! এ যে মোহর!

মোহরটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগল আর কেউ দেখেছে কিনা! নাঃ, সমস্ত মাঠটা জনমানবহীন নির্জ্জন, কেউ কোথাও নাই! না, নিশ্চিন্ত, কেউ দেখে নাই। সূর্য্যের আলো আস্তে আস্তে মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। তারই মধ্যে কতকগুলো কাক, শালিক আর বক আলের ধারে ধারে বসে আছে এখানে ওখানে। পোকা-মাকড় ধরে খাবার প্রত্যাশায়। হঠাৎ ক'টা কাক উড়ে গেল তার মাথার উপর দিয়ে, কা কা করতে করতে। সে বিরক্ত হয়ে গালাগাল দিয়ে উঠল—আ মরণ, মরেও না। সকাল মাথার ওপর দিয়ে ডেকে ডেকে উড়ছে। যাঃ, যাঃ।

কাকগুলো উড়ে গিয়ে কাছের একটা ঝোপের মাথায় বসল দলবেঁধে। তার হাতের মহামূল্য সম্পদটি ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিয়ে আবার তেমনি মুঠো করে ধরে ডান হাত দিয়ে আধ ভিজে মাটির ঢেলা তুলে নিয়ে সেই ঝোপটা লক্ষ্য করে ছুঁড়লে। কাকগুলোর উপর রাগ তার তখনও শান্ত হয় নাই। ঢিল খেয়ে কাকগুলো আর একটু দূরে একটা গাছের মাথায় গিয়ে বসল।

যাক, এবার নিশ্চিন্ত! শয়তানগুলো আর মাথার ওপর কা কা করে ঘুরবে না। কিন্তু এবার কি করবে সে? কি করবে সে? হ্যাঁ হয়েছে! এখন কত, কত করতে হবে! সে কাছের একটা খৈরী গাছ থেকে একটা শক্ত ডাল ভেঙে নিয়ে এল। আর চারিপাশ খুঁজে একটা শক্ত আধভিজে কাঠি। ব্যস, এইবার হয়েছে! কিন্তু চারিপাশে কেউ নেই তো? না, না, কেউ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে এখন কাজ আরম্ভ করা চলতে পারে।

সে শুকনো কাঠিটা নিয়ে এগুলো। কিন্তু, এ কি? মোহরটা? কোথায় গেল? ওঃ, কি ভুল হচ্ছে! এই তো বাঁ হাতের মুঠোতেই শক্ত করে ধরা রয়েছে। ঘামে ভিজে সেটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেটিকে সে সন্তর্পণে ফতুয়ার পকেটে রেখে আধশুকনো কাঠিটা দিয়ে অতি দ্রুত সেই জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে খুঁড়লে সে। তারপর তোলা মাটিগুলো দেখলে ভাল করে নেড়ে চেড়ে। নাঃ, নাই কোথাও কিছু আর! সে আবার গর্ত্তটায়

মাটিগুলো ভরাট করে খৈরী গাছের ডালটা সেখানে বিশেষ হিসেব করে চাপা দিয়ে রাখলে। অন্য কেউ সামান্য নাড়লেই সে বুঝতে পারবে। তারপর হাত ধুয়ে সে আবার যেমন মাঠ দেখবার তেমনি নিরীহভাবে মাঠে ঘুরতে লাগল।

রোদ আর একটু চড়তেই এসে হাজির হল নিধি। সে এত সকালে মনিবকে মাঠে দেখে অবাক হয়ে গেল, বললে—ঐ, এত সকালে আপুনি এসে গিয়েছ লাগছে!

—হ্যাঁরে এলাম। রাত্রিতে ভাল করে ঘুম হয় নাই বিষ্টির পর থেকে। ভাবলাম কাদা হয়ে গেল, তারপরে ঐ খালের দিকে বোধহয় মাটি ধ্বসে পড়বে। তা সে সব কিছু হয়নি যা হোক। একটা কাজ করিস! আজকে আর খালের দিকে মাটি কাটতে দিস না। একদিন রোদে খানিকটা শুকিয়ে যাক।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে নিধি বললে—হোক। কিন্তু আপুনি কি কাদাতে পড়ে গিয়েছিলে না কি গো?

চমকে উঠে চন্দ বললে—না তো?

—আপনকার কাপড়ে কাদার ছিটে লেগে আছে. নখের কোণে কাদা—

একটু হেসে চন্দ বললে—হ্যাঁ, একবার পা পিছলে গিয়েছিল তা হলে তুই থাক, আমি চললাম।

—আপনি লিচ্চিন্দি চলে যান। আজ খুব কাজ হবে দেখবেন। মাটি বেশ গদগদে হয়ে আছে। বালি মাটি। ফাওড়া পড়লেই মাখনের তালের মত উঠে চলে আসবে।

—তা করা, কিন্তু দেখিস খালের দিকে যেন আজ কোদাল না যায়!

—হোক, আপুনি চলে যাও।

সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এল। সারা পথ নানান চিন্তা করতে করতে ফিরল। দুটো চিন্তা, প্রথম—দাসীকে বলবে কি না, দ্বিতীয়—কালকে কি ভাবে গিয়ে আবার দেখবে! ভাবনার রাস্তা ধরতেই তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাবটা অনেকখানি কমে এল। দাসীকে অবশ্যই বলতে হবে। তবে আজ নয়, কাল সবটা দেখে বলবে।

সেদিনটা কি ঘোরের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। তাকে অন্যমনস্ক দেখে দাসী একাধিকবার তাকে সচেতন করে জিজ্ঞাসা করেছে—শুনছ?

—এ্যাঁ। কিছু বলছ?

—হ্যাঁ বলছি। কি হল কি তোমার? কি ভাবছ কি সারাদিন?

—না, কিছু না। কিছুই ভাবিনি। বলতে বলতে আরও জোরে উঠে দাসীর কাছ থেকে সে পালিয়ে বেঁচেছে।

এরই মধ্যে রান্নাঘরে গোপনে ঢুকে সাঁড়াশিটা সংগ্রহ করে লুকিয়ে রেখেছে এবং এক সময় পাথর দিয়ে ঠুঁকে তার জোরটা ছাড়িয়ে সাঁড়াশিটাকে দুটো পৃথক অস্ত্র হিসেবে পাতায় মুড়ে রেখে দিয়েছে। সন্ধ্যার আগে আবার গিয়ে দেখে এসেছে খালের দিকটায় কাটা হয়েছে কি না! কাটা যে হয়নি এটা নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসেছে। নিজের ফতুয়ার পকেটে যে মোহরটা রেখেছিল সেটি অতি সংগোপনে কাঠের ক্যাস বাক্সের তলার থাকে কাগজের নীচে লুকিয়ে রেখেছে।

পরদিন আবার তেমনি ভোরে মাঠ দেখবার নাম করে সে বেরিয়ে পড়ল। মাথার উপর তখনও শুকতারা দপদপ করছে। কৃষ্ণপক্ষের এক ফালি চাঁদ তখনও অস্ত যায়নি।

অনেকখানি পথ। যেতে শুকতারা চাঁদ দুই ডুবল। ভোরের আকাশ তখন আস্তে আস্তে ফরসা হয়ে আসছে। চারিদিকের মাটি, গাছপালা তখনও চেনা যায় না, নীচে খালের জল তখনও সীসের পাতের মত স্থির পড়ে আছে। তাকে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

আরও একটু ফর্সা হতেই সে সাঁড়াশীর একটা ডাঁট শক্ত করে হাতের মুঠোয় ধরে মাটির বুকে কোনখানে বিঁধবে তারই ভাবনায় উদ্দাম হয়ে উঠল। সন্ধ্যাজলে এখনও অধিকাংশ মানুষ প্রত্যূষের শান্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যারা উঠেছে শান্তচিত্তে ইষ্ট নাম করে তারা প্রত্যহের কর্ম্মে লাগবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সেই সময়, সেই শান্ত পবিত্র মুহূর্ত্তে সে মহালোভীর মত লোলুপ দৃষ্টিতে মাটির উপর চোখ বুলিয়ে যেতে লাগল কোনখানে তার অস্ত্র দিয়ে মাটির বুক বিদীর্ণ করবে!

পেয়েছে সে! হিসেব পেয়েছে!

ঐ মোহরটার অবস্থিতির কারণ দুটো হতে পারে। এক ঐখানেই তার উৎসস্থল। কোনও পাত্র থেকে বেরিয়ে এসে থাকতে পারে। আর একটা হতে পারে—সেটা পরের কথা।

সে খুঁড়তে আরম্ভ করলে উন্মাদের মত। পিপীলিকাভুক যেমন করে উন্মাদ হয়ে মাটির ভিতর মুখ পুরে দিয়ে খাদ্যের সন্ধান করে তেমনি করে মাটি খুঁড়ে চলল চন্দ। মুখ দিয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। একটু অদ্ভুত শব্দ বের হচ্ছে মুখ থেকে।

[illegible] না। এখানে খুঁড়ে আর লাভ নাই।

তা হলে ঐ চাঁদারাজার ভিটের ভেতর থেকে জলের স্রোতে ভেসে এসেছে। এইবার পাশ পাশ খুঁড়ে দেখতে হবে।

যে কথা সেই কাজ।

সে পাশ দিয়ে খুঁড়ে চলতে লাগল। খানিকটা খোঁড়ে, তারপর মাটিটা দু হাত দিয়ে গুঁড়িয়ে দেখে; নাঃ, নাই, কিছু নাই। আবার সে হুস হুস করে মুখে একটা জান্তব হঁঃ, হঁঃ শব্দ করতে করতে খুঁড়ে চলে খানিকটা, মাটিগুলো ভাঙে দু হাত দিয়ে, বালি মাটি, গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। হু, শক্ত খোলামকুচির মত এটা কি? এই তো আর একটা। বুক দুলে দুলে উঠছে তার! সে শক্ত জিনিস দুটো মুঠো করে নিয়ে জলে নেমে গেল, তারপর পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললে। হ্যঁ, সেই বাঞ্ছিত দুর্লভ বস্তুই বটে! মোহর! সে ফতুয়ার পকেটে ফেললে সে দুটিকে।

আঃ, হাত দুটো নখের মাথায় মাথায় জ্বালা করছে। ছড়ে গিয়েছে বালির আর মাটির ঘর্ষণে। আবার খানিকটা খুঁড়ে দেখবে না কি? না থাক, আজ আর নয়, আবার কাল।

সে উঠে চলে আসছে এমন সময় দেখলে নিধি আসছে খানিকটা দূরে। সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগল কি কৈফিয়ৎ দেবে সে নিধিকে। কিন্তু কৈফিয়ৎ ঠিক করার আগেই নিধি আশ্চর্য্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করলে—ঐ, আজও এসে গিয়েছ লাগছে? এত ভোরে কেনে এলে গো?

অপ্রস্তুত হাসি হাসবার চেষ্টা করে চন্দ বললে—এই চলে এলাম!

—এত ভোরে আর এস না আপুনি! সাপ আছে, বনশুয়োর আছে, হেড়োল (নেকড়ে বাঘ) আছে। আমি হুই দূর দেখলাম কে একটা লোক খালের থেকে উঠে আসছে। আমার মনে হল কার এত রঙ লাগল যে রাত থাকতে এখানে আসবে। তা বাদে ফর্সা জামা-কাপড় দেখে মনে হল আপুনি। তাই ছুটতে ছুটতে আসছি।

অকস্মাৎ চন্দের মনে একটা সন্দেহ খেলে গেল। সে পাল্টা প্রশ্ন করলে—তা তুই এত ভোরে এলি কেন?

—আমি? দাঁত বের করে নিধি হাসতে লাগল।—আমার কথা শুনে আপুনি কি করবে? আমার কথা বাদ দাও।

তার সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ হাসিতে ভর্তি মুখখানার দিকে তাকাল চন্দ। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সব কথা। দাসী বলেছে তাকে। নিধি এইবার বিয়ে করবে। ফর্সা সুন্দর মেয়েও জুটে গিয়েছে কপালে। এখন বিয়ে হলেই হয়। তার হাসি দেখে মনে হল বোধ হয় নিধির বাগদত্তার সঙ্গে এইখানেই কোথাও গোপন সাক্ষাতের সংকেতস্থল ছিল। সেই সাক্ষাৎ করেই বোধ হয় আসছে সে। চন্দ হেসে জিজ্ঞাসা করলে—ত. তোর কথা বাদ দেব কেন? যার জন্যে এসেছিলি তা হয়েছে তো?

তার প্রশ্নের পশ্চাতের ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরে ছেলেটা হেসে সারা হয়ে গেল। লজ্জা পেয়েছে সে। অনেকটা হেসে বললে—তা হয়েছে।

প্রসঙ্গান্তরে যেতে পেরে চন্দ বললে—বিয়ে করবি কখন?

লজ্জায় মাথা হেঁট করলে নিধি, বললে এইবার করব। আপুনি মত দিলেই হয়। বৌ-ঠাকরুণকে বলেছি আমি।

—তা বিয়ে কর। তোকে খানিকটা জমি আমি দেব। বুঝলি? লেখাপড়া করে দেব।

নিধি ঠক করে তাকে একটা প্রণাম করলে। চন্দ বললে—নে, খুব ভক্তি হয়েছে, আর এই ধুলো-কাদায় পেনাম করতে হবে না। পেনাম করিস বরং বউ-ঠাকরুণকে।

—সি আমি আগেই করেছি। কিন্তুক আমার একটো কথা আছে মাশায়। আমার মাকে আপুনি কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলে! আমার বউকে সেই কাজটা দিতে হবে মাশায়!

—তা দোব। চল বাড়ী চল। চন্দ তাকে আর ওদিকে যেতে দিতে চায় না।

—যাই। আমি খালের জলে ঝট্ করে পা দুটো ধুয়ে আসি! সে চন্দকে আর কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে ছুটে খালের জলে নেমে গেল। উঠে এল তাড়াতাড়িই। এসে বললে—দেখেন, বেটাদের কাণ্ডটা দেখেন। কেমন করে গেঁড়োর খোঁজে বনশুয়োরগুলো এসে মাটি খুঁড়েছে দেখেন। সেই জন্যে তো বারণ করছিলাম আপনাকে, এত ভোরে এস না।

—আচ্ছা আসব না। চল, এখন বাড়ী চল।

বাড়ী ফিরে, মোহর দুটিকে প্রথম মোহরটির সঙ্গে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে কাজে মন দিলে। কিন্তু কাজে কি মন লাগে? তার মনে হচ্ছে এখনই দাসীকে গোপন কথাগুলি বলে। কিন্তু দিনের বেলায় ঘর বন্ধ করে

দাসীকে কিছু বলতে গেলেই ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঠেকবে, লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

সারা দিন সে ছোট ছেলের মত খুসী হয়ে ধান্তুর (ধ্যানেন্দু) সঙ্গে খেলা করলে। কাজকর্ম্মের ধার দিয়ে গেল না।

তার আচরণের অস্বাভাবিকতা আর কারো না হোক দাসীর চোখে ঠিক লেগেছিল। ত্বপুরে খাবার সময় সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি হয়েছে বলতো?

এক মুখ হাসি নিয়ে সে বললে—কি আবার হবে?

দাসী জোর দিয়ে বললে—হয়েছে। নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছি হয়েছে। কাল দেখলাম অন্যমনস্ক হয়ে আছ, আজ দেখছি ছোট ছেলের মত হাসি-খুসী! কিছু ব্যাপার নাই বললে মানব কেন?

সে নিজের স্বভাব-বিরুদ্ধভাবে হেসে ভেঙে পড়ল, বললে—না, না, কিছু হয় নাই। সত্যি বলছি তোমাকে।

দাসী রাগ করে উঠে গেল। সে রাগ আর তার সারা দিনে পড়ল না।

রাত্রিতে মুখ ভারী করেই শুতে এল দাসী। এসে স্বামীর মুখের চেহারা দেখে সে অবাক হয়ে গেল। অন্য দিন শুতে এসে সে দেখে স্বামী হয় শুয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে বিছানায়, নয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আজ সে চুপ করে বসে আছে বিছানায়। মুখে অন্যমনস্কতা নাই, হাসিখুসী কোথায় অন্তর্নিহিত হয়ে গিয়েছে। দাসী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দাসীর সমস্ত খুটিনাটি কাজগুলি লক্ষ্য করছে। মুখচোখ থমথমে।

দাসীর সমস্ত কাজ হয়ে গেলে চন্দ গম্ভীরভাবে বললে—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

দাসী অভিভূতের মত দরজা বন্ধ করে স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল। চন্দ জিজ্ঞাসা করলে—ধান্তু ঘুমিয়েছে?

না দেখেই দূর থেকে একবার তাকিয়েই সে বললে—হ্যা!

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে ঘাড় নেড়ে সে বললে—ভাল করে দেখে এস। তারপর বলো।

ধান্তুর বিছানার কাছে গিয়ে ভাল করে দেখে এসে সে বললে—হ্যাঁ ঘুমিয়েছে। বেশ লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস পড়ছে। তারপর অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে স্বামীর কাছে এসে চাপা গলায় বললে—কি হয়েছে গো?

স্বামী ইঙ্গিতে তাকে বিছানায় বসতে বলে লণ্ঠনটা এনে আলো বাড়িয়ে

বিছানায় রাখলে। তারপর কম্পিত হাতে ফতুয়ার পকেট থেকে মোহর তিনটি মুঠো করে বের করে উজ্জ্বল আলোর সামনে মুঠোটা খুলে স্ত্রীর দিকে প্রসারিত করে দিলে।

অতি বিস্মিত হয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে একবার ওর হাতের আশ্চর্য্য অবিশ্বাস্য জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় প্রশ্ন করলে—কি?

তেমনি চাপা গলায় চন্দ নিজের মুখখানা স্ত্রীর কানের কাছে নিয়ে গিয়ে বললে—মোহর! সোনার মোহর!

—কোথায় পেলে?

—বলছি।

তাকে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বললে চন্দ। জমিদারী কেনার কথা থেকে আজকের সকালে দুটো মোহর পাওয়া পর্য্যন্ত।

সমস্ত কথা রূপকথার গল্পের মত অবাক হয়ে শুনলে দাসী। কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকল ঘটনার বৈচিত্র্যে। আস্তে আস্তে আবার তার বোধ-চেতনা ফিরে এল। সে প্রথমেই স্বামীর খোলা মুঠো থেকে মোহর তিনটি তুলে নিয়ে বেশ ভাল করে দেখে সিন্দুকের মধ্যে তুলে রেখে এসে আলিঙ্গনের মত স্বামীর গা ঘেঁষে বসল। স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললে—এইবার কি করবে?

অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তান্বিতভাবে ঘাড় নেড়ে চন্দ বললে—তাই তো ভাবছি কি করব!

—এক কাজ করনা কেন? নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত জায়গাটা কাটিয়ে, মাটি গুঁড়ো করিয়ে পাতলা চালনিতে করে চেলে দেখ।

চন্দ হাসল, বললে—তুমি পাগল একটা!

—কেন?

—বুঝলে না? ঐ ভাবে কাজ করলে বিশ্ব-সংসার জেনে যাবে আমি গুপ্ত সম্পত্তি পেয়েছি। তারপর ঐ জায়গার জন্যে মারামারি লেগে যাবে। দিনে রাত্রিতে লোকে চুরি করে ঐ জায়গার মাটি কাটবে। দাঙ্গা হবে, ফৌজদারী হবে। ঐখানেই শেষ হবে না। আমি অনেক গুপ্তধন পেয়েছি ভেবে ডাকাত পড়বে আমার বাড়ীতে। শুধু কি তাই? তারপর জমিদার এগিয়ে আসবে, বলবে—যা মোহর পেয়েছ দাও। ও সম্পত্তি আমার! সরকারও কি ছেড়ে দেবে ভেবেছ?

শুনতে শুনতে দাসী বলে উঠল—বাবাঃ! এ ভীষণ কথা! তা হলে?

অসহায়ের মত সে বলে উঠল—তা হলে আমাদের কিছু করার নাই? এ অমনিভাবে প্রতিদিন ভোরে খানিকটা খানিকটা করে মাটি কাটতে হবে তোমাকে?

চন্দ হাসল, বললে—তা ছাড়া আর রাস্তা কি? আর তাই বা চলবে আর ক'দিন?

—কেন?

—তাও চলবে না। অমনি প্রতিদিন ভোরে দক্ষিণের মাঠে গেলে লোকে সন্দেহ করতে আরম্ভ করবে। এই বোঝ না, যদি আবার কালকেই যাই, অন্য কেউ নয়, নির্ঘিই সন্দেহ করবে আমাকে। কোন্ টানে প্রতিদিন ভোরে ওখানে যাচ্ছি। তা ছাড়া তুমি জান কি না জানি না, ও বেটার চোখ ভয়ানক খর।

—তা হলে কি করবে?

—এখন আর কিছু করব না। এখন খালের ধারটা কাটাও বন্ধ রাখব। একটা কাজ করতে পারলে খানিকটা সুবিধা হত। কিন্তু সে তো আমার সামর্থ্যের বাইরে!

সাগ্রহে দাসী বললে—কি কাজ বল না, শুনি! বল!

—যদি কোন ক্রমে সন্ধ্যাজলের জমিদারী সবটা কিনে ফেলতে পারতাম তা হলে একবার সম্পত্তিটা উদ্ধারের চেষ্টা করে দেখা যেত।

গভীরতর আগ্রহে দাসী বললে—কিনতে চাইলে এখনও কিনতে পাবে?

—তা হয়তো পাওয়া যায়। বলতে পারি না। চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব?

—কত টাকা?

—অন্ততঃ দশ হাজার।

কিছুক্ষণ ভাবলে দাসী, তারপর বললে—আমি টাকা দোব তোমাকে। তুমি কিনে ফেল জমিদারী। অবাক হয়ে চন্দ বললে—তুমি এত টাকা দেবে কোথা থেকে?

দাসী এবার হাসল, বললে—তুমি কি আমাকে সামান্য লোক ভাব নাকি? সেই-যে প্রথম দিন যেদিন থেকে তোমাদের বাড়ী এসেছি, সেইদিন থেকে তবে কি জমালাম তিল তিল করে? আমি তোমাকে এমনি তিনটে সন্ধ্যাজল কিনে দিতে পারি তা জান?

—হোক, তাই যাই। কিন্তু ই তো বড় অবাক কথা কত্তা। ঐ ফাঁকা মাঠে কি পাহারা দেবার লেগে আমাদিগে রাখবেন তা বুঝতে লারছি।

তাদের গোপন কথার মাঝখানে কখন দাসী এসে দাঁড়িয়েছে তা দু জনের কেউই বুঝতে পারেনি। দাসী পিছন থেকে গম্ভীরভাবে বললে—তা জেনে তোর কি দরকার বল তো? তোকে যা করতে বলছে তাই কর তুই! বুঝলি! বেশী জানতেও চাস না, বুঝতেও চাস না।

তার মুখের দিকে চেয়ে নিধি কি বুঝলে সেই জানে, সে চুপ করে গেল।

জমিদারের গোমস্তা তাকে সম্পত্তিটা কিনিয়ে দিয়ে হেসে বললে—এ আমি জানতাম, রায় কত্তা।

কথা হচ্ছিল জমিদারীর দলিল রেজেস্ট্রী করে গরুর গাড়ীতে ফিরবার পথে। দলিলে সই হওয়ার পর থেকেই সে জমিদারের গোমস্তার কাছে ছোট রায় থেকে এক মুহূর্ত্তে রায় কর্ত্তা হয়ে গিয়েছে।

তার কথা শুনে চন্দ কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কথার অর্থটা ঠিক বুঝতে না পেরে। গোমস্তা হেসে বললে—ঠাকরুণ আপনাকে আশ্রয় করে আছেন, বুঝলেন! তার দয়ায় আপনার বাড়-বাড়ন্ত কত। এ সম্পত্তি ঠাকরুণের ইচ্ছায় আপনার কাছ ছাড়া কি অন্য কারো কাছে যেতে পারে?

জমিদারের গোমস্তা, এতদিন তাকে মাতব্বর প্রজার মত মাতব্বরি করে পৃষ্ঠপোষকতা করে সমাদর দেখাত। সে সমাদরের পিছনে শাসনের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মেশানো থাকত সব সময়। আজ সেই লোকের কথার সুর অতি বিনীত। সে এই মাদকতা মনে প্রাণে অনুভব করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকল। একবার একটু হাসলে মাত্র।

কিন্তু তাকে তুষ্ট না করলে তো গোমস্তার চলবে না। সে বলতে লাগল —আপনি কিনবেন বলেই আমি জমিদারদের বলে কুড়িগুনো থেকে চোদ্দ-গুনোতে দাঁড় করালাম। জানেন, দাম আরও কমত। কিন্তু ওদের অবস্থা হয়েছে হা-ঘরের মত। একবার সুযোগ পেয়েছে দাঁও কসবার, আর কি ছাড়ে? তা আমি বললাম—যদি এতে না দেন, তবে আর দিয়ে কাজ নেই, উনি নেবেন না।

এ জাতীয় পাটোয়ারদের চন্দ ভাল করে চেনে। এরা মিথ্যা কথায় অদ্বিতীয়। চন্দ কি বলবে, চুপ করেই রইল।

এর পর গোমস্তা বললে—তা আদায় কি নিজেই করবেন ? অবিশ্যি, আদায় নিজেও করতে পারেন, সব প্রজাই আপনার হাতের নাগালের ভিতরে। তবে নিজে না করাই ভাল। কারণ আপনি হলেন গিয়ে ভূস্বামী, নিজে হাতে খাজনা আদায়, প্রজার সঙ্গে নিজের মুখে টাকা পয়সা নিয়ে কচকচি এটা খুব ভাল দেখাবে না।

একটু থেমে, একটু কেসে, একটু হেসে গোমস্তা আবার বললে—আমাকেই রাখুন একথা আমি জোর করে বলছি না। তবে যদি লোক দিয়ে আদায় করান তবে আমার চেয়ে ভাল লোক এ কাজের জন্যে আর পাবেন না। আজ চল্লিশ বছর আমিই এই কাজ করে আসছি। আমার বাবা করেছেন, আবার আমিঃ করছি। সব ঘাঁতঘোঁত আমার জানা। আর, এ ছাড়া যত পুরানো কাগজ সন্ধ্যাজল সম্পর্কে সব আমার কাছে আছে। একশো বছরের পুরানো সব কাগজ আমার বাড়ীতে থাক করে সাজানো আছে। কোন মামলা মোকদ্দমা হলে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না। চোখ বুজে মামলা জিতে যাব।

চন্দ গম্ভীর হয়ে বসে ছিল। গাড়োয়ানের পিছনে নিধি বসে আছে। সে গোমস্তার সব কথা শুনে আপন মনে হাসছে। সে একবার দন্ত বিকশিত মুখে তাদের দিকে পিছন ফিরতেই চন্দ তার হাসি দেখে তাকে ধমক দিলে—অমন বোকার মত হাসছিস কেন ?

নিজের হাসিটিকে আরও প্রসারিত করে মাথা চুলকে নিধি বললে—হাসছি, যা গরম !

—গরম, তাতে হাসির কি হল ?

—গরমে পিঠে বুকে সব কেমন সুড়্‌সুড়্‌ করছে। আর সুড়্‌সুড়িতে চুলকোতে গেলেই কাতুকুতু লাগছে। আর কাতুকুতু লাগলেই হাসি লাগছে।

—হনুমান কোথাকার ! চন্দ হেসে চুপ করল। নিধিও যে গোমস্তার ওকালতী বুঝতে পেরেছে তা বুঝেছে চন্দ ! তবে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। নিজে হাতে আদায় করা জমিদার হিসেবে সম্মানের হানিকর হবে। কাজেই গোমস্তা সে রাখবে। আর গোমস্তা রাখতে গেলে এই-ই সবচেয়ে ভাল হবে। তবু সে চুপ করে রইল। গোমস্তার কথা তখনও শেষ হয় নাই। সে বললে—আর একটা কথা চন্দ মশায় ! ঠাকরুণের দয়ায় আপনি জমিদারী কিনলেন। ঠাকরুণের দয়াতেই আপনি গুপ্তধন পাবেন বলে দিলাম।

চন্দ স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ গোমস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর গম্ভীর ভাবে বললে—গুপ্তধন-টনের কথা থাক। আমি আপনাকে আজ থেকেই বহাল করলাম। আপনিই আদায় করবেন।

গোমস্তা সঙ্গে সঙ্গে চন্দর পায়ের ধুলো নিলে। চন্দ বাধা দিতে গেল। গোমস্তা আন্তরিকভাবে বললে—সে কি কথা! আপনি উচ্চবর্ণ, আর তা ছাড়া আপনি আজ থেকে আমার মুনিব হলেন।

প্রণাম করে গোমস্তা বললে—তবে আদায় কিন্তু আরম্ভ করব রথের দিন থেকে। বেশ ধুমধাম করে রথের দিন 'পুণ্যে' (পুণ্যাহ) করুন।

সব শুনে দাসী একটু প্রথমটা আপত্তি করেছিল। তবে চন্দর যুক্তি শুনে সে খুসী হয়ে সমর্থন জানিয়েছে শেষে। সব বলে সে দাসীকে সংগোপনে বলেছিল—ও লোকটি অত্যন্ত জটিল লোক। আমরা যে গুপ্তধনের সন্ধান করছি তা বুঝতে পেরেছে ও। ওকে হাতে রাখা দরকার, বুঝলে।

দাসী ঘাড় নাড়লে। এ সব কথা সে চন্দ বলবার আগেই বুঝতে পারে।

রথযাত্রার দিন।

পুণ্যাহের পূজা হবে। তারপর আরম্ভ হবে আদায়। সব আয়োজন করেছে গোমস্তা ভবেশ।

এরই মধ্যে নিধি বিয়ে করে বউ নিয়ে জমিদার ও জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করে গেল। নজর দিয়ে গেল সরু চাল, ঘি, একটা পাঁঠা, একটা বড় মাছ। পাঁঠাটা নিতে চন্দ আপত্তি করেছিল। কারণ তাদের বাড়ীতে মাংস ঢোকে না। বাধা দিয়েছিল গোমস্তা ভবেশ, বলেছিল—এ কি বলছেন কত্তা, পাওনা নজরের জিনিস ছেড়ে নিতে আছে? তাতে প্রজার অসম্মান হয়, অকল্যাণ হয়! আর আপনি না খান, খাবার জন্যে তো আমরা আছি। খোকাবাবুরা আছে। আপনার উচ্ছিষ্ট তো আমাদেরই পাওনা!

কথাটা বুঝেছিল স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। চন্দ অবশ্য নিজের কথামত দু'বিঘে ভাল জমি দানপত্র করে দিয়েছে নিধিকে। নিধির বউটিও সুন্দর হয়েছে, তার উপর জমিটা পেয়ে তার আনন্দ ধরে না।

গোটা বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছে। গেনু এখন জংশনে ইস্কুলের উপর ক্লাসে পড়ে। সে এসেছে তার মামা, মাসী আর দিদিমার সঙ্গে। সুন্দর জামা কাপড় পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চন্দর এই জমিদারী কেনাতে তার বাপের বাড়ীর লোকরা তাদের চেয়ে দাসীর আভিজাত্যকে মেনে নিয়েছে। দাসীর আনন্দ সেইখানেই।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্যটা ভুলে যায়নি দাসী। এই জমিদারী কেনার মধ্যে দিয়ে সে সুবিপুল সম্পত্তি আজ বহুকাল ঐ দুর্গম জায়গায় লুকোনো আছে ও তার চাই-ই। এ কি ধন! ঐ ধন পেলে রাজার ঐশ্বর্য্য লাভ হবে। রাজা হবে তারা। জমিদারী কেনার পর থেকে প্রতি রাত্রিতে তারা স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা করেছে কি ভাবে এই কাজে কারণ কোন সন্দেহ উদ্রেক না করে এগিয়ে যেতে পারে তারা।

অনেক ভেবে একটা পরিকল্পনাও খাড়া করেছে তারা। আগে ঐ সুবিস্তীর্ণ দুর্গম স্থানে ঢোকার সহজ ব্যবস্থা করা দরকার। তার জন্যে জঙ্গল, গাছ পালা পরিষ্কার হওয়া দরকার সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু একবারে করলে লোকের সন্দেহ হবে। সেই জন্যে বাড়ী করার অছিলায় ঝোঁপ জঙ্গল পরিষ্কার করে বড় বড় ব্যবহার যোগ্য গাছ কেটে ফেলবে। এই ভাবে আস্তে আস্তে জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে এগিয়ে চলবে তারা। তারা দুজনে পরামর্শ করে স্থির করেছে খালের গায়ে ভিটের সামনেই যে একটা অর্জ্জুন গাছ, একটা শিশু গাছ আর দুটো জাম গাছ আছে সেই গাছ কাট বধ যাত্রার দিনে পুণ্যাহের সঙ্গেই বাড়ী তৈরীর নামে কাটাতে আরম্ভ করবে। ও হলেই আর কারও কোন সন্দেহ হবে না। সবটাই অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ঠেকবে। জমিদার বাড়ী করবে, তার খাস-পতিত জায়গায় যে গাছ আছে তাতে তার সম্পূর্ণ অধিকার। নিজের প্রয়োজনে সেই গাছ কাটাচ্ছে সে এটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। দাসী এবং সে সেই অনুযায়ী নিধিকে বলে রেখেছে—এখানে বাড়ীতে পুণ্যাহের কাজ শেষ হলেই ওখানে চাঁদ রাজার ভিটেতে গাছ কাটা আরম্ভ হবে শুভ দিনে।

নিধি অবাক হয়েছিল, বলেছিল—ঐ চাঁদ রাজার ভিটেতে গাছ কাটতে লাগবেন, ঠাকরুণের জায়গা, যদি কিছু হয়—

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অসহিষ্ণুভাবে চন্দ রেগে বলেছিল—কি হবে কি? কিছুই হবে না। তোর যদি ভয় লাগে তো বল।

নিধি আর কথা বাড়ায়নি। একবার মনিবের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সে বলেছিল—না ভয় কিসের লাগবে? আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনি হুকুম দিলেন গাছ কেটে দেব।

ভবেশ গোমস্তাও দাঁড়িয়েছিল সেইখানে, সে বললে—তাতে আর কথা কি। আপনি হুকুম দিয়েছেন, হুকুম তামিল করে দোব। তার জন্যে কোন চিন্তা নাই।

রথযাত্রার দিন কত কাজ! পূজা ত তিন দফা। এক দফা ঠাকুরের নিত্যপূজা, তারপর পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, তারপর পুণ্যাহ।

প্রাতঃকালে স্নান করে চন্দ ঠাকুরের মন্দিরের ভিতর বসে আছে চুপ করে। দাসী পাটের কাপড় পরে দুহাতে দশ হাতের কাজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড ভাল লাগল চন্দর।

সকালে খানিকটা বারবেলা ছিল। প্রহর বেলার পর পূজা আরম্ভ হল। দাসী পূজার সব আয়োজন করে দিয়ে এক পাশে চুপ করে বসেছে দরজার কাছে। চন্দ একবার দাসীর মুখের দিকে চাইলে। দাসী যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। প্রথম যৌবনের সেই স্নুচিক্কণ চামড়ায় অতি সূক্ষ্ম কুঞ্চন দেখা দিয়েছে, কপালে রেখা পড়েছে, গালের হাড দুটো সামান্য উঁচু হয়ে উঠে একটা বয়সের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে মুখে। তার বড় মায়া লাগল। আহা বেচারী, টাকা, টাকা, সোনা-রূপো, জমি-ধান, এই করে করেই গেল।

পূজা শেষ হতে মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল! পুণ্যাহ-পাত্র মণ্ডলের কাছ থেকে প্রথম খাজনা গ্রহণ করে নূতন পিতলের কলসীতে সে টাকা রেখে সেই কলসী কাঁকালে করে উলুধ্বনি আর শঙ্খধ্বনির মধ্যে উপরে শোবার ঘরে আলপনার উপর রাখা পিঁড়িতে সে কলসী স্থাপন করলে দাসী। তার আগে আগে জলধারা দিয়ে তাকে বরণ করে নিয়ে গেল চন্দ নিজে। এইবার দাসী লক্ষ্মীপূজা করবে।

নীচে থেকে নিধি ডাকলে—কর্ত্তামশাই!

উপরের বারন্দায় বেরিয়ে এসে চন্দ বললে—কি বলছিস রে নিধি?

—আমরা যাই তা হলে?

—একটু দাঁড়া। লক্ষ্মীপূজোটা হয়ে যাক।

লক্ষ্মীপূজো করে উঠে এল দাসী। চন্দ হাসি মুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—পূজো হয়ে গেল?

অতি মিষ্ট স্নিগ্ধ তৃপ্তির হাসিতে দাসীর মুখ সুন্দর হয়ে উঠল। সে ঘাড নেড়ে জানালে পূজো হয়ে গিয়েছে। তারপর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে—নিধি ডাকছিল কেন?

—এইবার সময় হয়েছে। কতকালের গাছ, গাছে শুভদিন বলে কোপ দিতে যাবে।

দাসীর মুখ খানা শুকিয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় বললে—কিন্তু যদি কোন খ্যানত হয়?

চন্দ্র অবাক হয়ে গেল। দাসীর উৎসাহেই তার উৎসাহ। তার উৎসাহকে দাসী কোন দিন ম্লান হতে দেয় নাই। তাকে অনির্বাণ আকাঙ্খার উত্তাপে অবিরাম উত্তপ্ত করেছে। সে অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু এ কি, একি? এ কার মুখ! কত কতকাল আগে দেখা, প্রায় ভুলে-যাওয়া, সেই অপরূপ, সুন্দর, সুকুমার, সদ্যোযৌবনার মুখখানি আজ সকাতর শঙ্কা মেখে বড় বড় ভয়ার্ত নীলাভ চোখ মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে!

আজ সে মুখ সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল না। অতি কোমল মিষ্ট, বিস্ময়কর ক'টি কথা বেরিয়ে এল সেই মুখ থেকে—ওগো, আমার কেমন ভয় লাগছে। আর ঐ যে তিনটে মোহর আছে, ও ক'টা গালিয়ে নারায়ণের পৈতে তৈরী করিয়ে দি!

চন্দর চোখ ঝাপসা হয়ে জল ঝরে পড়তে আরম্ভ করছে। সে ছুটে গিয়ে দুই হাত দিয়ে দাসীর মুখখানা আপনার মুখের খুব কাছে তুলে ধরলে। এই তো, এই তো, এখনও সেই মুখ এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। একি, একি, সে মুখ সূর্যাস্তের গোধূলি আলোর মত ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

সে দাসীর মুখখানা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

সে তো তা হলে, তা হলে তাকে ভুলে যায় নি।

আপনার সুকুমার সৌন্দর্য নিয়ে কত কাল পার হয়ে সে আজ আবার ফিরে এসে মুখ তুললে! তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

সে চোখের জল মুছলে।

দাসী বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকছে—কি হল? শুনছ? দরজা খোল! নিধি ডাকছে!

সে চোখ মুছে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। দাসী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল তোমার? ও দিকে নিধি যে তোমাকে ডাকাডাকি করছে!

—কেন?

চলে যাক, আর কি! গাছ কাটুক হলেই বা পুরানো গাছ! ওর ভেতরে যেতে গেলে তো যেমন করে হোক কাটতেই হবে!

স্ত্রীর কথার সে জবাব দিলে না। সে সোজা এগিয়ে বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে বললে—ওরে নিধি, গাছ কাটতে যেতে হবে না! ও-সব গাছ কাটা হবে না। যা বাড়ী যা আর লোকগুলোকে সব বাড়ী যেতে বল।

তার কথা শুনে দাসী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হতভম্বের মত

॥ ছয় ॥

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে বারুদের মত জ্বলে উঠল দাসী—গাছ কাটা হবে না, মানে?

অত দীর্ঘ বিবেচনার পর যা দুজনে কম্পিত হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ নিয়ে মনে স্থির করেছিল সেটাকে কি বন্ধ করে দিতে চায় চন্দ? তার উপর তার হুকুমেই এতদিন সংসার চলে এসেছে, শুধু সংসার কেন, চন্দকেও চালিয়ে নিয়ে এসেছে সে। আজ দীর্ঘ প্রত্যাশার পর সে আকাঙ্ক্ষায় বাদ সাধতেই অভুক্ত দেহ তার কেমন করে উঠল, মাথা জ্বলে উঠল, সে কিছুক্ষণ অগ্নিগর্ভ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললে—তার মানে কি?

বহুকাল পরে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াবার একটা কঠিন ভূমি যেন পেয়েছে চন্দ। সে বুঝতে পারছে দাসীর ক্ষোভ হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। সে শান্ত কণ্ঠে বললে—মানে সব তোমাকে বলব। নিশ্চয়ই বলব। তুমি সারা দিন খাওনি কিছু। জল পর্যন্ত ছোঁওনি তুমি। জল খাও ঠাণ্ডা হও তারপর বলব তোমাকে নিরিবিলি।

স্বামীকে সে এতকাল দেখে এসেছে কোনও কথায় প্রথমটা হেসে বা ক্ষুব্ধ হয়ে আপত্তি করলেও দ্বিতীয় মুহূর্তে তার কথা মেনে নিয়েছে। আজ স্বামীর এই শান্ত ঠাণ্ডা উত্তরের পিছনে একটা শক্ত মানুষের স্থির সিদ্ধান্তকে অনুভব করছে সে। তাই প্রতিহত করবার জন্যে সে আবার জ্বলে উঠল—কি বলবে তুমি আমাকে নিরিবিলি? এখনি বল আমাকে!

সমান ঠাণ্ডা অনুত্তেজিত ভাবে সে বললে—তুমি এখনও এক ফোঁটা জল খাওনি। জলটা খাও। তারপর বলব। আর যদি গাছ কাটতেই হয় তবে সে তো আবার পরে! আজ তো আর হচ্ছে না! আজ তো লোকজন সব ফিরিয়ে দিলাম!

—কেন দিলে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা না করে?

শান্তভাবে চন্দ জবাব দিলে—আমি সঙ্গত বিবেচনা করেছি, তাই ফিরিয়ে দিয়েছি। এ বাড়ীতে আমার কথাটাই যে শেষ কথা দাসী! আমি যদি না চাই, তার ওপর কি কথা বলা চলে? না বলা উচিৎ?

এটা মর্ম্মান্তিক আঘাত হল দাসীর পক্ষে। এত বছরের মধ্যে সে এই ধরনের কথা শোনে নাই এখানে। সে বরাবর চন্দর কাছ থেকেও শুনে এসেছে তার কথাটাই এ বাড়ীতে শেষ কথা। শুনে শুনে সেই কথাটা সে নিজেও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে এসেছে। আজ তার বিপরীত কথা শুনে সে মর্ম্মাহত হল, তার দুই চোখ জলে ভরে এল।

আবার জলে উঠল দাসী। চোখের জলের ভিতর থেকেই সে কটু কণ্ঠে বলে উঠল—এই যদি মনে ছিল টাকাটা, হাত পেতে নিতে লজ্জা লাগল না? আমার কাছে টাকা নিয়ে জমিদারী কিনতে গেলে কোন লজ্জায়?

আশ্চর্য্য! কোন রকম রাগ হল না চন্দর। সে বুঝতে পারছে দাসীর এই ক্ষোভ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সে শান্ত উপদেশের স্বরে বললে—ছি দাসী, অমন করে বলে না, বলতে নেই। আর তা ছাড়া কার টাকা তুমি আমাকে দিয়েছ? সে তো আমারই টাকা! আর তা ছাড়া আজ বাড়ীতে এক বাড়ী লোক রয়েছে, তোমার মা রয়েছেন, তোমার ভাই-বোনরা এসেছেন; তা ছাড়া তোমার ছেলের বড় হয়েছে। আজ কি এইভাবে ঝগড়া করে? আজ পবিত্র দিন, শুভ দিন!

দাসী আর কথা বললে না। দৃষ্টি দিয়ে অগ্নিবর্ষণ করে সে স্বামীর পাশ দিয়ে ছুটে ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিলে।

চন্দ চুপ করে দাড়িয়ে রইল। সে জানত, অমনি দাড়াবে শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু তার কেবল একটা কথা মনে হতে লাগল—আহা বেচারী, সারা দিন এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত খায় নাই!

সে আস্তে আস্তে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে—দাসী, দাসী, শোন। বেরিয়ে এস, জল খাও।

ভিতর থেকে কোন সাড়া এল না। সে দরজার কাছ থেকে সরে এসে নেমে যাবে এমন সময় নীচে থেকে শাশুড়ী আর জ্ঞানেন্দ্র উঠে এল। সে এখন বেশ বড় হয়েছে। গায়ে পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়।

তার শাশুড়ী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁ বাবা, দাসী কই? তোমরা নীচে এস, এখন দুজনে জল খাওনি। একটু সরবত টরবত খাবে, নেমে এস। কিন্তু দাসী কই?

চন্দ একটু হেসে বললে—আপনার কন্যা ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছেন। আমি অনেক বার ডাকলাম, কিন্তু উঠে এলেন না তো।

শ্বাশুড়ী অবাক হয়ে বললেন—কেন? কি হল ওর? তোমরা ঝগড়া করলে বুঝি? ছি, ছি, বাবা আজকের দিনে কি ঝগড়া করতে হয়? আর তা ছাড়া ও আমার একটু অভিমানী মানুষ, জানই তো ওকে! সব জেনে শুনে কেন ওকে বিরক্ত করতে গেলে?

সে মনে মনে একটু আহত হল। আশ্চর্য্য, তার রাগ অভিমান কিছু থাকতে নাই! দাসী অভিমানী মানুষ, অতএব ওর অভিমানকে প্রতি মুহূর্ত্তে সম্মান করে চলতে হবে। সে শ্বাশুড়ীর মুখের দিকে চাইলে। দেখলে মুখের কথায় যতখানি অভিযোগ তিনি প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে বেশী অভিযোগ লেখা রয়েছে তাঁর চোখের দৃষ্টিতে।

মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াবার মুহূর্ত্তেই নজর পড়ল ছেলের মুখের দিকে। ছেলের চোখেও সেই এক দৃষ্টি। অভিযোগ ভরা। ভাবটা এই—কেন তুমি মাকে বকতে গেলে!

সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল! যেতে যেতে মনে হল ছেলেটাও তার কাছ থেকে দূরে মামার বাড়ীতে থেকে তাকে বুঝলেও না চিনলেও না। তার সম্পর্কে ছেলেটার মনে কোনও সহানুভূতি নাই। পর হয়ে গেল ছেলেটা!

তার কপাল! এ ছাড়া আর কি বলবে সে! সে আস্তে আস্তে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে দোকান ঘরে ঢুকল! দোকানের গদীতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে থাকতে থাকতে আজকের সব কথাটা স্মরণ হতেই দুটি দীর্ঘ ধারায় তার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সব ক্ষোভ শান্ত হয়ে এল আস্তে আস্তে। কত, কত কাল ঐ সুন্দর সুকুমার মুখখানি সে দেখে নাই। কিন্তু ও মুখ কার মুখ? ভবসুন্দরীর? সে তো জানে না! একবার বালক বয়সে প্রথম সাক্ষাতের সময় সে জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু কোন জবাব মেলে নাই! তারপর আর জবাব পাবার সুযোগ সে পেলে না কোন দিন। জীবনের —আশ্চার্য্য মুহূর্ত্তে এক একবার আকস্মিকভাবে এসে উপস্থিত হয়। দেখতে না দেখতে, বুঝতে না বুঝতে, চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মিলিয়ে যায়। কেন আসে, কখন আসে তার স্থিরতা নাই। কত কত দিন প্রত্যাশা করে বসে থেকেছে, দেখা মেলে নাই। আবার না চাইতেই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে! একবার কৌতুক করে দেখা গিয়ে আবার মিলিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ সে নিজের জীবনটাকে অত্যন্ত সচ্ছ পরিষ্কার ভাবে দেখতে

পাচ্ছে। দুটো প্রবল বাসনা তার মধ্যে যে এমন ভাবে সংগুপ্ত ছিল তা কি সে জানত? নিভুর পিছনে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়েছিল এক তাড়নায়। দাসীই এক দিন সমাদর করে তাকে বুকে তাকে নিজের বাহু বন্ধনে আশ্রয় দিয়েছিল। শুধু আশ্রয় নয়, প্রশ্রয়ও দিয়েছিল। তার মূল্য দিতেও সে দ্বিধা করেনি। তার মধ্যে আর এক সুপ্ত তাড়নাকে সে যেন প্রয়োগে [illegible] করে তুলে নিজের তৃষ্ণাকে অধিকতর শক্তিশালী করে তুলেছিল।

আজ অকস্মাৎ আবার সম্বিত ফিরে এসেছে।

আজ হঠাৎ এক একটা কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে হাসি [illegible]চ্ছে আবার বিস্ময়ও লাগছে। আজ তার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে কি ক[illegible]রে বিবাহিতা স্ত্রী থাকতে আর একটি স্ত্রীলোকের সম্পর্কে তার উৎকণ্ঠায় আকুল ও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। কি করে সমস্ত মানুষের দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সেই স্ত্রীলোককে দিনের আলোয় একদা অনুসরণ করে ছুটেছিল। বিবাহের আগের কথাও মনে পড়ছে। নিভুর জন্যে সে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল। নিজের সে পাগলামোকে ক্ষমা করতে পারে সে। তখন তার বয়স ছিল নিতান্ত অল্প। জীবনের ও কোন কাজের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করবার মেজাজ কি শক্তি কোনটাই ছিল না তার তখন। কিন্তু নিজের বিবাহের পরও, সে উদ্দামতার কাছে কি করে এমন করে আত্মসমর্পণ করেছিল!

শুধু কি তাই! এই দীর্ঘ ক'টা বছর সে কি করে কাটিয়েছে। দেবতা নাই, ইষ্ট নাই, ধর্ম্ম নাই, গুরু নাই, কাটিয়েছে কেবল দাসীকে নিয়েই! দাসীর সঙ্গতেই বিহ্বল হয়ে কাটিয়েছে। যখন তার প্রত্যক্ষ সঙ্গ পায় নাই তখন মনে মনে শুধু তাকেই ভেবেছে সে! দাসীকে খুসী করবার জন্যে সে যা বলেছে, তাই করেছে প্রায় বিবেচনা না করে। দাসী তাকে যে দিকে চালনা করেছে সেই দিকেই চলেছে সে। এই দীর্ঘদিনের একমাত্র উদ্দেশ্যই তার যেন ছিল দাসীকে খুসী করা। আশ্চর্য, সব করেও সে দাসীকে খুসী করতে পারে নি পুরোপুরি।

এতো গেল এক দিক। অন্য দিকে অর্থলোভ। ওঃ এই ক' বছরে সে কী পরিমাণ অর্থগৃধ্নু হয়ে উঠেছে! দাসীকে দোষ দিয়ে লাভ কি? একদিন তো ছিল বাবা আর দাসী দুজনের এই আকাঙ্খার আগুনে সে জ্বলেছে এবং পুড়েছে। এই চাঁদ রায়ের ভিটেতে ঢুকে গুপ্তধন সংগ্রহের চেষ্টাকে সেই একদিন প্রাণপণ বাধা দিয়েছিল। অথচ আজ? আজ আবার দৈবক্রমে তিনটে মোহর পেয়ে তার বুকের ভিতরের আগুন আকাশস্পর্শী হয়ে খাণ্ডব

দাহনের মত জ্বলে উঠেছিল। দেবতাকে ধন্যবাদ, দেবতা তাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌতুক! যাকে সে-ই একদিন সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিহত করেছিল তারই গ্রাসে গিয়ে পড়ল সে নিজে!

সে একবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে। দিনের সাদা আলো রাঙা হয়ে এসেছে! বেলা পড়ে আসছে! হঠাৎ মনে পড়ল সারাদিন তার খাওয়া হয় নি, জল পর্য্যন্ত একটু খায়নি সে। কারো তাকে খাওয়াবার কথাও মনে পড়েনি। প্রথমে সমস্ত মনটা বিপুল ক্রোধে, তারপর এক অদ্ভুত অসহায় অভিমানে তার সমস্ত মনটা ছেয়ে গেল। দাসীকে নিয়ে ব্যস্ত তার মা, তার ছেলেরা। এমন কি দাসী নিজেও ব্যস্ত নিজেকে নিয়ে। এমন আশ্চর্য্য আত্মমগ্ন যে নিজের ছাড়া অন্য কারো কিছু ভাববার কথা তার মনে হয় না।

পরক্ষণেই তার হাসি এল। অকারণ এ প্রত্যাশা কেন তার? কি হবে প্রত্যাশা করে? যে প্রত্যাশ কখনও পূর্ণ হবে না, কখনও পূর্ণ হয় নি, মূর্খের মত সে প্রত্যাশা করে লাভ কি?

কিন্তু আশ্চর্য্য কথা! দাসীর মুখ দিয়ে সে যা বলে গেল তার অর্থ কি? 'যদি কোনও খ্যানত হয়', 'মোহর তিনটে দিয়ে ঠাকুরের পৈতে গড়িয়ে দেব'। তার অর্থ হল গাছ কেটো না, ভেতরে ঢুকো না। আর ভেতরে ঢুকবার আগেই যে তিনটে সোনার মোহর তুমি পেয়েছ তা নিজে ব্যবহার না করে দেবতার কাজে লাগিয়ে দাও। তা হলে আসল কথাটা হল—ও গুপ্তধন পাবার চেষ্টা করো না। যেটুকু পেয়েছ সেটুকুও নিজে না নিয়ে দেবতার সেবায় লাগিয়ে দাও।

তার চিন্তায় ব্যাঘাত পড়ল। কে ডাকছে—কত্তা মশাই! অতি কোমল কণ্ঠে শঙ্কিত কুণ্ঠিত ডাক।

—কে?

—আমি গো নিধে!

সে সস্নেহে ডাকলে—আয় রে নিধে! কি বলছিস?

নিধি কুণ্ঠিত হয়ে ঘরের ভিতর এসে বসল। বললে—এই এলাম একবার আপনাকার কাছে। এমুনি এলাম।

চন্দ্র হেসে বললে—বস।

নিধি জিজ্ঞাসা করলে—একটা কথা শুধাব কত্তামশায়?

—বল।

—আপুনি সব ঠিকঠাক করে গাছ কাটা বন্ধ করে দিলে কেন?

এর উত্তরে কি জবাব চাইছে নিধি তা অনুমান করা তার পক্ষে খুব কঠিন নয়। সে সেটা এড়িয়ে গিয়ে বললে—কোথা কি খ্যানত হয়ে যাবে বলে তোর বউ-ঠাকরুণ ভয় পাচ্ছিল। সেই জন্যে বন্ধ করে দিলাম।

নিধি খানিকটা উৎসাহিত হয়ে উঠল। সে বললে—আমি তো তারই লেগে বউ-ঠাকরুণের কাছে গিয়েছিলাম।

—কিসের জন্যে?

—আমি বউ-ঠাকরুণকে বললাম— গাছ কাটা বন্ধ হল তো কি হল? ইদিকে কাদরের ধারে জঙ্গলে অনেক ভাল ভাল জাম গাছ আছে, অর্জুন গাছ আছে। সবই তো আপনকাদের। আমি খুঁজে কাটিয়ে দোব। আপুনি কিছু ভেব না। আর তা ছাড়া—বলতে বলতে থেমে গেল নিধি।

—তা ছাড়া কি?

নিধি খানিকটা সরে এল তার দিকে। এসে বললে তা ছাড়া ঐ চাঁদ রাজার ভিটের যেখানে সব সোনা-রূপো পোঁতা আছে সে জায়গাও আমি দেখিয়ে দোব। তোমরা লোক লাগিয়ে কেটে খুঁড়ে খুঁজে লেবে! সব তোমাদের!

চন্দ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাহলে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে নিধির ভুল হয় নি। সে জিজ্ঞাসা করলে—তোর কি করে মনে হল যে পোঁতা টাকার খোঁজে গাছ কাটাচ্ছি?

নিধি কোনও জবাব দিলে না, শুধু বোকার মত হাসতে লাগল।

চন্দ বুঝলে ও বলতে চায় না। সে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তা তুই রাস্তা দেখিয়ে দিবি কি করে?

—আমি কি আর দোব? দেবে আমার মা! এখুনি সব শুনে মা মাগী বলছিল—কত্তাকে বলগা, আমি সব জায়গাটা জানি। আমি রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দোব। মা তো আমার আবার 'ডারপাউরে', ভয়ডর নাই। কাঠ কুড়ুতে, ডাল ভাঙতে তো হরদম যায় ভিটের ভেতর।

চন্দর চোখে জল এল। এই মেয়েটিই একদিন তাকে শাপশাপন্ত করেছিল, আর সেই আজ তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিতে চাচ্ছে! সে হেসে বললে—আমার ও টাকা চাইনা রে! ওতে আমার কাজ নাই!

নিধি জোর দিয়ে বললে—আপুনি না চাইলে কি হবে, বউ-ঠাকরুণ চায় তো! আর তা ছাড়া উ সব তোমাদের! তুমিই পাবে সব!

চন্দ অবাক হয়ে নিধির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই দৃষ্টির সংশয়ের মধ্যে কোথায় যেন মৌন সমর্থন পেলে নিধি। সে বললে—হ্যাঁ গো, উ সব তোমার। ঠাকরুণ তোমাকে অনেক সোনাদানা পাইয়ে দিয়েছে স্বপন দিয়ে। তাতেই তো তুমি জমিদারী কিনলে গাঁয়ের। ঠাকরুণের হুকুমে। আবার ঠাকরুণ তোমাকে বলেছে– আমার সব সম্পত্তি তোর!

চন্দ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর সে নিধিকে জিজ্ঞাসা করলে—গাঁয়ের লোকে বলছে বুঝি এই কথা?

নিধি ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে বললে—বলবে না? আপুনি ঠাকরুণের আশ্চয়ে আছ, লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ আপুনি! আপনকার হবে না তো কার হবে?

চন্দের কৌতূহল হল, একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে—তা লোকে কি কি বলছে?

—লোকে বলছে ঠাকরুণ আপনকাকে স্বপন দিয়ে ওই ভিটের কাছে জমি কিনতে বলেছিল। তাই আপুনি জমি কিনলে! জমি কিনে কাটাতে কাটাতে সাত ঘড়া মোহর পেলে। তারই খানিকটা দিয়ে আপুনি এই জমিদারী কিনলে! তা বাদে—

মাঝখানে বাধা দিয়ে চন্দ বললে—তা বাদে?

—তা বাদে ঠাকরুণের হুকুমে তুমি এখন ঐ ভিটের ভেতরে যে পোঁতা সোনা-দানা, এখন যখে আগুলে রেখেছে, সব তুমি পাবে। ঠাকরুণ তোমাকে দেবে বলেছে।

—দূর বোকা! মৃদু একটা ধমক দিলে চন্দ নিধিকে।

—এ্যাই দেখেন! লোকে বলছে গো!

—থাম তুই। কাজকর্ম্ম যদি থাকে কর গিয়ে।

—আপুনি রেগে গেলে? তা আমি কি করব? নোকে বলছে। বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে আবার ফিরে দাঁড়াল; মাথা চুলকে বললে—আপনি যদি রাগ না কর তো একটা কথা বলতাম কত্তা!

চন্দ তাকে অভয় দেবার জন্যে হাসল। হেসে লঘুভাবে বললে—বলে ফেল কি বলবে। অত ভনিতায় কাজ নাই, বুঝেছ?

নিধি আবার বসল। মাথা চুলকে বললে—আমার মামীকে তো আপুনি চেন?

—কে রে ?

—সেই ঝি গো আমাদের হারার বিটি ! যার একবার বিয়ে হয়েছিল পাশের গাঁয়ে। তা বাদে স্বামী মল। তখন আমার মামাকে সাঙা (দ্বিতীয় বিবাহ) করেছিল। তা বাদে মামা মাস ছয়েক হল মরেছে। এখন আর মামী খেতে পেছে না। খেতে না পেয়ে এখন আমাদের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তার খাবার একটা ব্যবস্থা করে দাও আপুনি।

চন্দর বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠল। সে জিজ্ঞাসা করল—হারার মেয়ে ? কোন্ মেয়ে হারার ?

—আপুনি খুব চেন তাকে। তাকে দেখেছ। তার নাম হল গা যেয়ে নিভু !

চন্দ গম্ভীর হয়ে বললে—হ্যাঁ, নিভুকে আমি চিনি। তা আমি তার জন্যে কি করব বল আমাকে।

—একটা পাট-কামের ব্যবস্থা করে দাও। আমার বাড়ীতে এসেছে। আমি তাকে কোথা খেতে দিতে পাব ?

—তা বেশ আমি বেশী করে ধানের ব্যবস্থা করে দেব। ধান ভেনে, চাল করে চলে যাবে। দরকার যদি হয় তো আমি এক আধ টাকা করে দোব। কেমন তা হলেই তো চলবে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা হলেই ঢের হবে। এই দেখেন, আপনকাকে বললাম আর অমুনি বেবস্থা হয়ে গেল ! এই ডণ্ডবৎ করছি এই ঠাঁই থেকে। চললাম আমি।

—শোন, শোন। বউ কেমন পাট-কাম করছে, কি সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে কই কিছু বললি না তো ! কোন দিন কিছু তো বলিস না !

—ইয়ের আবার বলব কি গো ! অল্প বয়েস, আপনকার বাড়ীতে গায়ে-গতরে খাটছে, খেছে, সুখে আছে। কোনও দুখ নাই। তা ছাড়া বউ-ঠাকরুণ তাকে খুব ভালবাসেন।

বড় খুসী হল চন্দ। হাসতে হাসতে বললে—কেমন ভালবাসে রে ?

—তা খুব বাসে গো ! এই দেখেন কেনে, বউয়ের সন্তান হবে আসছে মাসে। তা বউ-ঠাকরুণ তাকে ভারী কাজকম্ম করতে বারণ করে দিয়েছে। বলে—এই নিধুর বউ, তু' এখন কেবল বাসন ক'টা মাজবি। বাস্ আর কিছু করবি না। যখন কিছু খেতে মন হবে আমাকে বলবি !

হাতে জল খাবারের থালা হাতে দাঁড়াল দাসী। জিজ্ঞাসা করলে—কি

খেতে মন হল রে নিধু? তোর না তোর বউয়ের? তোর বউটাকে তো বলি চেয়ে চিন্তে নিতে, বললে মাথায় এত বড় ঘোমটা দিয়ে ঘাড় নেড়ে বলে —হোক। কিন্তু কোন দিন তো কিছু চাইতে দেখলাম না বাপু! আজকে ঠাকুরদের প্রসাদ কতকগুলো তিলপিঠালী ভাজা রেখেছি ওর জন্যে, খাবার সময় নিয়ে যাস। নিজে যেন মদের সঙ্গে খেয়ে দিস না। পোয়াতী মানুষের জন্যে রেখেছি, নিয়ে গিয়ে ওকে দিস। কেমন?

সুবোধ বালকের মত মাথা নেড়ে নিধু উঠে গেল। যাবার সময় বললে—আমাকে আজ দু'গণ্ডা পয়সা দিয়ো কেনে বউ-ঠাকরুণ!

—পয়সা কি করবি? এই সন্ধ্যে বেলায়?

—আপুনিই তো মনে পড়িয়ে দিলে। মদ খাবার মন হয়ে গেল তোমার কথা শুনে।

—আ মরণ তোমার!

হাসতে লাগল নিধি সেই বোকার মত সাধা হাসি। দাসী বললে—চল বাড়ীর ভেতরে, দিচ্ছি।

নিধি উৎসাহিত হয়ে বললে—আমি এখুনি কত্তাকে বলছিলাম,—কত্ত, তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ঠিক করে দোব। চাঁদ রাজার ঢিবির কোন খানে কি আছে সব আমার মা জানে! সে ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

দাসী আর চন্দ পরস্পরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিধির কথাগুলো শুনে। তারপর চন্দর দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে—থাক, জল খাও, সারাদিন খাওয়া হয়নি।

তার দিকে তাকিয়ে চন্দ বললে—থাক, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সন্ধ্যা করে তারপর খাব।

দাসী অবাক হয়ে বললে—তুমি তো সন্ধ্যা কর না। ও আবার কি ঢঙ?

চন্দ বললে—আজ থেকে আরম্ভ করব!

তারা পরস্পরের দিকে আবার চেয়ে রইল। অতি কাছের মানুষ, অথচ দুজনেরই মনে হল যেন অনেক দূর থেকে পরস্পরে পরস্পরের দিকে চেয়ে আছে।

সেই দূরত্ব আর ঘুচল না দু'জনের। বরং নিজেদের অজ্ঞাতে এবং অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। চন্দ মাঝে মাঝে নিজের মনেই বুঝবার চেষ্টা করে অবস্থাটা। এ যেন নদীর দুই কূলের দুই যাত্রা, স্রোতের

টানে দুই সমান্তরাল রেখায় ভেসে যেতে যেতে এক অনিবার্য্য বন্যার তাড়নায় পরস্পরের খুব কাছে গিয়ে পড়েছিল, আবার সেই স্রোতের টানে দূরে এসে পড়েছে। ফিরতে চাইলেও ফিরবার উপায় নাই। তবে এটা ঠিক যে রেখা ধরে দাসী সাঁতার কেটেছে সেখান থেকে সে সরে আসেনি। সরতে সরে গিয়েছিল সে-ই। সরে তার কাছে গিয়েছিল, আবার দূরে সরে এসেছে।

এমনি করেই তো কেটে গেল ক'টি বছর। এই ক' বছরে সংসার থেকে সে যেন আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। দাসীই যেন তাকে গুটিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। এখন বলতে গেলে দাসীই প্রায় সব দেখাশুনা করে। দোকান, তেজারতি, জমিদারী, চাষ-বাস এ গুলোর মধ্যে আস্তে আস্তে সবই দাসী নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। কেবল দোকানটি আছে চন্দর হাতে। এ যেন তার একটা কাজ চাই বলেই তার হাতে রেখেছে। দোকানও অবশ্য এখন অনেক বড় হয়েছে। আশপাশের বহু গ্রাম গ্রামান্তর থেকে খুচরো এবং পাইকারী খরিদ্দার পর্যন্ত তার দোকান থেকে মাল নিয়ে যায়। এখন মালপত্র রাখবার জন্যে মস্ত গুদাম করতে হয়েছে। এ সব দেখাশুনার জন্যে একজন উপযুক্ত লোক চাই। চন্দর চেয়ে উপযুক্ত লোক আর কোথায় মিলবে? তা ছাড়া ওর ভেতর কাচা পয়সা। নিজে না দেখলে সব চুরি হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

মধ্যে মাঝে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থিত হয় দাসী। সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যা-জপ শেষ করে সে যখন গিয়ে বাড়ীর ভিতরে আমগাছতলার বেদীতে বসে তখন পাথরের বাটিতে সামান্য ছানা আর চিনি, আর হাতে জলের ঘটি নিয়ে স্বামীর সামনে নিত্য-নিয়মিত হাজির হয় দাসী। এ কর্তব্য-টুকু সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। এই টুকুই তার সঙ্গে স্বামীর সংসারের ঘনিষ্ঠ যোগ। সেই সময় একদিকে জল খায় চন্দ, অন্য দিকে দাসী আপনার নূতন পরিকল্পনার কথা জানায়।

একদিন বললে—আচ্ছা, তোমার দোকানের সঙ্গে যদি ধান কেনার ব্যবস্থা করি কেমন হয়?

স্ত্রীর মুখের দিকে চন্দ চেয়ে রইল খেতে খেতে। খাওয়া শেষ করে বললে—ভালই হবে। কিন্তু ও কাজ কে করবে তোমার?

—আমি ভবেশের সঙ্গে কথা বলেছি। ওর ভাই জংশনে ধানকলে কয়ালের কাজ করেছিল, এখন বসে আছে। তুমি মত দিলে তাকে রেখে কাজটা আরম্ভ করি।

—কর। ছোট উত্তর দিলে চন্দ।

হেসে ঘাড় নেড়ে স্বামীর কাছ থেকে যেন একটা অপ্রাপ্য বস্তু আদায়ের চেষ্টা করে দাসী বললে—অমন 'কর' বললেই তো শুধু হবে না। তোমাকেও একটু নজর দিতে হবে, দেখতে হবে। তা না হলে সব চুরি হয়ে যাবে।

হেসে রসিকতার ভঙ্গিতে মনের ক্ষোভটা প্রকাশ করলে চন্দ—ও, এই জন্যেই বুঝি বললে আমাকে?

আশ্চর্য্য দাসী আজ রাগল না, শুধু একটু ম্লান হেসে বললে—তা বলতে পার! তোমার যদি তাই মনে হয়, তাই বলে যদি তুমি খুসী হও তবে তাই-ই।

চন্দ তাকে সান্ত্বনাও দিলে না, তেমনি হেসে বললে—ও কথা যাক। মনের কথা মনেই থাক। তোমার ধান কেনা-বেচার কারবার আমি দেখে দেব।

এঁটো পাথরবাটি আর ঘটিটা নিয়ে চলে যেতে যেতে বললে—বেশ। দিও।

চাকর তামাক সেজে হুঁকো এনে হাতে দিলে। সে আপন মনে একটু হেসে হুঁকোতে টান দিলে। লাভ নাই, দাসীর সঙ্গে ভাল কথা, মন্দ কথা, কোন কথা বলেই লাভ নাই। কোন কথাই তার পরিকল্পিত ছোটার পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারবে না। কি অদম্য তৃষ্ণা! টাকা, টাকা, টাকা! কি হবে এত টাকা নিয়ে? এত সম্পত্তি নিয়ে? অনেক তো হয়েছে! আর কেন?

সেই কথাটাই সে বলছিল একদিন কিছুকাল আগে। অমনি একদিন সন্ধ্যার সময় দাসী বললে—জান ভবেশ বলছিল পাশের মৌজা চন্দনপুর বিক্রী আছে। দামও সস্তা, লাভও ভাল। বারশো টাকা আদায়, পৌনে তিনশো টাকা কালেকটারী। দশগুণ দাম পেলেই বিক্রী করে দেবে। জমিদারেরা এখন খুব অভাবে পড়েছে। কিনব?

চন্দ হেসে বলেছিল—তোমার কিনবার খুব ইচ্ছে?

দাসী হেসে বলেছিল—তা আছে। কিন্তু তুমি না বললে কি করে কিনি?

চন্দ হেসেই বলেছিল—আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর আমি কিনতে বারণ করব। বলব কিনো না। কি হবে এত সব নিয়ে? এত টাকা, জমি, সম্পত্তি নিয়ে কি করবে? তোমার তো অনেক আছে। আর কেন?

দাসী রেগে উঠেছিল, বলেছিল—এই সব ভাল কথা শুনবার জন্যে তোমাকে তোমার মত চাই নাই।

বলতে বলতে জলে উঠেছিল দাসী—তোমার অনেক আছে? নয়?

তোমার তাই ধারণা? তাই এই অজ পাড়াগাঁয়ে খুব খুসী মনে বসে বসে ভগবানের নাম কর আর তামাক খাও। তোমার কতটুকু আছে? মানুষের কত থাকতে পারে তা তুমি ভাবতে পার? আমার এতটুকু আছে, আমি তাকে অনেক অনেক বাড়িয়ে তুলব। আমি তোমার মত সাধু পুরুষ নই।

চন্দ চুপ করে থেকে গম্ভীর হয়ে বলেছিল—শোন।

দাসী শোনে নি, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আর কিছু শোনবার দরকার নাই। তুমি যখন চাও না তখন কিনব না। কথা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে সে চলে গিয়েছিল।

সেইদিনই চন্দ বুঝেছিল কথাটা। একে কিছু বলে লাভ নাই। এর মতে মত দিলে খুসী হবে, এর মতে মত না দিলেও রাগ করবে। কিন্তু তাতে ওর চলার বাধা হবে না। ও এ পথে না গিয়ে অন্য পথে যাবে।

পরদিনই ভবেশকে ডেকে বলেছিল—তোমাদের চন্দনপুর কেনার কি হল ভবেশ?

সঙ্কুচিত হয়ে ভবেশ বললে—আজ্ঞে বউ-ঠাকরুণ তো বারণ করলেন। বললেন—ও, সম্পত্তি কেনা হবে না। আপনার না কি মত নাই!

ও কথাকে পাশ কাটিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—লাভ কত সম্পত্তির?

—তা আপনার নীট লাভ শ আষ্টেক টাকা। কালেকটারীও খুব কম। দাম চাইছে দশ গুণ।

—তা হলে কিনে ফেল। আর কি?

অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে ভবেশ বললে—তা হলে আজকেই আমি গিয়ে কথাটা পাকা করে আসি। সম্পত্তিটা কেনবার বড় ইচ্ছা বউ-ঠাকরুণের। যাবার আগে একবার বউ-ঠাকরুণকে বলে যাই।

একটু হেসে চন্দ বললে—তাই যাও।

সন্ধ্যার সময় হাতে খাবার থালা বুকে এক বুক অভিযোগ নিয়ে দাসী এসে দাঁড়াল তার সামনে। খাবারের থালা সামনে ধরে দিয়ে সে বললে—তুমি কথাটা আমাকে ডেকে বলতে পারলে না? তোমার মত আছে এইটা আমাকে জানতে হল ভবেশের কাছ থেকে?

তার চোখ ছলছল করছে। দেখেও চন্দ কিছু বললে না। সে চুপ করে রইল। কি বলবে সে? বলে তো কোন লাভ নাই!

এমনি করেই দুজনে দুজনের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। দুজনেরই

মনের মণিকোঠার দরজা দুজনেরই কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদি কোনদিন কোন আকুলতা কি মমতার উত্তাপে সে দরজা খুলে যায় তখন সেখানে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে প্রবেশলাভের জন্যে কোন প্রত্যাশী দাঁড়িয়ে থাকে না। সে দরজা আবার কখন আপনি বন্ধ হয়ে যায়। চন্দর বেলা তো তাই ঘটে। এক এক দিন কোনও আকস্মিক মুহূর্ত্তে সব কাজ ফেলে দিয়ে দাসীর কাছে গিয়ে অসঙ্কোচ হাসি মুখে দাঁড়াবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়—কি লাভ হবে গিয়ে? কি লাভ হবে বলে? দাসী যদি ব্যঙ্গ করে হাসে? কাজ নাই, আর ওতে কাজ নাই।

দাসীর বেলা ঠিক অমনটি ঘটে না। কোন কোন দিন মুখে হাসি নিয়ে, তাকে যথাসম্ভব সংগোপন রেখে, স্বামীর কাছে ছুটে আসে। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ করে ভিন্ন পথে প্রকাশ করতে যায়। গিয়ে কলা-কৌশলের অভাবে ব্যর্থ হয়। চন্দর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মার খেয়ে চুপ করে যেতে হয় তাকে। পরক্ষণেই বিপুল ক্ষোভে তাকে আঘাতে জর্জ্জরিত করে নিজে আহত হয়ে ফিরে যায়।

এমনি করেই চন্দ শেষ পর্য্যন্ত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

অনেকদিন পর যেদিন সে জানলে স্বামী নিভুকে ধান ভানার ব্যবস্থা থেকে জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে দিন মনে মনে বেশ কৌতুক অনুভব করলে। তার সঙ্গে সেই পুরোনো দিনের আবেগও যেন প্রাচীন দিন থেকে উজান বেয়ে এল। সে কৌতুক করবার জন্যেই কথাটি মনে মনে তৈরী করে রাখলে।

সন্ধ্যার সময় জলখাবারের থালা হাতে স্বামীর কাছে গিয়ে বললে—কি, পুরানো প্রেম বুঝি এখনও ভুলতে পার নি?

কৌতুককে অভিযোগ মনে করে তার মুখের দিকে তাকাল চন্দ। অন্ধকারে দাসীর মুখ ঢাকা। সে মুখে কি লেখা আছে পড়তে পারলে চন্দ। সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে -কি বলছ বুঝলাম না, খুলে বল তো!

দাসী হেসে বললে—তা বুঝতে পারবে কি করে? বুঝতে না চাইলে কি করে বোঝাই বল! নিভুকে নাকি ধান ভেনে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা তুমি করে দিয়েছ?

চন্দ গম্ভীর ভাবে বললে—হ্যাঁ দিয়েছি। কেন?

দাসী মনে আহত হল। চন্দ তার কথা বুঝতে পারলে না? এর কৌতুকটুকু ধরতে পারলে না? মনের ভিতর একটা বেদনা পাক খেয়ে

উঠল। তবু নিরীহভাবে বললে—না, তাই বলছিলাম—পুরানো প্রেম এখনও ভুলতে পার নি!

একটু চুপ করে থেকে চন্দ বললে—তুমি যা বললে তাতে একটা কৈফিয়ৎ তুমি চাও মনে হচ্ছে। একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার তরফ থেকেও দরকার শোন, জিজ্ঞাসা করলে যখন বলি—পুরানো প্রেম কেন, কোন প্রেমই মনে রাখতে পারলাম না দাসী। ভাল তো তোমাকেও বেসেছিলাম, কিন্তু ভালবেসে কি তোমাকেই ধরে রাখতে পারলাম, না মনে রাখতে পারলাম!

চাপা গলায় হেসে উঠল দাসী, বললে ভালবাসাবার ক্ষমতাই নাই তোমার।

—যা বল মেনে নেব। তোমাকে কিছু বলেও কোন ফল নাই। সে আমি ভাল করে জানি।

চাপা গলায় আবার হেসে উঠল দাসী, বললে আমাকে বলে কোনও ফল নাই না! তোমাকে বলে রাখি এই মেয়েটাকে আমি গাঁ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ব।

বলে সে আর অপেক্ষা করলে না। চাপা হাসি হাসতে হাসতে ছুটে চলে গেল।

পিছন থেকে গলাটা একটু উচু করে চন্দ বললে—ও, তবে জেনে রাখ, আমিও চলে যাব গাঁ থেকে যে দিকে দুচোখ যায়।

অন্ধকারের মধ্যেই ছুটে যেতে যেতে দাসী একবার থমকে ফিরে দাঁড়াল। তারপর একবার আপনার আঁচলটা টেনে নিয়ে নিজের মুখের কাছে তুলে আবার ছুটে চলে গেল।

চন্দর হঠাৎ মনে হল—দাসী কি তা হলে কাঁদছিল? কেঁদেই যদি থাকে তো কাঁদুক। চন্দর কি আসবে যাবে?

এমনি করে আঘাত আর প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে দুজনে। চন্দ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে।

পরদিন ভোরে নিধিকে ডেকে সে বললে—ওরে নিধু, তুই তোর মাসীকে তার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে থাকতে বল। ঘর তুলতে যা লাগে আমি দোব। মাসে মাসেও কিছু করে দোব। তাতেই কষ্টেসৃষ্টে ওর চলে যাবে। বুঝলি?

নিধি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ চটে গিয়ে বললে—আমার কথা বুঝলি না কি?

নিধি ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—আপনকার কথা বুঝব না কিগো? আপনি হাঁ করলেই কি বলবে তা বুঝতে পারি!

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় সে একবার অছিলা করে নিধির বাড়ীর পাশ দিয়ে ঘুরে এল। ভাঙা দেওয়ালের অবকাশে দেখলে একটি শীর্ণ প্রৌঢ়া উনুনে জাল দিচ্ছে। কম্পিত আগুনের রক্তাভ শিখায় তার মুখখানা স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ নিভুই তো! চোখের দৃষ্টির মধ্যে সেই উজ্জলতা, সেই দীপ্তির কোন অবশেষ নাই। স্তিমিত ম্লান দৃষ্টি, চোখের কোণ থেকে দু পাশে দুটো গভীর রেখা, গালটা ভেঙে গিয়েছে। শীর্ণ মুখের মধ্যে নাকটা খাঁড়ার মত দাঁড়িয়ে আছে। চুলে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। শীর্ণ শরীর একখানা জীর্ণ ছেঁড়া কাপড়ে ঢাকা! আহা-হা কি মেয়ে কি হয়ে গিয়েছে? তার চোখে জল এল। সে তাড়াতাড়ি সরে চলে এল সেখান থেকে।

এই ভেঙে-যাওয়া, নিঃসহায় মানুষের উপর না কি রাগ করে? এর উপর না কি কোন আসক্তি আসে? দাসী অবশ্য সব জেনে বুঝেই বলেছে! আহা, এই মানুষকে যদি সে ভাল বাসতে পারত তবে তো বেঁচে যেত! তা সে পারে কৈ? দাসীকে ভালবাসতে গিয়েই কি ভালবাসতে পারলে? বুকে যে এখনও কত ভালবাসা উথল-পাতাল করে মরছে, বেরুবার পথ না পেয়ে বুকের ভিতর পাক খেয়ে সমস্ত মনে টনটনানি তুলছে। তারই প্রতিকার হল না!

সে হন হন করে মনের আবেগে বাড়ী ফিরে এল। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কর্ম্মচারীরা চলে গিয়েছে সব। এসে হাত পা ধুতে যাবে, সন্ধ্যার সময় হয়ে গিয়েছে।

দরজার কাছে একটা লণ্ঠন দেওয়া থাকে। সে ঢুকেই দেখলে একটি ছোট্ট মেয়ে, নয় দশ বয়েস, বসে আছে। অন্ধকারে মুখখানা দেখা যাচ্ছে না।

তবু সে অনুমানে বুঝলে কে বসে আছে। তার মনের সমস্ত ক্ষোভ এক মুহূর্ত্তে মিলিয়ে গেল। সে অত্যন্ত সরস সকৌতুক কণ্ঠে বললে—এটা কে বসে আছে রে?

যে মেয়েটি লণ্ঠনের পাশে বসেছিল সে নড়ে চড়ে বসল, বদ্ধাঞ্জলি-করা সুগৌর রোগা রোগা হাত দুটি সরে গিয়ে হাতের রূপোর বালা দুটি আলোয় চকচক করে উঠল। মৃদু সুরেলা কণ্ঠে বললে—আমি গো সিন্দু (সিন্ধু)!

অত্যন্ত সরস ভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে চন্দ বললে—তুমি সিন্দু?

—হ্যাঁ গো! তেমনি সুরেলা গলায় জবাব দিয়ে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল।

চন্দ হাসতে লাগল। তার হঠাৎ মনে হল একজনকে, এমনি একজনকে অনেক কাল আগে সে দেখেছিল। সে নিভু! শুধু নিভু কেন? নিভুর আগে

নিধির মা! সেও বোধ হয় এমনি ছিল। তবে কেউ বা উগ্র, কেউ বা চপল, কেউ বা শান্ত। এ মেয়েটার সুরেলা কথার মধ্যে এমন একটি কারুণ্য আছে, কথায় এমন একটি সকরুণ বেদনা আছে, বড় বড় চোখের কালো তারায় এমন শান্ত গভীরতা আছে যে একমুহূর্তে মনকে স্পর্শ করে। মনে হয় একটু শক্ত করে কিছু বললেই যেন মেয়েটা এখুনি কেঁদে ফেলবে।

সে অত্যন্ত মিষ্টি করে বললে—ও হ্যাঁ মা সিন্ধু, তুমি উঠে দাঁড়ালে কেন মা! বস!

মেয়েটি আবার চুপ করে আস্তে আস্তে লণ্ঠনের পাশে বসে পড়ল।

হেসে তার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে চন্দ বললে—মা সিন্ধু আমাদের বড় সরমের মানুষ গো!

সিন্ধু একবার মুখখানা তার মুখের দিকে তুলে তাকাল! এক মাথা তেল-সপসপে, টান করে-বাঁধা চুলের নীচে ছোট্ট মসৃণ কপালে টানা টানা দুটি ভুরুর নীচে বড় বড় গোল চোখ দুটি আরও বড় বড় করে চন্দর দিকে চেয়ে রইল।

চন্দ বললে—অমন করে চেয়ে চেয়ে কি দেখছিস মা আমার মুখে? আমার মস্ত বড় কালো মুখ, এই মোটা নাক, লাল লাল চোখ দেখে তোর ভয় লাগছে বুঝি?

সিন্ধু মাথা নামিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। চন্দ খুশী হয়ে বললে এই আমাদের সিন্ধু হেসেছে এইবার! দেখি, দেখি, লণ্ঠনটা দেখি তো!

বলে অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সিন্ধু যেখানটায় বসেছিল সেখানটায় চারিপাশ দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ দেখে সে বললে—কই, সব কোথায় গেল?

সিন্ধু সভয়ে বললে—কি

চন্দ বললে—কেন মুক্তো? এই যে তুই হাসলি, কত মুক্তো ঝরে পড়ল, সেগুলো সব রাখলি কোথায়?

সিন্ধু কিছুই বুঝতে না পেরে বললে মুক্তো কি?

—এই মাটি করলি! মুক্তো কি এখন তাকে বোঝাই কি করে? জানিস বেটি, তোর সব ভাল, তবে তুই একটু বোকা! মুক্তো দেখিস নি? তোর মা-ঠাকরুণের কানে আছে। এক রকমের দামী পাথর, গয়না করে পরে। তা তুই হাসলি, তোর হাসি এত সুন্দর যে মুক্তো ঝরে পড়ল তো! সেগুলো বুঝি চাঁদ রাজার ভিটেতে পাঠিয়ে দিলি। আমাকে দিলে তো পারতিস! আমি কেমন সেগুলো বিক্রী করে বড়লোক হতাম!

মেয়েটা এতক্ষণে রসিকতাটুকু ধরতে পেরে হেসে সারা হল।

চন্দ হেসে বললে—এইবার বুঝেছিস তা হলে? আয় আমার সঙ্গে।

তাকে নিয়ে গিয়ে আম গাছতলায় বেদীর উপর পাশে বসিয়ে দিয়ে বললে—এইখানে বসে থাক, আমি জপ করে আসি। নড়বি না কিন্তু! চুপ করে বসে থাকবি!

সন্ধ্যা করে এসে সে পাতা পাটির উপর বসল। দাসী জল খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চন্দ বললে—আমার মাকে আগে দাও, তবে তো আমি খাব!

দাসী জলখাবারের থালাটা রেখে একটু সস্নেহ হাসি হেসে চলে গেল।

এই হাসিটুকুর একটি ইতিহাস আছে। প্রথম প্রথম যখন একখানা গামছা পড়ে রোগা ডিগডিগে মেয়েটা তার মায়ের সঙ্গে এ বাড়ীতে আসত তখন থেকে এর আরম্ভ। তার মা মাথায় অনেকখানি ঘোমটা দিয়ে কাজ কর্ম্ম করে বেড়াত আর সে আমগাছের তলায় বেদীর উপর চুপ করে বসে থাকত, কথা বলত না, খেলা করত না, শুধু চুপ করে বসে থাকত। কেবল গাছের ছায়া সরার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াকে অনুসরণ করে সরে সরে বসত।

এইখানেই সিন্ধুর সঙ্গে চন্দর আলাপ। তাকে দেখলেই চন্দ রসিকতা করে বলত—এ মেয়েটা কে রে।

সিন্ধু চোখ বড় বড় করে, ঢোক গিলে, সুরেলা গলায় বলত—আমি 'সিন্ধু' গো!

—তুমি সিন্ধু? আর চন্দ! তা হলে তুমি আমার মা! তোমার পেট থেকেই তো আমি হয়েছি তা হলে? নাকি?

মেয়েটা তেমনি চোখ বড় বড় করে, কিছু বুঝতে না পেরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

এই সময়েই একদিন একান্তে দাসীকে সে বলেছিল—এই মেয়েটা সত্যি সত্যি আমার মায়ের মত দেখতে। ওকে একটু আদর যত্ন ক'রো!

দাসীও মেয়েটাকে বড় ভালবাসে। সে-ই ওই রূপোর বালাজোড়া তাকে গড়িয়ে দিয়েছে! সেদিন সকালে তার হাতে নূতন রূপোর বালা দেখে বড় খুসী হল চন্দ। তাকে সমাদর করে বললে—বা রে, বড় সুন্দর মানিয়েছে তো তোর হাতে! নিধের তা হলে জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে, তোকে বালা গড়িয়ে দিয়েছে দেখছি।

চোখ বড় বড় করে শান্ত মৃদু কণ্ঠে সে বলেছিল—বাবা দেয় নাই। মা ঠাকরুণ দিয়েছে! আমার হাতে পড়িয়ে দিয়ে বললে—সিন্ধু পড়!

এক মুহূর্তে তার চোখে জল এসেছিল। মনে মনে দাসীর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছিল। তার চোখে জল দেখে পাঁচ বছরের সিন্ধু মুখ গম্ভীর করে, চোখ বড় বড় করে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কাঁদছ কেনে? মা-ঠাকরুণ আমাকে বালা দিয়েছে বলে কাঁদছ? কেঁদ না। আমি তোমাদের বালা লোব না। খুলে দিচ্ছি।

চোখের জল মুছে হেসে ভেঙে পড়ল চন্দ। হো হো করে হাসতে হাসতে দাসীকে ডেকে বললে—শোন, শোন, সিন্ধু কি বলছে শোন!

সব বলে সে সিন্ধুকে বললে—তোর মা-ঠাকরুণ বড় লোক। তোকে বালা দিয়েছে। আমি গরীব লোক আমিও তোকে একটা কিছু দোব। বল কি নিবি?

সিন্ধু বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর একবার তাকালে দাসীর মুখের দিকে। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে—আর কিছু লোব না!

আবার হাসতে লাগল দাসী আর চন্দ। হাসি থামিয়ে দাসী বললে—নিবি, নিবি। কি নিবি বল, গোট না হার?

মেয়েটা আবার ঘাড় নেড়ে বলে—না, কিছু লোব না!

—নিবি, হার নিবি। গোট কোমরে ছোট হয়ে যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই হার গড়িয়ে চন্দর হাতে দিয়েছিল দাসী। সিন্ধুর গলায় পড়িয়ে দিয়ে চন্দ বলেছিল—আমার মাকে দিলাম।

এই হল 'মায়ের' ইতিহাস।

দাসী আলাদা থালায় খাবার এনে সস্নেহে তার হাতে দিয়ে বললে—খা!

এই বিশেষ সমাদরের একটা কারণও আছে। বাড়ীতে জ্ঞানেন্দু আর ধ্যানেন্দু কেউ-ই থাকে না। চন্দ আর দাসীর পিতৃ মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ নিজের ছেলেদের সিক্ত করবার সুযোগ না পেয়ে এই শান্ত সুন্দর মেয়েটির উপর বর্ষিত হয়। জ্ঞানেন্দু বরাবর জংশনে মামার বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করছে। ধ্যানেন্দু ওরফে ধানুর যখন লেখাপড়ার বয়স হল তখন চন্দ বলেছিল—ধ্যানেন্দুকে আর মামার বাড়ী পাঠিয়ে কাজ নাই। ও আমার কাছেই পড়ুক।

দাসী সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করেছিল—কেন?

তার প্রশ্ন শুনে একটু থতমত খেয়ে চন্দ বলেছিল—দুটো ছেলে মোটে

আমাদের। তার একটা তো বরাবরই বাইরে। আর একটা! সেটাও যদি থাকত আমার কাছে!

—তোমার কাছে থাকলে তোমার সুবিধা হবে বটে, ছেলে নিয়ে তুমি ঘর করতে পারবে। কিন্তু তাতে ওর কি সুবিধা হবে? লেখাপড়া না করে তোমার কাছে আদর খেলেই ওর চলবে?

—হয়তো চলতে পারে। কিন্তু তুমি তো তা হতে দেবে না!

—দেবই না তো!

—ইংরেজী লেখাপড়া আমি তো শিখিনি, আমার তো চলে যাচ্ছে!

—তোমার চলেছে, ওদের চলবে না। ইংরেজী না শিখলে, টাকা-সম্পত্তি থাকলেও, সমাজে খাতির হবে না!

চন্দ চুপ করে থাকল। একটু পরে বললে—আর তা ছাড়া শ্বশুর বাড়ীতে আর কতদিন রাখবে ওদের?

—তোমার শ্বশুর বাড়ী। কিন্তু আমারও নয়, ওদেরও নয়। আমার বাপের বাড়ী, ওদের মামার বাড়ী। আর তা ছাড়া আমার ছেলেরা কেবল চারটি ভাতই খাবে তাদের কাছে, আর কিছু নেবে না, নেয়ও না। চারটি ভাত খেলে আমার বাবার ভাতে কম পড়বে না, বুঝলে!

বুঝতে না চাইলেও বুঝতে হল চন্দকে।

এ অবশ্য অনেক দিনের কথা। তারপর দুই ভাই-ই গিয়েছে জংশনে। সেইখান থেকেই লেখাপড়া করছে। আগে শনিবার রবিবার তারা আসত। জ্ঞানেন্দুর আসার খুব একটা টান না থাকলেও তাকে আসতে হত ধানুর জন্যে। ধানু মাকে ছেড়ে প্রথম প্রথম থাকতে পারত না। দাসীই ওরকম ভাবে আসা শেষ পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলে। সোমবার ভোরে যাবার সময় ধানু কাঁদতে আরম্ভ করত, যেতে চাইত না। চন্দ অবশ্য তাতে মনে মনে খুসীই হত, কিন্তু মুখে কিছু বলত না, বলতে সঙ্কোচ হত! দাসী নরম-গরম করে বলত—কেঁদো না, যাও গাড়ীতে গিয়ে ওঠ। আজ আমাকে, তোমার বাবাকে ছেড়ে ইস্কুল যেতে কাঁদছ, পরে যখন এখানকার লেখাপড়া শেষ করে বিলেতে যেতে হবে তখন কি হবে? এমন করে কাঁদলে লেখাপড়া হবে না। যাও, উঠে পড় গাড়ীতে।

তারপর ক্রমে ক্রমে ওদের মন বসে গেল। ওদের আসাও বন্ধ হয়ে গেল।

সেও অনেক দিনের কথা। আজ সিন্ধুকে জল খেতে দিয়ে, স্বামীকে জলের ঘটি এগিয়ে দিতে দিতে মৃদুস্বরে দাসী বললে—কই, নিধিতো এখনও ফিরল না? অন্ধকার হয়ে গেল।

চন্দ হেসে বললে—অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, এখুনি এসে যাবে। গেছুর পরীক্ষা শেষ হবে, তারপর বাড়ীতে গিয়ে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবে, তবে তো আসবে! রাত্তির হবে পৌছুতে!

তারপর সিন্ধুর দিকে চোখ পড়তেই সে দেখলে সিন্ধুর খাওয়া হয়ে গিয়েছে, তাদের কথার ফাঁকে এঁটো পাত্রটি ধুয়ে, জায়গাটায় এঁটো ঘুচিয়ে, হাত ধুয়ে আবার চুপটি করে বসে আছে সিন্ধু। চন্দ সব দেখে শুনে বললে—সিন্ধু কত লক্ষ্মী মেয়ে দেখেছ?

দাসী হাসলে সস্নেহে। এই এক জায়গায় তাদের দু'জনেরই গভীর মিল।

চন্দ বললে—এইবার বাড়ী যা। রাত হয়েছে! এখুনি ঘুম আসবে।

সিন্ধু মাথা নেড়ে বললে—না, ঘুম আসবে না!

চন্দ হাসতে লাগল—হারামজাদী, ঘুম যেন ওর বাপের চাকর!

দাসী বললে—আজ ওর ঘুম আসবে কি? দাঁড়াও, ওর দাদাবাবুরা আসবে। ও দেখবে তবে যাবে! ওই-ই তো নিজের মাকে ধরে নিয়ে এসেছে। ওর দাদাবাবুরা এলে তাদের দেখে, বাবার সঙ্গে বাড়ী যাবে!

স্বামীর দিক থেকে ফিরে সিন্ধুকে দাসী বললে—যা, দেখ গিয়ে বোধহয় ভাত তরকারী হয়ে গিয়েছে। দিনের মাছ আছে, ডাল আছে। ভাত খেয়ে নিগে যা!

সিন্ধু ঘাড় নেড়ে বললে—না!

—না কি! যা খা গিয়ে। তা না হলে ওরা এসে পড়লে তখন হৈ-চৈ হবে। আর রাত্রি হয়ে গেলে ঘুমিয়ে যাবি, খাওয়া হবে না!

—খাব না। এখুনি খেলাম তো! খিদে লাগে নাই।

সস্নেহে ধমক দিয়ে উঠল দাসী—যা, যা বলছি কর।

খেয়ে এসে আবার সেইখানে চুপ করে বসল সিন্ধু।

চন্দ বললে—তুই শো এইখানে, ওরা এলে আমি তোকে ডেকে দোব।

সিন্ধু আবার ঘাড় নাড়লে। না, সে জেগেই থাকবে।

চন্দ হেসে বললে—সিন্ধু মা, তোর সব ভাল, তবে তুই বড় জেদী! থাক, জেগে বসে থাক, ঘুমিয়ে পড়ে গেলে কিন্তু আমার দোষ নাই! কেমন?

সিন্ধু ঘাড় নেড়ে জানালে—আচ্ছা!

ওদের আসা পর্য্যন্ত সিন্ধু কিন্তু জেগেই থাকল। গাড়ীর চাকার আওয়াজ, আর তার বাবা নিধির গরুকে থামাবার হুকুম দেবার শব্দ শুনেই সে-ই সর্ব্বপ্রথম নেচে উঠল। চীৎকার করে বললে—ওগো মা-ঠাকরুণ, ওরা এসে গেইছে

গো! এসে গেইছে। ছুটে এস! বলতে বলতে সে নিজে ছুটে চলে গেল সদর দরজার কাছে।

তাকে অনুসরণ করে হাসি মুখে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দাসী আর চন্দ।

গাড়ী থেকে প্রথমে নেমে এল ধানু। তারপর গেনু।

দু জনেই মা-বাবাকে প্রণাম করতেই তাদের দুজনের পিঠে দুখানা হাত দিয়ে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল চন্দ।

হাসি মুখে দুই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন পরীক্ষা হল রে?

—ভাল হয়েছে। ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করে যাব।

অনির্ব্বচনীয় আনন্দে চন্দর মনটা ভরে গেল।

—কিন্তু একটা কথা বাবা, ধানু ভাল করে পড়াশুনা করছে না। এবার এ্যানুয়্যাল পরীক্ষায় দুটো তিনটে বিষয়ে ফেল করেছিল।

একটা ধাক্কা খেলে চন্দ। বড় ছেলের মুখের থেকে ছোট ছেলের দিকে তাকিয়ে সে চমকে গেল। দুই হাত আড়াল করে বড় ভাইকে সে ভেংচি কাটছে সংগোপনে। অন্য কেউ দেখতে পায়নি।

যাকে ভেংচি কাটা হয়েছে সে কিন্তু দেখতে পেয়েছে ঠিক। সে বাপের পাশ থেকে সরোষে বলে উঠল—অসভ্যতা করিস না ধানু। অন্যদিন হলে চড় মেরে গাল ভেঙে দিতাম।

এবার আর ভেংচি কাটার জন্য গোপনতার প্রয়োজন হল না। প্রকাশ্য ভাবে মুখভঙ্গি করে বললে—কই মার দেখি, তোর গায়ে কত জোর আছে দেখি!

গেনু বিরক্ত হয়ে অপরিসীম ঘৃণার সঙ্গে বললে—ছেলেটা চাষা হয়ে গেল একেবারে!

এবার বাধা দিলে চন্দ। সে এতক্ষণ অপরিসীম কৌতূহলের সঙ্গে দুই ভাইয়ের এই ঝগড়া উপভোগ করছিল। সে এবার বাধা দিলে, মৃদু তিরস্কার করে ধানুকে বললে—ছি বাবা, দাদাকে কি অমনি করে?

এমন সময় জিনিসপত্র নামানো শেষ করে, হাতে শালপাতা দিয়ে মোড়া দু'টো হাঁড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল নিধি। হাঁড়ি দু'টো নামিয়ে সে চন্দকে বললে—কত্তা আমাকে একবার হুকুম দেন কেনে, আমি একবার ছোটবাবুকে দেখি। মোছে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখি খানিকক্ষণ, তা হলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারই লেগেই তো মোছ রেখেছি।

সকলেই হাসতে লাগল। ধান্নু চড়ে গিয়ে বললে—কই রাখ দেখি, তোমার মোছ ছিঁড়ে দেব না?

—আচ্ছা কাল সকালে দেখব দাঁড়াও।

গেন্নু হেসে বললে—জান বাবা, আমি প্রথম নিধুকাকাকে দেখে চিনতেই পারি না। এই ইয়া টাঙির মত গোঁফ, এ কে রে বাবা? তারপর হেসে কথা বলতে তবে চিনতে পারি!

চন্দ হাসতে লাগল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে—ও হাঁড়িতে কি আছে রে?

গেন্নু বললে—একটাতে মোরব্বা আছে। বড় মামা এনেছিল। দিদিমা দিয়েছে। আর একটায় বালুসাই।

—বালুসাই!

ধান্নু এতক্ষণ কথা বলতে না পেয়ে হাঁক পাঁক করছিল, সে বলে উঠল—ওগুলো দাদা তৈরী করিয়ে এনেছে তোমার জন্যে। তুমি বালুসাই খেতে ভালবাস বলে।

চন্দ একবার ছোট ছেলে একবার বড় ছেলের মুখের দিকে চাইলে। তার মনটি আনন্দে ভরে গেল। পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামায় কি সুন্দর মানিয়েছে ওদের দুজনকে! বিশেষ করে গেন্নুকে। কৈশোরের প্রান্ত থেকে যৌবনে পা দেবার মুখেই পা তুলেছে যেন। সুন্দর নয় বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য আছে দুজনেরই। তার উপর কৈশোরের লাবণ্যে মুখ খানা ঢল ঢল করছে। কত পরিচ্ছন্ন বেশ-বাস, কথাবার্ত্তা। মনটাও তেমনি হয়েছে লেখাপড়া করে।

দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—হাঁড়ি দুটো তুলে রাখ। তবে তার আগে আমার সিন্ধুকে দাও।

—দেবো। আগে ঠাকুরদের জন্যে তুলে রাখি। কিন্তু সে কৈ?

—ঐ যে। সকলের পেছনে মায়ের আঁচল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেমন করে তাকিয়ে আছে দেখ। চোখ দুটো বড় বড় করে!

সত্যিই তো! অবাক হয়ে বিস্ময়-বিহ্বলের মত দুই চোখ বিস্ফারিত করে সে নবাগত দুজনকে দেখছিল।

চন্দ হেসে বললে—এই হারামজাদী সামনে আয়। কাকে দেখছিস অমন করে? আয় এখানে।

সে ততক্ষণে মায়ের পিছনে লুকিয়ে পড়েছে। সে কাকে দেখছিস সে-ই জানে

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে এসে গেছ ছিল সেবার মাস দুয়েক। বাড়ীতে সে কি আনন্দ কোলাহল! সব হৈ-চৈ! হল্লা, আনন্দ!

ছেলেদের আসার উপলক্ষ্যে চন্দ যেন মেতে উঠেছে। সংসারে আসক্তি আবার দ্বিগুনিত হয়ে ফিরে এসেছে যেন। দাসীর সঙ্গে ও ভবেশের সঙ্গে পরামর্শ করে কাছাকাছি আর একটা গ্রামের জমিদারী কিনে ফেললে সে। আদায় অনেক, রাজস্বও অনেক। লাভ খুব বেশী নয়। দাসী কিনতে বারণ করেছিল—লাভ বেশী নয়, কি হবে কিনে?

ভবেশ বলেছিল—তা বটে, লাভ বেশী নয়, আয় হবে না। তবে মা, একটা কথা! জমিদারীটা আপনার কাছেই। গ্রাম থেকে জংশন যেতে গেলে,—এই তো খোকাবাবুরা আসেন যান—এ গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যাবার পথে একবার কাছারীতে পায়ের ধুলো দিয়ে গেলে সবাই এসে মান-খাতির করে যাবে। তার আস্বাদ আলাদা মা। তা ছাড়া ও গ্রামের সব আপনার দোকানের খদ্দের, আপনার খাতক। ওটা কিনলে আপনার এ কাজের সুবিধা হবে কত! আর সব চেয়ে বড় কথা, কর্ত্তার কিনবার মন হয়েছে। উনি তো নিজে দেখেন না কিছু, ওর সখ নাই কিছুতে। কাজেই উনি যখন চাইছেন তখন আপনি আর আপত্তি করবেন না।

দাসী সব বুঝে আর আপত্তি করে নাই। কথা আরম্ভ হবার সাতদিনের মধ্যে সে সম্পত্তি কেনা হয়ে গিয়েছিল।

শুধু কি তাই! চাঁদা দিঘীর আট আনা ছিল জমিদারের। বাকী আট আনা অন্যের হাতে ছিল। সে আট আনাও ছোট ছেলের মত ব্যগ্র হয়ে উঠে চড়া দামে কিনে ফেললে চন্দ। কিনে একদিন গ্রামান্তর থেকে জেলে আনিয়ে মাছ ধরিয়ে মহাসমারোহে মাছ খাওয়ালে ছেলেদের। নিধুকে একটা বড় মাছ দিয়ে বললে—যা নিয়ে যা, খা গিয়ে। গ্রামের লোকদের বাড়ী ধরে ধরে হিসেব করে করে মাছ পাঠিয়ে দিলে।

নিধু বললে—এত বড় মাছ নিয়ে আমি কি করব গো?

—কেন খাবি?

—খাবো তো! আমি আর আমার মা, আমরা দুজনায় আর কত খাব? আমার সিন্ধু আর বৌ তো দুবেলাই তোমাদের বাড়ীতে খাচ্ছে। তা মাছ খাব, তেল দাও, নয় তেলের দাম দাও। না হলে মাছ রাঁধব কিসে?

চন্দ হেসে বললে—তুই বড় রসিক রে। দোকান থেকে আধ সের তেল নিয়ে যাস। আমি বলে দেব।

নিধি বললে—এই তো আপনকার গুণ গো। বৌ-ঠাকরুণকে বললে তিনিও দিত, তবে অনেক বকুনির পর দিত। তা আমি একটা কথা বলছিলাম!

-বল!

—বলছিলাম কি, বড় দাদাবাবু তো লেখাপড়া করলে। আর পড়ে কি হবে? এইবার বিয়ে দিয়ে কাজকর্ম্ম দেখতে শেখাও কেনে?

কথাটা যে চন্দর ও মনে হয় নি তা নয়। হয়েছে। তবে এ কথাও মনে হয়েছে—আর কিছুদিন যাক। ছেলেটা এখনও বড় ছোট আছে।

কথাটা সে বলেও ছিল দাসীকে। দাসী শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে স্বামীকে বলেছিল—কি বলছ কি তুমি? পাগল হয়ে গেলে নাকি?

চন্দ অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল—না, না, আমি ঠিক তা বলিনি। আমি বলছি আর দু এক বছর যাক তারপর।

ঘুরে দাঁড়িয়ে দাসী বলেছিল—মানে? এই ষোল বছর বয়স ছেলের, এরই মধ্যে বিয়ে দেবে কি? এখন লেখাপড়া করুক। গেনু আমার এম. এ. পাশ করবে, ল' পাশ করবে, তারপর ও উকীল হবে। তখন বিয়ে দোব ওর ভাল ঘর দেখে। ধানুকে আমি ডাক্তারী পড়াব। এখন বিয়ের নাম ক'রো না।

চন্দ চুপ করে থাকল।

দাসী বললে—আমার নিজেরই কি সাধ-আহ্লাদ নাই? তবু আমার সাধ-আহ্লাদের চেয়ে ওদের ভবিষ্যতটা বড়। সেই ভেবেই চুপ করে থাকি। আর তুমি একবার ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো না ওর কি মত, ওর কি ইচ্ছে?

চন্দ আর কথা বলেনি। দাসীর, তার ছেলের মতই বহাল থাকুক। তার মত জেনেও কারুর কাজ নাই।

হঠাৎ দাসী উপরের বারান্দা থেকে ধমকে উঠল—এই, এই ধানু, ছাড়, ছাড়। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত? তোর হাড় ভেঙে দোব গিয়ে, দাঁড়া তুই। আর গেনু, তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস, ওকে দু ঘা মেরে ছাড়িয়ে দিতে পারছিস না?

—বলেছি মা ধানুকে, ধানু কথা শোনে না। কি করব?

চন্দ উঠে দাঁড়াল। উপরের বারান্দা থেকে দেখলে ধানু সিন্ধুকে মেরেছে। গেনু নিষেধ করা সত্ত্বেও মেরেছে। দাসী শাসন করবার জন্যে ছুটে নেমে গেল।

চন্দ্র উপরের বারান্দা থেকে সকৌতুকে দেখতে লাগল। তার এই কলহ, মারামারি বড় ভাল লাগে। সবল তরুণ কণ্ঠের চীৎকারে, হাসিতে তার শান্ত নিস্তব্ধ অঙ্গন উৎসব-মুখর হয়ে আছে এটা কিছুতেই কেউ বোঝে না। সে তো জীবনে বেশী কিছু চায় না আর। ধর্ম্মপথে থেকে চারটি খেতে পরতে পেলেই তার চলে যাবে। দাসী তিল তিল করে কত করেছে, আরও কত করবার চেষ্টা করছে। এতোর কিছুই প্রয়োজন নাই তার। সে শুধু এমনি প্রতি মুহূর্ত্তের উৎসব-মুখর সংসারে সামান্যে তুষ্ট হয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

দাসী গিয়েই সর্ব্বপ্রথম দু ঘা লাগিয়ে দিলে ধানুকে। ধানু মার খেয়ে সরে দাঁড়াল।

সিন্ধু অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলে উঠল—আমার লাগে নাই মা-ঠাকরুণ। আমার লাগে নাই।

গেনু বললে—জান মা, যেদিন থেকে আমরা এসেছি সেই দিন থেকে সিন্ধুকে ছুতোনাতা করে ধানু মার দেয়। মেয়েটাও আচ্ছা। মার খেয়ে কাঁদবে না কিছুতে।

—আজ কি হয়েছিল কি? দাসী জিজ্ঞাসা করলে।

—আজ ও এক গোছা সাদা ফুল নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। ধানু বুঝি চেয়েছিল, তা ও দেয় নাই, বললে—আমার ফুল, আমি এনেছি, আমি দোব কেন? তারপর আমি চাইতেই আমাকে দিলে। আমি দু ভাগ করে এক ভাগ আমি নিলাম, আর এক ভাগ ওকে দিলাম। ও ফুলটা নিয়ে দিয়ে ওকে মারতে লাগল, বললে—আমি চাইলাম আমাকে দিলি না, ওকে দিলি কেন? কেন দিলি? ও মার খেয়ে বললে—আমার মন, আমি দিলাম। —তোর মন? বলে আবার ধানু ওকে মারতে লাগল।

ফুল? কি ফুল? ঐ তো এক গোছা সাদা ফুল মাটিতে পড়ে আছে! কুর্চি ফুল? কুটজ কুসুম! ফুলের গুচ্ছটা মারামারির ভেতর আংশিক ভাবে দলে গিয়েছে।

দাসী এইবার তিরস্কার করছে সিন্ধুকে—তোর মার খেয়ে এখানে পড়ে থাকার কি দরকার? তুই আর আসিস না ওরা যতদিন এখানে আছে। তা তুই তো কথা শুনবি না। এইখানে পড়ে থাকবি! মার খাবার জন্যে আসা?

সিন্ধু সকাতর মিনতি করে বললে—আমি সত্যি বলছি আমার লাগে নাই মা-ঠাকরুণ!

দাসী রাগের মধ্যেও হাসল, বললে—মরণ তোমার, মার খাবে সেও ভাল,

তবু আসা চাই! তাই এস, এসে মার খেয়ে মর তুমি। আমি আর কিছু জানি না! বলে হাসতে হাসতে চলে গেল দাসী।

চন্দ এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। প্রথমেই ছোট ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিলে সে। আদর করে তাকে বললে—ছিঃ বাবা, তোমাদিকে ভালবাসে, তাই আসে। ওকে মারলে কি চলে? আর তা ছাড়া ও মেয়ে মানুষ। মেয়ে মানুষের গায়ে কি হাত দিতে আছে?

সমাদর পেয়ে ধানুর অভিমান আবার কর্কশভাবে আত্মপ্রকাশ করলে—আমাকে ফুল দিলে না কেন? এবার আমার সঙ্গে লাগতে এলে গতর ভেঙে দোব আমি!

চন্দ সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে—ওর সঙ্গে যেন আর লাগতে যেও না মা! বলে তাকেও কোলের কাছে টেনে নিলে। ধানু তার কোলের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

—কৈ দেখি তোর কোথায় লেগেছে?

সিন্ধু দেখাতে চায় না। সরু সুরেলা গলায় ঘাড় নেড়ে বললে—আমার লাগে নাই কোথাও।

গেনু পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে বললে—লেগেছে আমি দেখেছি। বাঁ হাতটা ছড়ে গিয়েছে।

সিন্ধুর আপত্তি সত্বেও তার বাঁ হাত খানা টেনে নিয়ে দেখে চন্দ বললে—সত্যিই তো, এ যে অনেকটা ছড়ে গিয়েছে, তোর মায়ের কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে নিয়ে আয়তো বাবা!

গেনু চলে গেল, ফিরে এল আইডিন নিয়ে।

—ওটা কি?

—আইডিন। লাগিয়ে দি। একটু জলবে বুঝলি!

সে আইডিন সযত্নে লাগিয়ে দিলে কাটা জায়গাটায়। মেয়েটা মুখ কুঁচকে একবার নিজের কাটা জায়গাটা দেখে, একবার গেনুর মুখের দিকে বড় বড় চোখ করে তাকায়। তার ভঙ্গি দেখে চন্দ এবং গেনু দু জনেই হাসতে লাগল। সিন্ধু লজ্জা পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। গেনু গেল আইডিনের শিশি রাখতে।

চন্দ আস্তে আস্তে ফুলের গোছাটা তুলে নিলে। দলিত অংশটা ফেলে দিয়ে একবার গন্ধ নিলে। আঃ, কি কোমল, সুমিষ্ট গন্ধ! আজ এই গন্ধের সঙ্গে অকস্মাৎ কোন্ দূর কালের একটা ছবি স্মৃতিতে ভেসে উঠল। এক সুকুমারী কিশোরী তার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে অপরাহ্নের

আলোছায়া মেখে হাসছে! তখন কতই বা বয়স তার! ঐ ধাতুরই মত সে
...।

গেছু এসে আবার দাঁড়াল তার কাছে।

সমাদর করে ছেলেকে নিজের পাশে জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললে—বস।

ছেলে বসতেই চন্দ বললে—একটা কথা ভাবছিলাম মনে মনে।

ছেলে তার দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকাতেই সে বললে—ঠাকরুণের দয়ায় আমার নিজের জমি-জমা অনেক আছে। তাই ভাবছি ঠাকরুণের নামে আমি বিঘে কুড়ি জমি দেবোত্তর করে দি। তার ধান থেকে গ্রামের গরীব দুঃখীদের সময়ে অসময়ে দেওয়া চলবে। তুমি কি বল?

ছেলেকে 'তুমি কি বল' এ কথা জিজ্ঞাসা করলেও, ছেলে যে কি জবাব দেবে তা সে জানে! তারই ছেলে তো!

ছেলে কিন্তু জবাব দিয়ে অবাক করে দিলে তাকে। সে বললে—ভূতে খাবার জন্যে কি জন্যে জমি নষ্ট করবে বাবা? এই তো আমি কলকাতায় যাব প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ব। মাসে ষাট সত্তর টাকা করে লাগবে। এই জমিটা থেকেই তোমার আমাকে পড়াবার অর্দ্ধেক খরচা উঠে আসবে। কি জন্যে অন্যকে দিয়ে নষ্ট করবে? তোমার অবিশ্যি ঠাকরুণের দয়ায় টাকার অভাব নাই। তবু পরকে কি জন্যে দেবে?

চন্দ স্তম্ভিত হয়ে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ কে? এ তার সন্তান? তার জ্যেষ্ঠ সন্তান? তার কল্পনা, তার উদারতা সম্পর্কে তার এই শ্রদ্ধা? এত সঙ্কীর্ণ, এত ছোট মন? এই পরিচ্ছন্ন বেশ-বাস, মুখের এই সুচারু সুবিন্যস্ত কথার আড়ালে কি মন? ছি! ছি! ছি!

কিছুক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতেই ছেলে কেমন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। সে উঠে যাবার উদ্যোগ করছে দেখে চোখের সেই দৃষ্টি সম্বৃত করে নিয়ে চন্দ বললে—বস। তুমি বিবেচকের মতই কথা বলেছ। সংসারে তোমার উন্নতি হবে! তবে এত অল্প বয়সে এতখানি বিবেচনা নাই বা শিখলে!

কথাগুলো শান্ত মৃদু কণ্ঠে বললেও সে বলার মধ্যে যে সুতীব্র জ্বালা ছিল তার স্পর্শে ছেলেটি ছটফট করে উঠল।

নিদারুণ ক্রোধে তখন চন্দর মনের ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্রোধটা হল দাসীর উপর। ছেলের কি দোষ! ছেলে তার কাছে কবে আসতে পেলে,

বসতে পেলে, যে সে তাকে বুঝবে, ভালবাসবে, সম্মান করবে। সে তো পর ওর কাছে! ওকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? আহা বেচারী।

সে কথার সুর পরিবর্ত্তন করে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় পড়বে বললে? কলকাতায় কি কলেজ বললে যেন!

ছেলে সঙ্কুচিত হয়ে বললে—প্রেসিডেন্সি কলেজ?

—সেটা বুঝি খুব ভাল কলেজ?

ছোট ছেলে, আগের মুহূর্ত্তের কথাগুলো ভুলে গিয়ে সে এবার উৎসাহিত হয়ে উঠল, বললে—সব চেয়ে ভাল কলেজ, দেশের সব ভাল ছেলে, বড় লোকের ছেলে সব সেখানে পড়ে! খুব ভাল লেখা-পড়া হয় সেখানে?

—আমাদের বর্দ্ধমানেও তো কলেজ আছে! সেখানে ভাল পড়া হয় না?

বাবার অজ্ঞতা দেখে হাসল ছেলে, বললে—হয়তো হয়! কিন্তু প্রেসিডেন্সির মত কি?

—তা বেশ, সেইখানেই পড়বে। তোমার মা জানেন?

—মা-ই তো বলেছে আমাকে। মায়ের সঙ্গে কথা বলেই তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি। মা বলেছে খরচের জন্যে কোন চিন্তা নাই।

চন্দ্র হাসল। হেসে চুপ করে গেল।

সন্ধ্যাবেলা দাসীর সঙ্গে দেখা হতেই দাসী বললে—পরশু খোকার ইস্কুল খুলবে, ও কাল যাক।

—যাক। নিঃস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলে চন্দ্র।

—আচ্ছা, তুমি খোকাকে কি বলেছ জমিজমা নিয়ে? ও কাঁদছিল আমার কাছে!

অবাক হয়ে গেল চন্দ্র, বললে—কি বলেছি তাকে? কই না, কাঁদবার মত কিছু বলিনি তো?

—কি জানি কাঁদছিল, বলছিল বাবা আমাকে বকলে—বেশী বিবেচক হয়ো না এখন থেকে। যাই হোক, ওকে ডেকে একটু আদর করে দিও।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সকালের কথাগুলো। ওঃ, বাপের সেই সামান্য কথায় ছেলের অঙ্গে ফোস্কা পড়েছে। ওঃ কি ভয়ঙ্কর! তার সমস্ত অন্তঃকরণ বিষাক্ত হয়ে উঠল। সে স্পষ্ট অনুভব করলে একটা বিপরীত মনোভাব ছেলের মধ্যে ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ছেলেটা হয়েছে একেবারে মায়ের মত। অনুদার, স্বার্থপর, সম্পদলিপ্সু, আত্মার দৃষ্টিহারা। সংসারে তাকে বোঝবার, তার মতে চলবার মানুষ নাই। সে একটা নিঃশ্বাস ফেলে—দোষ।

তবে আমার আদরে তার খুব প্রয়োজন নাই। সেটা আমি এই ক'দিনেই বুঝেছি।

দাসী মুখ ভার করে বললে—তোমার যেমন কথা।

চন্দ একটু কঠিন হয়েই বললে—ঠিকই বলেছি। ও ছেলে তোমার দুঃখ ঘোচাবে। আমার কিছু প্রত্যাশা নাই ওর কাছে।

দাসী রাগ করে চলে গেল। চন্দ নিঃশ্বাস ফেললে। একা বসে থাকতে থাকতে দেখলে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে ওরা দুই ভাই বসে আছে। আর বাইরে দরজার কাছে হাঁ করে বিহ্বল হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে বসে আছে সিন্ধু। সে ডাকলে—সিন্ধু, ও সিন্ধু। শোন!

সিন্ধুর যেন কোন সাড় নাই!

আবার ডাকতে সিন্ধু চমকে উঠে সেখান থেকে ছুটে উঠে এল। এসে দাঁড়াল তার কাছে। জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে ডাকছিলে?

—হ্যাঁ। বস।

তার সঙ্গে আবোল-তাবোল গল্প করে সে তাকে ছেড়ে দিতেই সে আবার গিয়ে বসল ওদের কাছে।

ধান্থ চলে গেল। তার কিছু দিন পরে নায়েব ভবেশের সঙ্গে কলকাতা চলে গেল জ্ঞানেন্দু। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে। সে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছে। দাসী চোখে জল, মুখে হাসি নিয়ে ছেলেকে বিদায় দিলে। বললে—তুমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পড়তে চললে মনে রেখো। যেন অসৎ সঙ্গে মিশো না, কোনো খারাপ কাজ ক'রো না যাতে বংশের মুখে কালি পড়ে।

চন্দ দাঁড়িয়ে থাকল পাথরের মূর্ত্তির মত। সে ছেলেকে কোনো উপদেশ দিলে না, সৎকথা বললে না। ছেলে প্রণাম করলে শুধু একটি কথাই বললে—সাবধানে থেকো। গিয়ে চিঠি দিও।

তার আর কিছু বলার দরকার নাই। ও যা হবে তা সে বুঝে নিয়েছে এখন থেকেই। সে কি চায় তা আর ছেলে বুঝতে পারবে না কোন দিন। পারলেও সে নিজের পথ ছেড়ে আর তাকে খুসী করবার জন্যে নিজের চরিত্র বদল করে তার পথে হাঁটতে পারবে না। যা দুস্তর ব্যবধান ঘটবার তা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

নিধি নিজের গোঁফে তা দিয়ে বললে—কই, বড় দাদাবাবু, এস, ওঠ গাড়ীতে। তোমার কোন ভাবনা নাই বুঝলে! তোমার যখন দরকার হবে

তখুনই কত্তাকে লিখো আমি গিয়ে সব ঠিক করে দিয়ে আসব। আবার তোমার সেই আজব সহর দেখা হয়ে যাবে।

ব্যথা লঘু হয়ে এল তার কথায়। সেই লঘুতার মধ্যেই গাড়ী ছেড়ে দিলে। দাসী চোখের জল মুছতে মুছতে বাড়ীর ভিতর চলে গেল সিন্ধুর হাত ধরে, বাড়ীর ভিতর এসে আমতলায় বেদীর উপর বসল।

সিন্ধুর মুখখানা অত্যন্ত ম্লান। দেখে চন্দর অত্যন্ত মায়া হল। জিজ্ঞাসা করলে—কি রে, তোর খিদে পেয়েছে নাকি?

সিন্ধু সজোরে মাথা নাড়লে। তার খিদে পায়নি!

—তবে? তবে কি মন-কেমন করছে?

ঘাড় নেড়ে সিন্ধু জানালে—হুঁ! তার পরেই ফোঁস ফোঁস করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

চন্দরও চোখে জল এল। সে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—কাঁদিস না, এই তো পূজোর ছুটিতে আবার আসবে সব। তখন তোর জন্যে কানের সোনার মাকড়ী আনতে লিখে দোব গেনুকে। চুপ কর।

দাসী পার হয়ে যাচ্ছিল। তার কান্না দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি হল ওর আবার?

—ওর মন কেমন করছে গেনুর জন্যে! চন্দ ওর পিটে হাত বুলোতে বুলোতে বললে।

দাসী অবাক হয়ে বললে—কার জন্যে?

চন্দ হেসে বললে—গেনুর জন্যে?

দাসীর চোখে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটে উঠল। সে বলে উঠল—আ মরণ! তার আবার কান্নার কি আছে? তারপর কঠোর কণ্ঠস্বরে বললে—এই ছুঁড়ি, আদিখ্যেতা করে কাঁদতে হবে না। চোখ মুছে চুপ করে বস। নয় তো আপনার বাড়ী গিয়ে কাঁদ! এইখানে এই সময়ে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে বসল—যেন ওর কোন সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সিন্ধু চোখের জল মুছে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দাসীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল।

চন্দ বললে—কেন মিছিমিছি বকলে বেচারীকে।

তারপর সে সস্নেহে ডাকলে—ওরে সিন্ধু! ও সিন্ধু!

দাসীর রাগটা পড়েছে ততক্ষণে। সে বললে—তাকে পাবে কোথায়? সে পালিয়েছে এ চত্বর থেকে।

পরদিন সকালে দোকানে বসে থাকতে থাকতে দেখলে সিন্ধু তাদের বাড়ী থেকে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার হাতে যেন একটা কি। সে ডাকলে দোকান থেকেই—ওরে ও সিন্ধু! শোন, শোন!

সিন্ধু বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল।

—কাল অমন ছুটে চলে গেলি কেন? এ্যাঁ? হাতে ওটা কি রে?

মুখ নীচু করে হাতের জিনিসটা সে বাড়িয়ে দিলে চন্দরের দিকে।

চন্দ হাতে নিয়ে দেখলে একখানা ছেঁড়া খাতা। গেন্নুর।

—কি করবি রে? এই ছেঁড়া খাতা নিয়ে?

সিন্ধু কোন উত্তর দিলে না। মুখ নীচু করে রইল।

চন্দ তার হাতে খাতাখানা দিতেই সে ছুটে চলে গেল।

চন্দ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল খাতাখানা নিয়ে মেয়েটা কি করবে! যা হয় করবে ছেলে মানুষের মন!

চারটে বছর পার হয়ে গেল।

দাসী আরও দু তিনটে জমিদারী সম্পত্তি কিনেছে এক বছরে। জমিও বাড়িয়েছে অনেকটা। দোকান-ব্যবসাও আপনা-আপনি নিজের স্বাভাবিক গতিতে বেড়েছে। কিন্তু আর এক দিকে অপ্রত্যাশিত লোকসান হয়ে গেল চিরকালের জন্য। সে লোকসান আর মেরামত হবে না কোন দিন। ধানু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করে বাড়ীতে এসে বসল।

দাসীর তাতে অত্যন্ত আশাভঙ্গ হয়েছে। সে চেয়েছিল ধানু আবার পড়ুক, পড়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করুক। সে জোরও করেছিল। কিন্তু ছেলে জেদ ধরে পড়ল—সে আর পড়বে না। সে বাবার সঙ্গে বাবার কারবার আর সম্পত্তি দেখবে।

চন্দ মনে মনে যে খুব দুঃখিত হয়েছিল তা নয়। যাক, দাসী এবার ছেলের কাছে জব্দ হয়েছে। তবে সুখীও হয়নি। ছেলের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার পিছনে যে তার অবহেলা দুঃশীলতা রয়েছে, এটা আকস্মিক নয়—এটা সে ঠিকই বুঝেছিল। তবু সে নির্ব্বিবাদে মেনে নিলে।

একবার একটু দুঃখের হাসি হেসেছিল। এ বেশ হল। সংসারে থাকবার মধ্যে স্ত্রী আর দুই ছেলে। স্ত্রী টাকা টাকা করে পাগল। বড় ছেলে সঙ্কীর্ণমনা, মন তার বস্তুসর্ব্বস্ব, আর ছোট মূর্খ, গোঁয়ার, দুঃশীল। এ বেশ হয়েছে! সংসারে সে একা, একেবারে একা। তাকে বোঝার, তার পথে

চলার মানুষ তার আপনজনের ভিতর মিলল না। আহা! সিন্ধুর মত অমনি যদি তার একটা মেয়ে থাকত!

ধান্নু সত্যি সত্যিই মন দিয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা করতে আরম্ভ করলে। তবে সে অত্যন্ত কর্কশভাষী। নিধির সঙ্গে তার প্রায়ই খিটিমিটি লাগছে। তাকে বার বার তিরস্কার করেও সংশোধন করা যাচ্ছে না। বেশী তিরস্কার করলে সে আবার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে বন্য মহিষের মত রক্তাক্ত চোখে মাথা নীচু করে তিরস্কারীর দিকে তীর্য্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। চন্দ তো দূরের কথা, দাসী পর্য্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলে!

সংসারটা চন্দর কাছে যেন কেমন অসুন্দর হয়ে উঠেছে। সিন্ধুও আজকাল বেশি আসে না। সে বড় হয়ে গিয়েছে। তের চোদ্দ বছর বয়স হল তার। তার মা-ই একা এসে কাজকর্ম্ম করে যায়। চন্দ বা দাসী বিশেষভাবে ডেকে পাঠালে তবে আসে। এমনিই সে শান্ত। আরও শান্ত হয়ে গিয়েছে সে।

দাসী মাঝে তাকে একদিন তিরস্কার করেছিল। খামার বাড়ীতে বেশ সংগোপনে একটা মড়াইয়ের আড়ালে তাকে কি বলছিল ধান্নু। দূর থেকে সিন্ধুর কাপড়ের প্রান্তদেশটা দাসীর নজরে পড়েছিল। সে একটু এগিয়ে গিয়ে সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখেই ব্যাপারটা বুঝেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিল—সিন্ধু!

চমকে উঠে ছুটে এসে সিন্ধু তার কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

কঠিন কণ্ঠে দাসী বলেছিল—ওখানে কি করছিলি? সোমত্ত মেয়ে না তুই।

সিন্ধু চুপ করেই ছিল। মাথা তুলতে পারে নি।

কঠোরতর স্বরে দাসী আবার প্রশ্নের পুনরুক্তি করেছিল—ধান্নু কি বলছিল তোকে? ঠিক বলবি!

সিন্ধু জবাব না দিয়ে মাথা নেড়ে ছিল খালি যার অর্থ দুই-ই হতে পারে। হয় কিছু বলেনি নয় তোমাকে বলব না।

দাসী তাকে কঠিন মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—কাল থেকে তুই আর আসবি না এ বাড়ীতে না ডেকে পাঠালে।

সব শুনে চন্দ ম্লান হেসে বলেছিল—তুমি ওকে মিছেই বকলে দাসী। দোষ তো সিন্ধুর নয় তা তুমি ভাল করে জান। দোষ আসলে তোমার ছেলের!

সখেদে দাসী বলেছিল—তা কি আমি জানি না মনে কর। সব জানি। কিন্তু ও চণ্ডালকে আমি কি বলব? বললে কি হতভাগা শুনবে? এই মাত্র

বছর. সতের আঠারো বয়েস, এরই মধ্যে নানান ধরনের চতুরিতে তৈরী হয়ে গিয়েছে।

চন্দ্র হেসে বললে—কর্ম্মফল।

—কর্ম্মফল? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলে দাসী।

—কর্ম্মফল ছাড়া আর কি? তবে তোমার কপাল নয়। কপাল আমার।

সেই থেকে আর আসে না সিন্ধু। অন্তত না ডাকলে আর আসে না।

কিন্তু এরও ব্যতিক্রম হল।

বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে গেনু বাড়ী এল। আবার সমারোহ লেগে গেল বাড়ীতে। না ডাকতে সিন্ধু অবিশ্যি আর আসে নি। দাসী তাকে ডেকে পাঠাতে সে হাজির হল এসে।

কঠিন তিরস্কার করার জন্য মনে মনে বোধ হয় দাসীর একটু অনুশোচনা হয়েছিল। সে বললে—কি রে সিন্ধু, আর যে আসিসই না এদিকে। মধ্যে মাঝে তো আসতে হয়।

সিন্ধু মুখখানি হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘর থেকে একটি ছোট ভেলভেটের বাক্স বের করে এনে তার হাতে দিয়ে দাসী বললে—গেনুকে আনতে বলেছিলাম তোর জন্যে।

সিন্ধুর মুখখানি অতি সলজ্জ নম্র হাসিতে ভরে উঠল। বাক্সটি হাতে নিয়ে বললে—এ কি গো?

—আ মরণ তোমার। তাও জান না! কানের গয়না। কানপাশা। কই পর দেখি, আমার সামনে পড়, কেমন লাগে দেখি!

সিন্ধু দুই কানে অনেক কষ্টে পাশা দুটো পড়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার সুগৌর মুখখানা আনন্দে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

—বাঃ খাসা মানিয়েছে! ওই, ওই, চললি কোথায়। ও হারামজাদি! কোন বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই তোর। নতুন গয়না উঠল অঙ্গে, আগে তুলসীতলায় আর ঠাকুরের মন্দিরে পেনাম করে আয়। তারপরে যা কত্তাকে পেনাম করে এসে আমাকে পেনাম কর। তবে তো! বড় হয়েছিস, এসব শিখতে হয়।

সব প্রণাম সেরে যখন সিন্ধু দাসীকে প্রণাম করতে এল তখন গেনু এসে মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে। মায়ে ছেলেতে বোধ হয় ছেলের বিয়ের কথা হচ্ছিল। ছেলে বলছে—অত তাড়াতাড়ি করছ কেন, আর কিছুদিন যাক, বিয়ের তো অসময় হয় নাই। এম, এ. টা পাশ করি তারপর যা হয় ক'রো।

সিন্ধু এসে দাঁড়াতেই তাদের কথায় ছেদ পড়ল। গেনুকে দেখে সিন্ধু

কেমন লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল। সে ভাল করে গায়ে কাপড়-চোপড় জড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে দাসীকে প্রণাম করলে, তারপর ঘুরে গেনুকেও দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলে।

গেনু দ উঠল—ওরে , আমাদের সিন্ধুর কত ভক্তি গো! আমাকেও প্রণাম করছে। আচ্ছা, প্রণামের পুরস্কারও দেব আমি সিন্ধুকে। একখানা ছাপা শাড়ি দেব। আমার বাক্সের তলায় আছে। কাল দোব।

লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে সিন্ধু চলে যাচ্ছিল। দাসী তাকে ডেকে বললে —এখন যাস না। ভাল মাছ আছে। এখানে খেয়ে যাস।

তারপর দিন থেকে সিন্ধুর আস্তানা হয়ে গেল চন্দর বাড়ীতে। ছাপা সাড়ি পড়ে, কানে কানপাশা লাগিয়ে সে কখনও দাসীর কাছে কাছে, কখনও চন্দর পাশে পাশে ঘুর ঘুর করে বেড়াতে লাগল।

কিন্তু বিপত্তি হল সেইখানেই।

একদিন বিকেলের দিকে হঠাৎ একবার একটা উচ্চকণ্ঠে কান্নার কাতর ধ্বনি উঠে আবার থেমে গেল। দাসীর কানে গিয়েছিল সেই আকস্মিক কান্নার শব্দ। বাড়ী ভিতরেই উঠেছে। দাসী এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু এপাশ ওপাশ চাইতেই নজরে পড়ল বাড়ীর বাইরের দরজার কাছে সিন্ধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

—কি হলরে সিন্ধু? তার কাছে ছুটে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে দাসী।

সিন্ধু কোন জবাব দিলে না। আরও কাঁদতে লাগল।

—কি হল কি? বল! কঠোরস্বরে দাসী বললে।

—আমার কাপড় ছিঁড়ে দিলে।

দাসী সিন্ধুর কাপড়ের আঁচলখানা তুলে নিলে। সত্যিই, কাপড়ের আঁচলখানা মাঝখান থেকে অনেকখানি ছিঁড়ে দিয়েছে।

—কে ছিঁড়লে রে? ধানু?

কান্নার মাঝখানেই সিন্ধু ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

পুত্রের চরিত্রে মর্মান্তিক যন্ত্রণা পেয়ে ক্ষোভে রাগে উন্মাদ হয়ে ছোট ছেলের নাম করে চীৎকার করে ডেকে বেড়াতে লাগল দাসী।

কোথায় সে? কোথাও নাই! এক সময় একটা ধানের মড়াইয়ের পাশ থেকে বিষোদ্ধত সাপের মত বেরিয়ে এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—কি, কি বলছ কি?

তুই চোখে কঠিন তিরস্কার ধারণ করে দুপুরের রৌদ্রের মত উত্তাপ ছড়িয়ে চাপা কঠিন কণ্ঠে বললে—সিন্ধুর কাপড়ের আঁচলাটা তুই ছিঁড়েছিস ?

উদ্ধত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে কর্কশকণ্ঠে বললে—হ্যাঁ দিয়েছি !

তার ঔদ্ধত্য ও লজ্জাহীনতা দেখে দাসী স্তম্ভিত হয়ে গেল, গলা চেপে, আরও কঠিন কণ্ঠে দাঁতে দাঁত চেপে বললে—কেন ছিঁড়লি ?

এবার তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়িয়ে গেল, সে বললে—বেশ করেছি, ছিঁড়েছি !

—বেশ করেছিস ? অবাক হয়ে দাসী বললে—বেশ করেছিস বলছিস তুই আমার মুখের ওপর ? এত আস্পর্দ্ধা তোর ?

আর কোন জবাব দিলে না ধানু। দাসীর পিছনে কোন সময় চন্দ আর গেনু দুজনেই এসে দাঁড়িয়েছে।

এবার কথা বললে চন্দ। সে কাঁপছে। এমন ভয়াল কণ্ঠস্বর তার কেউ কখনো শোনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করলে—কেন ওর কাপড় ছিঁড়লি জবাব দে !

আর জবাব নাই।

চন্দ বললে—আর জবাব দিয়ে জায়গাটাকে আর নিজের মুখকে কলঙ্কিত করতে হবে না। জবাব তোকে আর দিতে হবে না। আজ তোকে ছেড়ে দিলাম। এর পর আর যদি বেচাল দেখি তবে তোকে জীয়ন্ত পুঁতে ফেলব মাটিতে ! যা চোখের সামনে থেকে সরে যা ! চণ্ডাল কোথাকার !

তারপর গম্ভীর ভাবে সিন্ধুকে বললে—তুই বাড়ী যা মা। এ বাড়ীতে আমি কি তোর মা-ঠাকরুণের কাছ ছাড়া কোথাও যাবি না। আর বাড়ী গিয়ে নিধেকে একবার পাঠিয়ে দিস। আমি তোকে আবার অমনি কাপড় গেনুকে দিয়ে আনিয়ে দোব।

সিন্ধু চলে গেল চোখের জল মুছে। ধানু গেনু দুজনেই চলে গিয়েছে।

দাসীর দিকে ফিরে গম্ভীরভাবে চন্দ বললে—এবার ছেলেদের বিয়ে দাও। নইলে ঐ হতভাগা কোনদিন একটা কেলেঙ্কারী ঘটাবে। তখন আর কারো কাছে মুখ দেখাবার রাস্তা থাকবে না। আর নিধিকে ডেকে পাঠালাম। ও এলে ওকে সিন্ধুর বিয়ের কথা বলছি। নিজের ছেলের মুখ চেয়ে ওর বিয়েতে যা লাগবে দিও। দিতে না করো না।

তারপর মর্মান্তিক আক্ষেপে সে বললে—হতভাগা ! কুলাঙ্গার ! শেষে আমার বংশে এই হল !

সন্ধ্যার সময় নিধি এসে বললে—কত্তা আমাকে ডেকেছিলে আপুনি?

—হ্যাঁ ডেকেছিলাম, বস।

নিধি চিরাচরিত পদ্ধতিতে উবু হয়ে বসল, বললে—বলেন কি বলছেন!

—ব্যাপারটা সব শুনেছ?

—শুনেছি।

—এখন আমি ছেলেদের বিয়ে দি, তুমিও সিন্ধুর বিয়ে দাও।

—সিন্ধুর তো এখন চৌদ্দ বছর চলছে। তের পেরিয়ে চৌদ্দ। পনর বছর না হলে তো আমাদের কন্যের বিয়ে হয় না সি তো আপুনি জান! আর কিছু দিন যাক!

—এখন থেকে পাত্র খোঁজ। খোঁজ করতে করতেই সময়ই পার হয়ে যাবে।

—হোক।

দাসী বললে—সিন্ধুর বিয়েতে গয়না যা লাগবে আমি দোব। তোকে ভাবতে হবে না সে জন্যে।

কন্যার খোঁজ চলতে লাগল। গেনু কলকাতায় গিয়ে এম. এ. ও ল'তে ভর্ত্তি হয়েছে। চন্দ আর দাসী দুজনেই ছেলেদের বিয়ে জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কলকাতায় এক ব্যবসাদারের কন্যার সঙ্গে গেণুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। ভাবী বেয়াই একবার চন্দর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার আসল উদ্দেশ্য চন্দর অবস্থা দেখে যাওয়া। তিনি কথায় কথায় বলে গেলেন—আপনি মহাভাগ্যবান লোক শুনেছি। আপনাদের এখানকার গ্রামদেবী আপনাকে বহু গুপ্তধন দিয়েছেন।

চন্দ হাসল, বললে—ভুল শুনেছেন। আমার যা আছে এই তো সবই প্রকাশ্য। গোপন করা কোন ধন-সম্পত্তি আমার নাই।

গেনুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল ঐখানেই। ধান্তর বিয়েও ঠিক হল কাছাকাছি। বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেল।

এক দিন সন্ধ্যাবেলায় নিধি এসে বললে—আমি তো মহা বিপদে পড়লাম কত্তা।

—কেন রে?

—সিন্ধু বলছে সে বিয়ে করবে না। জোর করে তো ওর বিয়ে দিতে পারব না। বিয়ের কথা বললে কেবল কাঁদছে। ওকে মানাতে পারছি না কিছুতেই।

দাসীর চোখগুলো ঝকমক করে উঠল। সে বললে—ওর ব্যাপার আমি

বুঝেছি। আমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করব। ও কেন বিয়ে করছে না আমি জানি!

রাগে কঠিন হয়ে কথাগুলো বললে দাসী।

এর পর একদিন সিন্ধুকে ডেকে গোপনে সে কি বলেছিল সে-ই জানে, সিন্ধু চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বাড়ী ফিরে গিয়েছিল! আর এ বাড়ী দিয়ে মাড়ায় নি।

নিজের পরিকল্পনায় কোনদিন কোথাও ভুল ঘটতে দেয় নাই দাসী। এইবার তার ভুল হবার পালা আরম্ভ হল। ছেলেদের বিয়ে হল। কত সমারোহ করে বিয়ে দিলে সে। কিন্তু বিয়ের পর গেন্দুর স্ত্রী একবার এল, আর এল না। প্রথমবার যাবার সময় সে কথা সে শাশুড়ীকে বলেও গেল।

—আপনি মা শুনেছি, অনেক টাকার মানুষ। তাছাড়া মাটিতে পোঁতা অনেক সোনাদানা পেয়েছেন আপনার ছেলের কাছে শুনেছি। এই অজ পাড়া-গাঁয়ে এত সব সম্পত্তি করে লাভ কি? তার চেয়ে কলকাতায় বাড়ী করুন, আমার বাবার হাতে টাকা তুলে দিলেই তিনি বাড়ী করে দেবেন। আর আপনার ছেলেকে কিছু টাকা দেন, ও ব্যবসা করুক। দেখবেন অল্পদিনে টাকায় কত টাকা আনবে।

দাসী হতভম্ব হয়ে গেল। সে-ই রাজ্যশুদ্ধ লোককে আপনার মতে চালিয়ে এসেছে, নিজের স্বামীকে পর্যন্ত বাদ দেয়নি। আজ সদ্য-বিবাহিতা পুত্রবধূর কাছ থেকে এই অসঙ্কোচ উদ্ধত পরামর্শ শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে বিশেষ কিছু বলতেও পারলে না। প্রচণ্ড ক্রোধে তাকে তিরস্কার করতে পারলে মনটা শান্ত হত। কিন্তু তাও পারলে না সে। অত্যন্ত সংযত হয়ে বললে - টাকা আমাদের নাই মা। যা শুনেছ তুমি ভুল শুনেছ। আর এ আমার শ্বশুরের ভিটে। এখান থেকে বাস তুলে কি অন্য কোথাও যেতে পারি? তুমি ভবিষ্যতে আর এ ধরনের কথা বল না।

পুত্রবধূ চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—আপনি নিষেধ করছেন যখন তখন আর বলব না। কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে আমি থাকতে পারব না তাতে আমার শ্বশুরঘর করা হোক বা না হোক।

দাসী পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। তার মুখে কোন কথা জোগাল না।

ধান্দুর কেলেঙ্কারী আবার আর এক কাঠি উপরে।

বড় পুত্রবধূ চলে যাওয়ার পর ছোট পুত্রবধূ বাপের বাড়ী গেল। কিন্তু আর ফিরে এল না। ধান্নর শ্বশুর কুৎসিত কটু ভাষায় চন্দ ও দাসীকে গালাগাল দিয়ে চিঠি দিলেন। তার মর্ম্মার্থ—তিনি কন্যা বিক্রয় করেন নাই। তার কন্যা হেলাফেলার জিনিস নয়। শ্বশুর বাড়ীতে মুর্খ স্বামীর প্রহার সহ্য করে তার থাকবার কোন কারণ নাই। কাজেই তিনি আর কন্যা পাঠাবেন না।

দাসী বিহ্বল হয়ে গেল আঘাতে আঘাতে। সে স্বামীর কাছে অসহায় হয়ে কেঁদে পড়ল।—এ আমার কি হল? আমি কি এইজন্যে ছেলেদের বিয়ে দিলাম!

চন্দ কি বলবে? যথাসম্ভব সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু দাসীর আর সান্ত্বনার প্রয়োজন হল না। চার পাঁচ দিনের জ্বরে সে নিজের গড়া সংসার পরিত্যাগ করে গেল চিরদিনের জন্য।

মৃত্যুর সময় চোখের জলে ভেসে স্বামীকে বললে—তোমাকে সুখ দিতে পারিনি। নিজের সুখটাই খালি দেখেছি। পারলে আর একবার চেষ্টা করতাম।

আজ কথা বলতে গিয়ে চোখের জলে তার রোগশীর্ণ, জরাগ্রস্ত, ক্লান্ত মুখখানি ভেসে গেল। একটি অসহায় অনুশোচনা তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে যেন চোখ দিয়ে জলের ধারা বইয়ে দিচ্ছে।

চন্দ অসুখের ক'দিনই তার মাথার কাছে বসে আছে। সে যেমন স্বেচ্ছায় বসে আছে, দাসীও তেমনি উঠে যেতে দেয় নাই তাকে। একবার একটু উঠে গেলেই ক্লান্ত জ্বরোত্তপ্ত চোখ দিয়ে তাকে চারিপাশে খুঁজেছে, না পেয়ে ক্লান্ত করুণ কণ্ঠে ডেকেছে—কোথায় গেলে? উঠে চলে গেলে কেন? এস!

উঠে যাবার সময় লক্ষ্য করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে ছোট শিশুর মত বলেছে—কোথায় যাচ্ছ? উঠে যেও না।

চন্দকে হাসি মুখে মেনে নিয়ে বসতে হয়েছে।

দু' তিন দিন অসুখের পর চন্দ দাসীকে বললে—আমি বৌমাকে নিয়ে আসতে গেন্নকে লিখেছি। ছোট বৌমার বাবাকেও লিখেছি!

দাসী বিরক্ত হল, বললে—কেন লিখলে? আমার সংসারে আর কাউকে দরকার নাই। তুমি আমার কাছে থাকলেই আমার হবে!

চন্দর প্রথম মনে হয়েছিল হয় তো দাসীর সকলকে দেখার ইচ্ছা করছে। বলতে সঙ্কোচ করছে। আজ তার কথা শুনে তার বিরাগের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারলে চন্দ।

মধ্যে মধ্যে দরজার কাছে আকস্মিক ভাবে ধানু এসে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে ডাকে—মা, কেমন আছ?

অসহিষ্ণু হয়ে প্রথম দিনেই চন্দ চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলেছিল—অমন চীৎকার করিস না। এই মাত্র ঘুম এসেছে!

চোখ মেলে দাসী বলেছিল—আমি ভাল আছি বাবা! যাও নিজের কাজ কম্ম করো গিয়ে!

ধানু সন্তুষ্ট হয়ে চলে গিয়েছিল।

তার পর দিন থেকে একবার যখন তখন দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। চাপা গলায় বাবাকে প্রশ্ন করে—মা কেমন আছে? চন্দ ইশারা করে জবাব দেয়—ভাল। সে সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়।

চন্দ দেখে, দেখে একবার ক্ষোভের হাসি হাসে। কি চমৎকার ফসল সে ফলিয়েছে! দাসী শুনে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকে।

আজ দাসীর চোখের ধারাটা সে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিয়ে সস্নেহে বললে—কি হয়েছে তোমার? অমন করে বলছ কেন? তুমি ভাল হয়ে যাবে। আবার আমরা দু'জনে নূতন করে আরম্ভ করব।

দাসী হা হা করে কেঁদে উঠল। একবার। তারপর বললে—পারলে তাই করতাম। কিন্তু আমি তো বুঝছি আর আমার সময় নাই! আর তা হবে না!

দাসীর মুখের দিকেই জলে-ঝাপসা চোখে তাকিয়ে ছিল চন্দ। রোগশীর্ণ মুখখানি আস্তে আস্তে তার চোখের সামনে চেহারা পাল্টে সেই চিরকালের একখানি সুন্দর সুকুমার মুখ দাসীর সমস্ত ক্লেশ যন্ত্রণা আপনার মুখে মেখে আপনার চেহারা নিয়ে দাঁড়াল। সে পরম যত্নে তার মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। চন্দ আপনার মাথাটি তার বালিশের কাছে নীচু করলে।

তার সম্বিত ফিরল প্রবল কান্নার শব্দে।

কাঁদছে সকলে। সব চেয়ে জোরে উন্মাদের মত চীৎকার করে কাঁদছে ধানু—মা গো, কোথায় গেলে গো, আমাকে কার কাছে রেখে গেলে গো!

একবার দাসীর মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলে চন্দ। সে-মুখখানি মিলিয়ে গিয়ে দাসীর মুখখানিই নিথর হয়ে আছে!

অমন সুরেলা করুণ গলায় কে কাঁদছে? সে একবার তাকিয়ে দেখলে। বাইরে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে বারান্দার একটা খুঁটি ধরে ঘরের মধ্যে

শয্যায় শয়ান মৃতদেহের দিয়ে তাকিয়ে কাতর ভাবে কাঁদছে সিন্ধু, ঠিক ধাতুরই মত—মা বলে। —মা মাগো!

ও কি, ও কি সিন্ধুর মুখে ও কার মুখ?

সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মৃত-শয্যার পাশ থেকে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর পরম যত্নে দাসীর মাথার চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে সে ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় সিন্ধুর সামনে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, সেই মুখ! ঐ তো সেই মুখ, মা বলে অশ্রুপাত করছে।

তাকে সামনে দেখেই সিন্ধু যেন ভেঙে পড়ল। তার পায়ের কাছে ওমড়ি খেয়ে কাতর ভাবে কেঁদে উঠল—বাবা!

চন্দ কেঁদে উঠল হা হা করে। সকাতরে ডাকলে—মা!

ধাতু এতক্ষণ কাঁদছিল। সে চুপ করেছে এতক্ষণে।

চন্দ আবার ফিরে গিয়ে দাসীর বিছানার পাশে বসল।

সে বুঝলে, যে এতদিন দাসীর মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, সে আজ আবার কন্যার রূপ ধরে ফিরে এল।

বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই চন্দ দেখলে ধাতু আবার মাটিতে গড়িয়ে পড়ে কেঁদে উঠল।

চন্দর মনের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে উঠে গিয়ে আস্তে আস্তে আপনার কাপড়ের খুঁট দিয়ে তার ধুলো বেড়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললে—যা, ওঠ বাবা।

ধাতু উঠে বাবার মুখের দিকে চেয়ে উঠে গেল।

॥ সাত ॥

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

দাসীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে ঠাকুর ঘরে ও ভবসুন্দরীর মন্দিরে প্রণাম করে চন্দ্র যখন বাড়ী এসে ঢুকল তখন দেখলে আম গাছতলায় বেদীর উপরে একটি মাদুর পেতে আর লণ্ঠন জেলে চুপ করে বসে আছে সিন্ধু। সিন্ধুর তার জন্যে এইভাবে অপেক্ষা করাটা তার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক মনে হল; যেন সে প্রতিদিনই এইভাবে তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। একবার মনে হল না সিন্ধু আবার বহু দিন পরে আজ সন্ধ্যা বেলায় নূতন করে বসে আছে।

সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তার কাছে গিয়ে বললে—আজ তো মাদুরে বসতে নাই মা, ওটা সরিয়ে রাখ! হ্যাঁ! সরে আয় আমার কাছে।

সিন্ধু সরে এসে কন্যার মত বসল কাছ ঘেঁষে।

ধান্নকে নিয়ে নিধি এসে ঢুকল বাড়ীতে। লণ্ঠনের স্বল্প আলোয় চন্দ্র দেখলে অত বড় শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলেটা এই গরমের দিনে কাঁপতে কাঁপতে আসছে। আসছে নিধির উপর ভর করে। কেঁদে চোখগুলো ফুলে উঠেছে, রাঙা হয়ে আছে। ছেলেটা যেন নিজের ভারকেন্দ্রটা হারিয়ে ফেলেছে। চন্দ্র তাকে আস্তে আস্তে ডাকলে—ওরে ধান্ন, আয় আমার কাছে আয়।

নিধি তাকে ধরে ধরে আস্তে আস্তে চন্দ্র মশায়ের আর এক পাশে বসিয়ে দিয়ে গেল। কাঠের পুতুলের মত তাকে বসিয়ে দিয়ে সে বসে রইল চুপ করে।

নিজের অজ্ঞাতে চন্দ্র কখন তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করেছে। হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে কমে এল। চন্দ্র বুঝলে ছেলেটার এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল মানুষের সান্নিধ্যের, যার উপরে সে নির্ভর করতে পারে এমন মানুষের সাহচর্যের, মমতার ও সান্ত্বনার। সে আস্তে আস্তে মৃদু গাঢ় স্বরে বললে—মা গিয়েছে, আমি তো থাকলাম! আমি তোমার বাবা মা দুই হব! কোন ভয় নাই, কোন ভাবনা নাই তোমার!

বাড়ীর বাইরে রাস্তায় একটা কি রকম অদ্ভুত শব্দ অনেক দূর থেকে [illegible] এসে বাড়ীর দরজার কাছে এসে থেমে গেল।

—কিসের শব্দ রে নিধি? দেখতো!

গভীর বিষণ্ণতা সত্ত্বেও নিধিরও কৌতূহল হয়েছিল। সে ছুটে বেরিয়ে গেল লণ্ঠন নিয়ে। ফিরে এল সঙ্গে সঙ্গে। বললে—বড় দাদাবাবু এসেছে মোটর গাড়ীতে চেপে।

সন্ধ্যাজলে এর পূর্ব্বে কোন দিন মোটর গাড়ী ঢোকে নি। গভীর বেদনার ও শোকাচ্ছন্নতার মধ্যেও চন্দের মুখে তিক্ত হাসি ফুটে উঠল। জ্যেষ্ঠ সন্তান এসেছেন মোটর গাড়ী চেপে মাকে দেখবার জন্যে। অন্তগের মধ্যে তাঁর আসার আর সময় হল না!

গেন্টু এসে দাঁড়াল তার কাছে। প্রণাম করবার জন্যে ছেলে হাত বাড়াতেই চন্দ হাত তুলে শান্তভাবে নিষেধ করে বললে—থাক বাবা, এ সময় প্রণাম করতে নেই। শুনেছ নিশ্চয়ই!

গেন্টু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।

চন্দ আস্তে আস্তে বললে—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

গেন্টু বসল।

—একদিন আগে এলে তোমার মা দেখতে পেতেন তোমাকে। ধরে তো আর তাঁকে রাখতে পারতাম না।

গেন্টু চুপ করেই থাকল।

আবার প্রশ্ন—বৌমা এলেন না?

এবার আর উত্তর না দিয়ে উপায় নাই। গেন্টু বললে—তার জ্বর চলছে আজ ক' দিন! সেই জন্যে তারও আসা হল না, আমারও আসতে দেরী হয়ে গেল!

—হুঁ। এখন কেমন আছেন বৌমা? ভাল আছেন?

—হাঁ। কাল জ্বরটা ছেড়েছে।

—হুঁ! যাও, কাপড় জামা ছেড়ে স্নান করে এস। অশৌচ তো!

—এই যাই! এই ধান্টু, শোন।

ধান্টু এতক্ষণে হাঁটুর ফাঁদের ভিতর থেকে মুখ তুললে।

তার হাত ধরে টেনে গেন্টু তাকে বললে—আয় আমার সঙ্গে।

একবার বাবার দিকে ও সিন্ধুর দিকে তাকিয়ে সে উঠল। চলে গেল বড় ভাইয়ের সঙ্গে।

ওরা দু জনে চলে যেতে নিদারুণ ক্ষোভে চাপা গলায় চন্দ বললে—দেখলি মা, দেখলি! এই দাসীর বড় ছেলে! একটা অমানুষ! ওটা তো লেখাপড়া না শিখে ভূত হয়েছে, আর এটা? এটা লেখাপড়া শিখে এমনি অমানুষ হল! কপাল!

পরক্ষণেই চাপা অবরুদ্ধ ক্রোধে সে বললে—তুই দেখিস, এ আমি সহ্য করব না মা! এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না।

শ্রাদ্ধশান্তিতে যেমন প্রচুর সমারোহ হল তেমনি সম্পন্নও হল নির্ব্বিঘ্নে। দাসী নিজে ছিল সম্রাজ্ঞীর মত, তার শেষ কাজও তেমনি সমারোহ করে সম্পন্ন না করলে তার আত্মার তৃপ্তি হত না। অন্ততঃ চন্দ তাই ভেবেছে।

কিন্তু তার আত্মা কি তৃপ্তি পাবে? সন্তান বলে, উত্তরাধিকারী বলে যাদের সে রেখে গেল তাদের দিকে যখন সে ভিন্ন লোক থেকে তাকাবে তখন কি তৃপ্তি পাবে? চন্দ নিজেই কি পাচ্ছে?

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার পর দিন সকালে চন্দর কাছে এসে দাঁড়াল গেন্থ।

চন্দ তার মুখের দিকে একবার তাকালে। তাকিয়েই বুঝতে পারলে কি বলতে সে এসেছে। কথাটা সে নিজে আগে বলে দিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। ছেলেটা নিজের অবস্থাটা বুঝত। কিন্তু সে আঘাতটুকু দিতে মন সরল না তার। হাজার হোক সন্তান তো! কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—বল!

মাথা চুলকে একটু সসঙ্কোচ হাসি হেসে বললে—আমি আজ বিকেলে কলকাতা যাব ভাবছিলাম!

গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়ে চন্দ বললে—বেশ তো! তোমার কাজের বোধ হয় ক্ষতি হচ্ছে!

—হ্যাঁ। কতকগুলো নতুন অর্ডার—

তার কথায় বাধা দিয়ে চন্দ জিজ্ঞাসা করলে—বৌমা কি আসবেন না আর এখানে? এই স্থির হয়েছে?

গেন্থ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।—না, না, সে রকম কথা কি করে হবে? নিজের বাড়ী, ঘর; দেশ ভুঁই—

আবার বাধা দিয়ে চন্দ বললে—মাঝে মাঝে বৌমাকে নিয়ে এস। দেশ একেবারে ছেড়ো না।

বড় ছেলে ভাল করে জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি অছিলা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে কলকাতা যাবার জন্যে গরুর গাড়ীতে উঠবার আগে বাবাকে প্রণাম করে ছেলে শুধু বললে—আমি আসি তা হলে?

চন্দ নিস্পৃহ ভাবে শুধু বললে—এস!

বাপ বা ছেলের মধ্যে আর কোন কথা হল না। অথচ উভয়েই জানে যে গেল আর অদূর ভবিষ্যতে কোন দিন হয়তো এখানে ফিরছে না। কিন্তু সে কথা চাপাই রয়ে গেল।

ছেলে প্রণাম করে চলে গেল, চন্দ আমতলার বেদীতে চুপ করে বসে রইল। চাকর তামাক দিয়ে গেল, সে তামাক টেনে চলল। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, ক্রমে ঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা থেমে গেল, সে তেমনি বসে।

যাক, ও চলে গেল, ভালই হল। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। চন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেললে। কাল পর্যন্ত দাসীর কথা ভেবেছে, তার পারলৌকিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন করার কথা ভেবেছে। আর তার ভাবনার সময় কোথায়? দাসী সুবিস্তীর্ণ সম্পত্তি রেখে গিয়েছে তার জন্যে, তাবৎ অস্থাবর সম্পত্তি। সে সমস্ত মিলিয়ে দেখতে হবে। সব চেয়ে গোলমাল হয়েছে মৃত্যুর ঠিক পর থেকে তার সিন্দুকের চাবি হারিয়ে গিয়ে। মৃত্যুর দিন সকালেও তার বালিশের তলায় সব চাবির থোলোর সঙ্গে সিন্দুকের চাবিও ছিল। মৃত্যুর পরও ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার সময় থেকে সে আর পেলে না। সে কাউকে কিছু বলেনি। এমন কি চাবি যে হারিয়েছে এ কথা পর্যন্ত প্রকাশ করেনি কারো কাছে। সেই জন্যে যে ঘরে সিন্দুক আছে, সেই ঘরেই একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে সে। নিজের প্রয়োজন মত খোলে, নিজের কাজ হয়ে গেলে আবার বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে আসে। আজও সে চুপ করে ভাবছিল চাবিটার কথা।

সিন্ধু এসে দাঁড়াল—বাবা, এখনও বসে আছেন চুপ করে? সন্ধ্যে করবেন নাই?

নিঃশ্বাস ফেলে চন্দ তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললে—এই যে মা, যাই, উঠি!

—তাড়াতাড়ি সন্ধ্যে করে আসুন। আমি বামুন মাকে আপনার জল-খাবার ঠিক করতে বলেছি।

চন্দ সন্ধ্যা করবার জন্যে উঠল, বলে গেল—তুই থাকিস যেন, আমি আসছি!

সিন্ধু বললে—আমি আছি বাবা! আপনি আসুন।

সন্ধ্যা করে ফিরে এসে চন্দ দেখলে—সিন্ধু তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কিন্তু সে বসে আছে বেদীর নীচে উঠানের মাটিতে।

—ও কি রে, অমন মাটিতে বসলি কেন? উঠে বস।

সিন্ধু হাসল কেবল। জবাবও দিলে না, উঠেও বসল না।

—কি হল? উঠে বসলি না?

এবার সিন্ধু মৃদু হেসে বললে—বাবা, আমি কি আর ঐখানে বসতে পারি? তখন ছোট ছিলাম, কিছুই বুঝতাম না, তাই বসেছি ঐখানে আপনার কোল ঘেঁষে। এখন বড় হয়েছি! হাজার হোক ছোট জাত! ছোঁওয়া পড়লে চান করতে হয়। তাই কি আর বসতে পারি?

চন্দ মেনে নিলে। কেবল একবার সক্ষোভে বললে তুই যে আমার মেয়ে রে! তোর কি আমার কাছে জাত লাগে?

সিন্ধু কথা ঘুরিয়ে দিলে। বামুন-মা জলখাবার দিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললে—আপনার সঙ্গে আমার অন্য কথা ছিল বাবা!

—কি বল?

—বলব বলেই তো বসে আছি। আপনার খাওয়া হোক।

খাওয়া শেষ করে চন্দ বললে—বল এবার?

—আপনি হাত পাতুন। বলে সে চন্দর হাতে দাসীর সিন্ধুকের হারানো চাবি আলগোছা ফেলে দিলে। বললে—আপনি এটা আপনার ফতুয়ার পকেটে রেখে দেন এখুনি!

চাবির গোছাটা পকেটে রেখে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে চন্দ চাপা গলায় বললে—তুই এ চাবি পেলি কোথায়?

সিন্ধুর মুখটা করুণ হয়ে উঠল। সে বার দুই ঢোঁক গিলে বললে—সে আমি বলব না বাবা! আমি বলতে পারব না।

একটু কঠিন হয়ে চন্দ বললে—না বলতে পারলে তো হবে না মা। আমার নানান কথা মনে হবে। আর হিসেবের সঙ্গে যদি সিন্ধুকের টাকা-কড়ি, গয়না-গাঁটি না মেলে তবে তো আরও মুস্কিল হবে।

সিন্ধুর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে—আমি যতটা পারব, বলছি আপনাকে। শুনুন।

তারপর সিন্ধু বলে গেল, চন্দ শুনে গেল। যা বলে গেল তা মারাত্মক কথা। সব কথা সে বলতে পারেনি, চন্দকে বুঝে নিতে হয়েছে।

মৃত্যুর পর যখন শবযাত্রা বেরিয়ে গেল তখন কি একটা তুলে নিয়ে গিয়েছিল ধান্নু। পরদিন সকালে যখন সিন্ধু এ বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে তখন তাকে একা পেয়ে ধান্নু ডেকেছিল—এই সিন্ধু, শোন!

—না, আমি শুনতে পারব না। যা বলবে এইখানে এই রাস্তায় এসে বল।

ধান্নু অভিমান করে বলেছিল—আজ মা নাই। মায়ের জন্য মন কি করছে, আর তুই এমনি করে কথা বলতে পারলি? বলতে বলতে তার গলা বুঁজে এল, চোখে জল এল।

সিন্ধুরও চোখে জল এসেছিল, সে আর পারেনি। তার কাছে এসে বলেছিল—নাও, কি বলছ বল!

—তুমি আমার মুখের দিকে ভুলেও তাকাবে না সিন্ধু! তুমি আমাকে না দেখলে আমি মরে যাব। কাতর মিনতি করে বলেছিল ধান্নু।

—এই সব বলবার জন্যে আমাকে ডাকলে? কাল তোমার মা মরেছে, আর আজ তোমার মুখে এই সব কথা? ছি ছি! আমি চললাম। বলে যাবার জন্যে সিন্ধু ঘুরে দাঁড়াল।

ধান্নু পূর্ব্ব অভ্যাস মত তার আঁচলটা চেপে ধরলে।

—আঃ, ছাড়। আমি চেঁচাব। ও কি, ও কি করছ?

—আমার মায়ের সিন্দুকের চাবি। তোমার আঁচলে বেঁধে দিলাম।

সিন্ধুর বুকটা ধড়াস করে উঠল—একি, একি করছ তুমি? এ আমাকে দিচ্ছ কেন? বাবাকে দিয়ে দাও।

—না, এ আমার, এ তোমার। সিন্দুকের সব জিনিস তোমার।

সিন্ধু বুঝলে এ উন্মাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত। সে অন্য পথ ধরলে, বললে—বেশ, আমাকে দিলে, আমার কাছে থাকল। আমি এখন যাই।

—যাও, বাবাকে বলো না কিন্তু। সিন্দুকের সব তোমাকে দিলাম। আমাকে তার বদলে কি দেবে তুমি?

সিন্ধু হেসে বললে—আচ্ছা, আগে গয়না পরি, তারপর ভেবে দেখা যাবে।

সিন্ধু তখনকার মত পরিত্রাণ পেলে!

কিন্তু বিকেল বেলা সে আর একজনের হাতে পড়ল।

বেলা পড়ে এসেছে, শান্ত নির্জ্জন পল্লীপথের দু পাশে গাছে গাছে পাখী থেকে থেকে ডেকে উঠেছে, এ ডাল দুলিয়ে, ছোট্ট ছোট্ট সাড়া তুলে ও ডালে গিয়ে বসছে। বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রতিদিনের পথে চলতে চলতে তার হঠাৎ মনে পড়ল দাসীর মুখখানা। নাই, সে নাই। ভাবতেই বুকের ভিতরটা

কেমন করে উঠল তার। ঠোঁট দুটো মোচড় দিয়ে চোখে জল এল। হঠাৎ রাস্তার পাশের জঙ্গল থেকে কে মৃদু কণ্ঠে ডাকলে—সিন্ধু!

সিন্ধু চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল—কে?

—আমি। একটা আতা গাছের পাশ থেকে বেরিয়ে এল গেন্থ, জ্ঞানেন্দ্র। হাসি মুখে বললে—তোমারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

আরও চমকে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়েই মুখখানা নামিয়ে নিলে। তার মুখখানা উদ্বেগে কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছে। বুকটা তার ধড়াস ধড়াস করছে! তার জন্যে কেন দাঁড়িয়ে আছেন বড দাদাবাবু? কি বলবেন তিনি তাকে? সে ছোট্ট করে কোন মতে জবাব দিলে—কেন?

গেন্থ বাক্যব্যয় না করে তার সামনে হাত পেতে বললে—মায়ের সিন্দুকের যে চাবি তোমাকে ধান্থ দিয়েছে সেটা দাও।

বুকের উত্তাল আবেগটা থমকে গেল। ধিক্কারে মনটা ভেঙে গেল। ছি, ছি, ছি রে প্রত্যাশা! নিদারুণ ঘৃণায় মনটা বিষিয়ে গেল। স্বার্থপরটা স্ত্রীর জন্যে মা-বাপকে পরিত্যাগ করেছে, আবার গোপনে সে মা-বাপের সম্পত্তি অপহরণ করতে চায়! সমস্ত মুখটা তার রক্তোশ্বাসে ভরে গেল, সে এতক্ষণের নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসটা পরিত্যাগ করে বললে ছোট্ট একটি কথা—না।

এ উত্তরের জন্যে গেন্থ প্রস্তুত ছিল না একেবারে। তার সম্পর্কে সিন্ধুর দুর্বলতার কথা সে নিজেও জানে। তারই উপর নির্ভর করে সে উত্তর দেওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হাসিমুখে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর শুনে হাতটা গুটিয়ে নিযে ভুরু কুঁচকে সে বললে—মানে? দেবে না?

আবার সিন্ধু দাঁতে দাঁত টিপে বললে—না, দেব না।

—কেন? দেবে না কেন?

—আপনার জিনিস নয়, আপনাকে দেব না। যার জিনিস তাকে দেব।

—কার জিনিস? ধান্থর?

—না। তারও নয়, আপনারও নয়। আপনার বাবাকে দেব। আর কিছু বলবেন?

গেন্থ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে মনে মনে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে—আর কিছু বললে শুনবে তুমি? দুটো প্রেমের কথা বলি। আমাকে এখনো তো ভাল বাস, না কি ভুলে গিয়েছ?

তার কথা শুনে বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল সিন্ধু। তার পর প্রায় ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক

জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাল করে কেঁদে তার পর বেশ করে চোখ মুছে চন্দর বাড়ী গিয়ে ঢুকল।

পরের দিন সকালে চাঁদা-দিঘীর ঘাটে সে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলে। ইচ্ছে করেই স্নান করলে। স্নান করতে করতে না দেখেও সে বুঝতে পেরেছে যে তাকে চাবি দিয়েছিল সে আজ চাবির অছিলায় ঘাটের বাণার আড়ালে লুকিয়ে থেকে স্নান-রতা তাকে দেখছে।

অনেকক্ষণ স্নান করে সে যেন কিছুই জানে না এমন ভাবে ভিজে কাপড় পড়েই নিতান্ত লীলাভরে উঠে এল। ঘাটের উপরে উঠে আসতেই বাণার আড়াল থেকে সে এসে আবির্ভূত হল। সে জানত, তবু ভাল করেই চমকে উঠল—বাবারে, কে?

এক মুখ হেসে আগন্তুক বললে—আমি রে আমি! ভয় নাই। আহা-হা, অমন করে কনে বউয়ের মত কাপড় সামলাতে হবে না। দেখি, তোকে এবার দেখি! তোকে বড় ভাল লাগছে রে?

উপায় নাই, ছলনা তাকে করতে হবেই। সে হাসল প্রশ্রয়ের হাসি। সে তাড়াতাড়ি ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পড়ে নিলে। তারপর ভুরু কুঁচকে তাকে প্রশ্ন করলে—কি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? চাই কি?

—কি চাই তুই তো জানিস। এখন আমার চাবিটা দে!

—চাবিটা? কেন, কাল যে আমাকে দিয়ে দিলে?

—তুই তো দাদাকে বলেছিস বাবাকে দিয়ে দিবি?

—পাগল না কি! তোমার জিনিস তোমার বাবাকেই বা দেব কেন, দাদাকেই বা দেব কেন? আর তুমি তো বল নাই দাদাকে দিতে! বললে নয়তো দিয়ে দিতাম।

—বেশ করেছিস, দিসনি! তা আমাকে এখন দে।

—দি দাঁড়াও, ঐ ভিজে কাপড়ের সঙ্গে আছে। সে ভিজে কাপড়খানা ঝাড়তে লাগল। অকস্মাৎ সে চমকে উঠে বললে—এই যাঃ! সব্বনাশ হয়েছে!

—কি হয়েছে?

—চাবিটা চাঁদা দিঘীর জলে গিয়েছে। বিবর্ণ পাংশু মুখে বললে সিন্ধু!

—যাঃ, বাজে কথা বলছিস। রসিকতা করতে হবে না, দে!

সিন্ধু বিবর্ণ মুখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁদে ফেললে।

—কি হল, কাঁদছিস কেন ?

হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে সিন্ধু বললে—চাবিটা হারিয়ে ফেললাম যে দিঘীর জলে !

দয়াপরবশ হয়ে ধান্ন বললে—কি করবি, হারিয়ে গেল তো কি করবি। আচ্ছা, বরং বল, কোনখানে ফেলেছিস। আমি বরং একবার খুঁজে দেখি !

সিন্ধু বললে—আমি কেবল ঘাট থেকে সোজা গিয়েছি আর এসেছি !

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ধান্ন বললে—দেখ, তোর জন্যে আমাকে কত কষ্ট করতে হচ্ছে ! এ সব মনে থাকে যেন !

—এমনি করে জলে নেমে যে ডুববে আর উঠবে, আর আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকব তাতে লোকে কি ভাববে ?

সে ঘাড় না ফিরিয়ে জবাব দিলে—লোকের বলা আর ভাবাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি !

সে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঘাটের রাণার উপর থেকে সিন্ধু চীৎকার করে বললে—আমি বাড়ী চললাম।

সমস্তটা বলে সিন্ধু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। চন্দও আস্তে আস্তে তার চোখের উপর থেকে দৃষ্টি নামিয়ে মাথা হেঁট করলে। অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করে থেকে নিঃশ্বাস ফেলে বললে—তোর কাছে এ শুনতে চেয়ে অন্যায় করলাম মা। তোর লজ্জাও আমার কাছে রাখতে দিলাম না, আর লজ্জায় আমার মাথাটাও নুইয়ে পড়ছে।

সিন্ধু মাথা হেঁট করেই বললে—আপনি কি করবেন বাবা ! আপনার মত বাপের মনে ওরা কষ্ট দিলে !

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সিন্ধু বললে—আমি এখন যাই বাবা !

চন্দও চুপ করেই বসে ছিল, সে বললে—আয় মা ! আবার আসিস !

—আসব। বলে সিন্ধু চলে গেল।

চন্দ সারাদিন নিজের ঘরে মাথা হেঁট করে বসে রইল চুপ চাপ। নানান ভাবনা ভাবলে। সব এলোমেলো ভাবনা। দুঃখে অবসাদে সমস্ত মনটা যেন মুষড়ে পড়েছে।

একি হল ?

সুখের দিন যেন জীবনে জোয়ারের জলের সমারোহ নিয়ে এসেছিল। আজ ভাটার টানে অন্তর্হিত হয়ে গিয়ে কাদা আর পাঁকের দাঁত বের করে হাসছে। সংসারে তার তিনটি মানুষ ছিল আপনার। একজন নাই। দুজন রয়েছে। দুই ছেলে। একজন স্বার্থমগ্ন, বিমুখ। তাকে পরিত্যাগ করে গিয়েছে। আর এক চণ্ডাল, সম্ভব অসম্ভব নানান কুকাজ করে তার বুকের উপর বসে তাকে আঘাত করে চলেছে। তাকে বোঝালে সে বুঝবে না, তাকে পরিত্যাগ করারও উপায় নাই। সে তার চণ্ডাল পুত্র। সঙ্গী নাই, বন্ধু নাই, আনন্দ নাই, ভবিষ্যৎ নাই।

আর রয়েছে সে! জীবনের প্রারম্ভকালে যবে এক প্রহেলিকার মত এসে বলেছিল—আমি সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি! সে তার কথা রেখেছে। কোন্ এক আশ্চর্য্য আনন্দের মত সে তার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। কিন্তু তাতে তার কি লাভ হল? হয়তো সেই সব সুখ কেড়ে নিয়েছে! দাসীর আর তার মধ্যে কত মাহেন্দ্রক্ষণে এসে আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়েছে, হেসেছে, কেঁদেছে। তার ছলনায় দাসী হারিয়ে গিয়েছে তার কাছ থেকে। বোধহয় তারই কোনও অজ্ঞাত অভিশাপে ছেলেরা তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তার পর হয়ে গিয়েছে।

আরও কতদিন বাঁচতে হবে কে জানে? কিন্তু এমনভাবে কি করে বাঁচবে সে? কাকে অবলম্বন করে, কি ধরে বাঁচবে সে! কিন্তু তাকে বাঁচতে হবে! যতক্ষণ বেঁচে থাকবে বাঁচার মত বেঁচে থাকবে সে। সে আবার একবার চেষ্টা করে দেখবে।

কর্ম্মচারীরা নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে। নায়েব ভবেশ একবার এসেছিল। সে তাকে অমনি চুপ করে বসে থাকতে দেখে চলে গিয়েছে। দিনে একবার স্নান করে ঠাকুর ঘরে আর ভবসুন্দরীর মন্দিরে প্রণাম করে সেই যে এসে বসেছিল খাওয়া-দাওয়াও করেনি, আর ওঠেও নি।

বিকেল বেলা নিধি এসে ডাকলে—কর্ত্তা! ও কর্ত্তা!

মুখ তুলে চন্দ্র বললে—কি রে?

দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কর্ম্মচারীরাও চলে গিয়েছে, দোকান খালি। নিধি তার কাছে উবু হয়ে বসে বললে—আপনার শরীর ভাল আছে কর্ত্তা?

এবার একটু যেন স্নেহস্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে চন্দ্র বললে—শরীর ভাল আছে। শরীর খারাপ হয় নাই!

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে নিধি বললে—তবে, কেনে সারাদিন খেলেন না কিছু?

হাসিমুখে তার কথার জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল চন্দ। ওকি, এই আবছা ম্লান আলোতে, নিধির জীবনযুদ্ধের ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত ভাঙাচোরা কঠিন মুখখানায় পৃথিবীর স্পর্শহীন কার অম্লান সুকুমার লাবণ্য উঁকি দিচ্ছে? বুকখানা তার দুলে উঠল। তা হলে সে আরও কাছে এসেছে!

সে হাসিমুখে গদী থেকে নেমে এসে তার পিঠে হাত দিয়ে বললে—চল, এইবার সন্ধ্যে করে খাব।

তাকে অমনভাবে স্পর্শ করায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল নিধি। সে সসঙ্কোচে বললে—আমাকে এই অবেলায় ছুঁলেন আপুনি? আপনকাকে আবার চান করতে হবে।

—তা হোক। শোন নিধিবাবু; দুটো কাজ করতে হবে। এক নম্বর, সেই কুড়ি বিঘে জমি এইবার ঠাকরুণের নামে লিখে দেব। আর খামার বাড়ার ওপাশে, ঠাকরুণের মন্দিরের পিছনে যে খাস জায়গাটা আছে সেখানে একখানা ঘর তৈরী করাব। এবার থেকে ভগবান আর ঠাকরুণের নাম করব আর ঐখানে থাকব।

—সি খুব আচ্ছা হবে কত্তা!

—হবে তো? আচ্ছা তুমি এবার যাও। আমি বাইরের কাছারী বাড়ীটা একটু ঘুরে যাই।

নিধি চলে গেল, চন্দ কাছারী বাড়ীতে এসে ডাকলে—আরে ধানু আছিস?

কোন সাড়া নাই। সে গিয়ে কাছারী বাড়ীর ভিতরে ঢুকল।

কোথায় গেল ধানু? এই সন্ধ্যার মুখে? ঐ তো চৌকীর উপর হাত-পা এলিয়ে দিয়ে এই ভরা সন্ধ্যাবেলায় ঘুমোচ্ছে হতভাগা!

সে গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাকলে—এই, এই ধানু! আমি, আমি বাবা, ডাকছি। উঠে আয়।

ধড়মড় করে উঠে বসল ধানু—এ্যাঁ, কি বলচ?

—হাত মুখ ধুয়ে বাড়ীর ভেতর আয় আমার কাছে। কথা আছে।

ধানু যখন এসে বসল তার কাছে তখন স্নান, সন্ধ্যা করে তার খাওয়াও হয়ে গিয়েছে।

—এত দেরী হল কেন রে? মিষ্ট স্বরে কথাগুলি বলে ছেলের মনটাকে তার কথা শোনার জন্যে তৈরী করে নেবার চেষ্টা করলে সে।

—স্নান করে এলাম। ঘুমিয়ে উঠে ভাল লাগছিল না।

ছেলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললে—তোকে একটা কাজের কথা বলবার জন্যে ডেকেছি। তুই তো কিছুই দেখিস না। এতদিন তোর মা ছিলেন, তিনি দেখতেন। আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন, তুই এবার কিছু কিছু দেখ! জমিদারীটা দেখ তুই বরং।

ছেলে খুসী হল। বললে—তুমি হুকুম করলেই দেখি।

—খুব ভাল। কালকে ভবেশকে বলে তোর নামে আমমোক্তারনামা দেবার ব্যবস্থা করি তা হলে?

—কর। আমার কোন আপত্তি নাই।

—বেশ মন পাতিয়ে কাজ করবি তো?

—করব বলছি তো! এক কথা মানুষে কতবার বলে!

হেসে চন্দ বললে—আচ্ছা বলব না বারে বারে। আর এক কথা। কুড়ি বিঘে জমি ঠাকরুণের নামে লিখে দিচ্ছি বুঝলি, ওর টাকা থেকে গাঁয়ের গরীব লোকদের অভাবের সময় ধান কি চাল দেওয়া হবে। আমি তোর দাদাকে শুনিয়েছিলাম, তা সে বারণ করেছিল।

—দাদাটা অমনি ছোটলোক! অমনি ছোট নজর ওর! তুমি নিশ্চয় দেবে। ভাল কাজে দেবে, তোমার নিজের জিনিস, তাতে আর কথা কি। কে কি বলবে?

চন্দ আশ্বস্ত হয়ে ফিরল।

জমি রেজেষ্ট্রী করে দেবোত্তর করা হয়ে গেল। বাড়ীর ভিত কাটা হয়ে নূতন বাড়ীর কাজও আরম্ভ হল। এরই মধ্যে চন্দ একদিন গরুর গাড়ীতে করে নিধিকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় গেল।

যাবার সময় সে গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় দাশু তাকে বললে—এ্যাঁ, কোথা চললে গো?

—বিকেল বেলা ফিরে আসব। এসে বলব কোথা গিয়েছিলাম। বাড়ীতে থাকিস যেন। কোথাও যাস না।

—লাও মজা! ই আবার মাচ্ছা মজা লাগালে তুমি!

চন্দ তার এই গ্রাম্য কথা-বার্ত্তা শুনে মনে মনে বিরক্ত হল, কিন্তু কিছু বলার কোন উপায় নাই এই মূর্খ পুত্রকে। সে মনের বিরক্তি মনে চেপে বললে—চালারে নিধি!

চন্দ চলে গেল এবং বিকেল বেলা সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল দাশুর স্ত্রীকে নিয়ে। আগে থেকেই বেয়াইকে চিঠিপত্র লিখে সমস্ত ব্যবস্থা করা ছিল।

সেখানে গিয়ে পুত্রবধূকে সাহস দিয়ে নির্ভয় ও আশ্বস্ত করে, বেয়াই-বেয়ানকে জামাইয়ের চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে পুত্রবধূকে নিয়ে এল।

সন্ধ্যাবেলায় গাড়ীখানা থামাতেই ধান্তু এসে দাঁড়াল গাড়ীর কাছে। স্ত্রীকে নামতে দেখে সে খুশীই হ'ল, বাবার বিবেচনাকে তারিফ করলে মনে মনে। হঁ্যা লোকটার বুদ্ধি বিবেচনা দুই-ই আছে।

চন্দ নিজে বধূকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে শুনিয়ে বাড়ীর সমস্ত ঘরের, সমস্ত ধানের গোলার, এমনকি বাসনের ঘরের চাবিশুদ্ধ, পুত্রবধূর আঁচলে বেঁধে দিয়ে বললে—তোমার জিনিস সব তোমাকে দিলাম মা। এখন তুমি ঘর-সংসার কর, আপনার মত করে দেখ শোন।

কিছুদিন বড় আনন্দে কাটল। চন্দর মনে হ'তে লাগল অনেক দুর্যোগের পর আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে নির্মল প্রভাত এসেছে, সামনে এবার একটি স্বচ্ছন্দ দিন তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে আরও কিছু জমি ঠাকুরের নামে লিখে দিলে, গ্রামের ষষ্ঠীতলাটা নিজের খরচে বাঁধিয়ে দিলে। এ দিকে বাড়াটাও তৈরী হয়ে গেল।

সে মাথার চুলগুলো সব কেটে ফেললে ছোট করে। গলায় কণ্ঠির মালা নিলে দু'হালি। কপালে তিলক কাটতে লাগল। লোকে তাকে ডাকতে আরম্ভ করলে চন্দ মশাই বলে।

গ্রামের কাজে কর্ম্মে বিপদে আপদে সর্ব্বাগ্রে চন্দ মশাই গিয়ে দাঁড়ান। না দাঁড়ালে কাজ হয় না। লোকে পরামর্শের জন্য, সাহায্যের জন্য এসে দাঁড়ায় তার কাছে। তিনি যতটা পারেন করেন, পরামর্শ দেন।

কিন্তু এই ভাবে চললেই ভাল হত। কিন্তু চলল না বেশী দিন।

সন্ধ্যার মুখে একবার করে সিন্ধু আসে তার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি সন্ধ্যা করেন, সিন্ধু ছোট বউয়ের সঙ্গে গল্প করে। তার সন্ধ্যা হয়ে গেলে ছোট-বউ জলখাবার নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ায়, সিন্ধুও তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেন, গ্রামের পাঁচজনের সংবাদ নেন, হাস্য-পরিহাসও হয়। হাস্য-পরিহাসের অধিকাংশটাই অবশ্য নিধিকে নিয়ে। তারপর কেউ আলো দেখিয়ে দেয়। সিন্ধু বাড়ী চলে যায়।

চন্দ মশাই কয়েকদিন থেকেই অনুভব করছেন ধান্তুর সঙ্গে ছোট বৌমার আবার গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। রাত্রিতে পাশের ঘর থেকে বেশ উচ্চকণ্ঠে বাদানুবাদ তার কানে আসে।

সেদিন রাত্রিতে উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদে তার ঘুম ভেঙে গেল।

হ্যাঁ ঠিক, ঝগড়া করছে দুজনে।

ধান্ত বলছে—কি এমন অন্যায় কথা বলেছি ওর মত চুল বাঁধতে বলে? অমন পাতা করে চুল না বেঁধে ওর মত টান করে বাঁধলেই তো পার!

তার স্ত্রী বলছে—কেন আমি ওর মত চুল বাঁধব? ও একটা সামান্য শেওড়াদের মেয়ে, ওকে নকল করতে যাব আমি কোন্ দুঃখে?

—কোন্ দুঃখে? তুমি ওর মত সুন্দর নও এই দুঃখে!

—খবরদার বলছি, তুমি ওর সঙ্গে আমার তুলনা করবে না। ভাল হবে না।

—কেন করব না? বেশ করব, আমার ইচ্ছা আমি করব। তোমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে আমি যদি ওকে নিয়ে থাকতে পারতাম তবে অনেক বেশী সুখী হতাম।

আঃ ছি, ছি! হরিবোল, হরিবোল! এ ঘরে কথাগুলো শুনে কানে আঙুল দিলেন চন্দ মশায়! চণ্ডাল!

বধূ তখন ক্ষেপে উঠেছে—নির্লজ্জ, বেহায়া, মরণ হয় না তোমার?

তারপরই প্রহার, উচ্চকণ্ঠে কান্নার শব্দ!

চন্দ মশাই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। আর্তকণ্ঠে ডাকলেন—ওরে ও হতভাগা, কি করছিস রে! ওরে বংশের মুখে কালি দিলি রে! আঃ, ছি, ছি, ছি!

ও ঘরের দরজা খুলে গেল। ক্রোধান্ধ দম্পতি ছুটে বেরিয়ে এল তার সামনে। কর্কশ কণ্ঠে ধান্ত বললে—তুমি আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যে কেন কথা বলতে আসছ? ওকে আজ আমি দূর করে দেব বাড়ী থেকে!

গম্ভীর ভয়াল কণ্ঠে চন্দ মশাই বললেন—ওরে চণ্ডাল, তার আগে আমি তোকে ঘাড়ে ধরে দূর করে দেব তা জেনে রাখিস!

অকস্মাৎ পিতা-পুত্র দু জনকে অবাক করে দিয়ে বধূ চন্দ মশাইয়ের পায়ের কাছে এসে মাথা কুটতে লাগল—এই! এই! এই! এই জন্মে আমাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে এসেছিলে? এই অপমানের জন্মে?

চন্দ মশাই হাতে ধরে পুত্রবধূকে তুলতে গেলেন। সে উঠল না। পড়ে কাঁদতে লাগল।

পরদিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত পুত্রবধূকে তিনি অনেক বোঝালেন, অনেক সাধ্য সাধনা করলেন। তাকে এক ফোঁটা জলও খাওয়াতে পারলেন না। শেষ

পর্য্যন্ত অস্নাত অভুক্ত হয়ে গাড়ী ডেকে বধূকে তার বাপের বাড়ীতে রেখে এলেন। বেয়াই অতি কঠিন কুৎসিত অপমান করলেন তাকে। সব মাথা পেতে নিয়ে ফিরে এলেন।

বাড়ীতে নামতেই দেখলেন কাছারীর বারান্দায় ধান্থ দাঁড়িয়ে। চেহারাটা তার যেন কেমন কেমন! সঙ্গের ছোকরা গাড়োয়ানটা গরু দুটো খুলছে।

ধান্থ অসম পদক্ষেপে নেমে এসে কোমরে হাত দিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

তার চোখগুলো রাঙা টকটকে, চুলগুলো বিশৃঙ্খল। সে আরো কাছে আসতেই তার মুখ থেকে অতি কটু গন্ধ এসে তার নাকে ঢুকল।

নিদারুণ ঘৃণায় তিনি বললেন—তুই মদ খেয়েছিস?

গম্ভীর ভাবে ধান্থ বললে—হঁ্যা, খেয়েছি। বেশ করেছি। তোমার কি?

তিনি তার স্পর্দ্ধা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

সে একটু মত্ত হাসি হেসে বললে—রাজ্য নিষ্কণ্টক করে এলে?

তিনি ধমক দিয়ে উঠলেন—কি বলছিস তুই?

সে তেমনি হাসি হেসে তাকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে—ঠিকই বলছি এইবার সিন্ধুকে নিয়ে সুখে রাজত্ব কর! বিয়ে করে ফেল না সিন্ধুকে! বাধা কি? অনেক দিন থেকেই তো চলছে!

নিদারুণ ক্রোধে মাথাটা টলে গেল। আঘাত করবার জন্যে হাত তুলতে গিয়ে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। কিন্তু কে যেন তাকে ধরে ফেললে। কে? আবছা চেতনার মধ্যে দেখলেন সেই অতি পরিচিত, সুকুমার, অনন্ত যৌবন-সম্পন্ন মুখখানি সস্নেহে তার মুখের দিকে চেয়ে নিজের দুই বাহু দিয়ে তাকে আশ্রয় দিয়েছে। মুখখানি কেবল সুশ্যাম।

*　　　*　　　*

তারপর থেকে আর তিনি বাড়ীর ভিতরে যান নাই। পুত্রের মুখও দর্শন করেন নাই। ইচ্ছা হয়েছে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার। কিন্তু মমতায় বাধা হয়েছে। তাও পারেন নি!

তিনি নূতন বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। সেইখানেই থাকেন। ঐ ঘটনার পর সিন্ধুকেও প্রকারান্তরে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সে যে নিষেধ মানে না। একবার প্রহর খানেক বেলায় সে এসে দুধ দিয়ে যায়, আবার সন্ধ্যার সময় আসে একবার। সূর্য্যাস্তের আগেই চলে যায়।

কিছুদিন থেকেই তিনি আবার বেশ শান্তিতে আছেন। নিজের সামান্য

ক'খানা বই নিয়ে পড়াশুনো করেন। দোকানের, জমিদারীর, তেজারতীর কাজকর্ম সব এখান থেকেই করেন। খাতুর নামের আম-মোক্তারনামা তিনি বাতিল করে দিয়েছেন।

একটা জিনিস তিনি আজকাল প্রায় সব সময় অনুভব করেন। তার চিরকালের সঙ্গী হিসেবে সব সময় সে তার কাছে কাছে, সঙ্গে সঙ্গেই আছে। একটা সজ্ঞান অনুভবের মধ্যেই রয়েছে সর্ব্বদা।

সে দিন পূর্ণিমা! উপবাস তার সেদিন!

সিন্ধু এল সে দিন একটু দেরী করে। বিকেল বেলা দুধ দুইয়ে একেবারে মাজা ঘটিতে গরম করে নিয়ে এসেছে। আসতেই তিনি বললেন—কি রে বেটি, আজ এত দেরী হয়ে গেল?

লজ্জিত হয়ে সিন্ধু বললে—দুধটা গরম করে আনতে দেরী হয়ে গেল।

—আমি ভাবলাম মা আমার বুঝি ঠাকরুণের মন্দিরে প্রণাম করতে গিয়েছে। দেখেছিস কত বড চাঁদ উঠেছে। চাঁদা দিঘীর জলে কি রকম ছায়াটা পড়েছে। এই রকম দিনে ঠাকরুণ সশরীরে দেখা দেন জানিস? ঠাকরুণকে দেখেছিস কখনও?

সিন্ধু নিতান্ত কৌতুক-বোধে হাসতে লাগল, বললে—সে পুণ্যি আমি কোথা পাব বাবা?

চন্দ মশাই বললেন হেসে—তুই জানিস না, তুইই ঠাকরুণ, ঠাকরুণ বাস করছেন তোর মধ্যে। এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি!

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সিন্ধু! কিছুক্ষণ পর বললে—আপনাকে একটা কথা না বলে পারছি না বাবা!

—বল।

—ছোট দাদাবাবু আবার জ্বালাতন স্বরু করেছে।

চন্দ মশাই নিঃশ্বাস ফেললেন, বললেন—হতভাগাকে এইবার গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব। কিন্তু তোকেও বলি মা, তোকে বহুবার বললাম বিয়ে করতে। বিয়ে করলি না তুই! তোর মনের কথা আমি বুঝি! কিন্তু মিথ্যেই তো জীবনটা পাত করলি মা!

তিরস্কারটুকু মাথা পেতে সহ্য করলে সিন্ধু। তারপর বললে—আজ যাই বাবা!

—আমার কথায় দুঃখ পাস না মা! তোর দুঃখেই দুঃখ পেয়ে কথাটা

বলেছি! কিন্তু একা যেতে পারবি, না দাঁড়িয়ে দেব, বল? চল, আমি বরং তোকে দাঁড়িয়ে দিয়ে আসি।

—না, আপনাকে দাঁড়াতে হবে না। চাঁদের আলো আছে, আমি দিব্যি চলে যাব।

সিন্ধু চলে গেল। তিনি গিয়ে সন্ধ্যা করতে বসলেন।

হঠাৎ একটা চীৎকারে তিনি সচকিত হয়ে সন্ধ্যার আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। সিন্ধু যেন চীৎকার করে উঠল—বাবাগো!

তিনি ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার কাছ পর্য্যন্ত যেতেই দেখলেন সিন্ধু ছুটে এসে তার ঘরের ভিতর ঢুকল। তাকে সামনে দেখেই হা হা করে কেঁদে সে বললে—দেখ বাবা, আমার কি করেছে!

তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—মারে, মা আমার, কোন ভয় নাই, আমি আছি! ভয় কি? আয় ঘরে আয়।

তাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সিন্ধুর চুল এলো-মেলো, কাপড় একাধিক জায়গায় ছেঁড়া, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

তাকে জল খাইয়ে তার সঙ্গে কথা বলে তাকে শান্ত করে বললেন—চল, আমি তোকে রেখে আসি। কাল তার ব্যবস্থা আমি করব।

সিন্ধু কেঁদে উঠল, বললে—আমি এখন যেতে পারব না বাবা। আমার ভয় লাগছে! তুমি আমার সঙ্গে গেলে আজ হয় তো তোমাকেও মারবে।

চন্দ মশায় একবার ভাবলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা তুই ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাক। আমি বাইরে বারান্দায় বসে থাকছি। কোন লোক ডাকলে সাড়া দিস না। তাতে কেলেঙ্কারীর অন্ত থাকবে না। আমি কাল সব বলব নিধিকে।

বাড়ীর দরজার কাছে লোকজনের গলার সাড়া, আলোর ছটা পাওয়া যাচ্ছে। চন্দ মশাই বললেন—তুই দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাক।

বাইরে কে ডাকলে—চন্দ মশাই! কত্তা!

—এই যে, এস, ভেতরে এস।

—আচ্ছা কোন স্ত্রীলোকের গলায় 'বাবাগো' বলে ডাক শুনেছিলেন না কি?

—হ্যাঁ, শুনেছিলাম, বেরিয়ে গিয়ে একবার দেখেও এসেছি। কিছু তো কোথাও দেখলাম না।

—আমাদের মনে হল, আপনার বাড়ীর কাছেই চাঁদা দিঘীর এপারেই শব্দটা উঠেছিল। কি জানি? তা হলে কোন্ খানে কি আওয়াজ হল!

চলে গেল সকলে। চন্দ মশাই ফিরে এসে আবার বারান্দায় বসলেন।

আরও খানিকটা পরে তিনি ডাকলেন—সিন্ধু, আয় বেরিয়ে আয়। তোকে রেখে আসি আয়।

সিন্ধু বেরিয়ে এল। সিন্ধু যেন অনেকটা সামলে নিয়েছে।

তিনি লণ্ঠন ও লাঠি হাতে সিন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ওদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে বললেন—যা, ভেতরে যা, গিয়ে নিধুকে ডেকে দে!

সে দরজা পার হয়ে ভিতরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসে বললে—বাবা তো নেই, বোধহয় মাতালশালায় গিয়েছে।

—সে এলে যেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিস। তিনি চলে এলেন, সিন্ধু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। তিনি যেতে যেতে ফিরে বললেন—বাইরে দাঁড়িয়ে থাকিস না। ভেতরে যা।

এসে দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাত্রি তখন কতটা কে জানে! কে ডাকছে—কত্তা! কত্তা! একবার ওঠেন!

চন্দ মশাই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন—কিরে? এত রাত্রিতে?

—সিন্ধু আসে নাই?

—না তো, সিন্ধুকে তো বাড়ীতে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম!

—সে গিয়েছিল, তারপরই আবার বেরিয়ে এসেছে।

—কোথায় গেল তা হলে? চল দেখি!

সারারাত্রি খোঁজাখুঁজি করলেন দু জনে। কোথাও নেই! ধানুকে খুঁজলেন, সেও নেই! কোথায় গেল দু জনেই। অনেক খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ভোর রাত্রিতে ঘরে ফিরে দাওয়ার উপরেই শুয়ে পড়লেন। শোবার সঙ্গে ক্লান্তিতে তন্দ্রা এল।

তন্দ্রা ভেঙে গেল নিধুর ডাকে—কত্তা একবার উঠে আসুন। চাঁদা দিঘীর ঘাটে।

ঘাটের কাছে অনেক লোক। স্পন্দিত বুকে নিধুর পিছন পিছন ঘাটে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলেন পূর্ব্ব আকাশে চক্রবাল-লগ্ন অস্তগামী চাঁদের মত সিন্ধু দিঘীর প্রায় মাঝখানে সমস্ত মুখে সেই আশ্চর্য্য সুকুমার মুখের অলৌকিক সুষমা মেখে জলে ভাসছে। তার কাপড়ের একটা প্রান্ত জলে ভাসছে সাদা মেঘের মত।

চন্দ মশাই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন।

দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পরে।

রোগ শয্যায় চন্দ মশায় উঠে বসেছেন। শরীর শীর্ণ, দেহ বলহীন। যেন তাঁর জন্মান্তর হয়েছে।

অসুখের মধ্যেই ধান্তর সংবাদ শুনেছিলেন। সে চাঁদ রাজার ভিটেতে কোন অতল পঙ্ককুণ্ডে হারিয়ে গিয়েছে। তিনি শুনে কেবল পাশ ফিরে শুয়েছিলেন অসুখের মধ্যেই।

নিধি কাছে এসে বসে ডাকলে—কত্তা, আমাকে চিনতে পারছ?

শীর্ণ হাসি হেসে চন্দ মশাই ঘাড় নাড়লেন—পারছি। তিনি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঐ তো নিধির মুখে সে ই হাসছে, নিধির চোখ দিয়ে সে-ই তার দিকে স্বস্নেহে তাকিয়ে আছে। তাকে কি চিনতে ভুল হয়?

আজ ঝড় কেটে গিয়েছে। কেউ কোথাও নেই। শূন্য, রিক্ত সংসার। শুধু তিনি আছেন, আর রয়েছে সে। আজ একা দুজনে সামনা সামনি পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে।